আর্টিমিসিয়া

নারায়ণ সান্যাল

কুণ্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যানার্জী কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

স্ক্যান : শান্তনু অধিকারী

SUBHAJIT KUNDU

আর্টেমিসিয়া • নারায়ণ সান্যাল

দেব সাহিত্য কুটীর

নারায়ণ সান্যাল

জন্ম কলকাতায়, ১৯২৪ সালের ২৬ এপ্রিল। আদি নিবাস নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। পড়াশোনা কৃষ্ণনগর, আসানসোল ও কলকাতায়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি ই পাশ করেন। ইন্সটিট্যুট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)-এর ফেলো। কর্মজীবন কেটেছে পি ডব্লিউ ডিতে। দণ্ডকারণ্যে কিছুদিন ডেপুটেশনে কাজ করেছেন। ভারত ভাগের পর রিফিউজিদের নিয়ে লেখা তাঁর 'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প' উপন্যাসটি সেই সময় বাংলা সাহিত্যে সাড়া জাগিয়েছিল। অবসর গ্রহণের পর তিনি এখন পুরোপুরি সাহিত্যসেবী। তাঁর দিন কাটে লেখা, পড়া আর আঁকা নিয়ে। সম্প্রতি তিনি টিভি সিরিয়ালও তৈরি করছেন।

গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ, শিশু ও কিশোর সাহিত্য এবং নব-সাক্ষরদের জগতেও তাঁর অবাধ বিচরণ। লেখার বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্য তাঁকে বাংলা সাহিত্যে আলাদা স্থান এনে দিয়েছে। শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর লেখা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ইংরেজীতেও তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন।

তাঁর 'কাঁটা' সিরিজের বইগুলি বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গভীর মনস্তত্ত্ব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জটিল আইনের সরল ব্যাখ্যা, সর্বোপরি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মানসিকতা বইগুলিকে আলাদা স্বাদ এনে দিয়েছে যা পাঠককে শুধু তৃপ্তই নয়, রোমাঞ্চিতও করে।

আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি রেনেসাঁ যুগের একমাত্র মহিলা-শিল্পী যিনি সার্থকতার গৌরীশৃঙ্গে উপনীত হয়েছিলেন। ফ্লোরেন্স আকাদেমিয়ার প্রথম এবং একমাত্র মহিলা সদস্যা। অন্যান্যরা : বত্তিচেল্লি, বেলিনী, লেঅনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, কারভাজিও, গ্যালিলেও! ফ্লোরেন্সের উফিজি সংগ্রহশালায় মহিলাশিল্পীর আঁকা একটি মাত্র চিত্রই তখন স্থান পেয়েছিল—আর্টিমিসিয়ার।

অথচ 'মহিলা' হবার অপরাধে তাঁর নির্যাতনের অবধি ছিল না। সমকাল তাঁকে সহ্য করেনি। রোম-আদালতে আঠারো বছর বয়সে একটি বলাৎকার-মামলায় যে লাঞ্ছনার সূত্রপাত, তার সমাপ্তি—মৃত্যুতে।

প্রতীচ্যের কিছু গবেষক তাঁকে সম্প্রতি পুনরাবিষ্কার করেছেন। বাঙালি পাঠক এবং পাঠিকা হয়তো তাঁর নামটা পর্যন্ত জানে না।

লেখক এ বইয়ের ভূমিকায় নিবারণ চক্রবর্তীর মতো দাবি করতে পারতেন—কিন্তু করেননি

'আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে।
পরিচিত মহতের সরণীতে।।'

আর্টিমিসিয়া

(একটি ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড)

নারায়ণ সান্যাল

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

ARTEMISIA GENTILESCHI (1593-1653)

[Biographical novel on Artemisia Gentileschi, a painter who beguiled Post-Renaissance Italy with the beauty of her work.]

CODE NO. 72 A 29

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

রচনাকাল ঃ ২০০৪/ গ্রন্থক্রম ঃ ১৪০
পুনর্মুদ্রণ ঃ
নভেম্বর
২০০৮
২

বর্ণ-সংস্থাপন ঃ
শ্রীমতী সুস্মিতা দাস
কমপিউ হাউস
১৭২ রিজেন্ট এস্টেট, 'আশীর্বাদ', কলকাতা-৭০০ ০৯২

ছেপেছেন ঃ
বি. সি. মজুমদার
বি. পি. এম'স প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উত্তর)

প্রুফ-নিরীক্ষা ঃ লেখক

প্রচ্ছদ ঃ বিজন কর্মকার
[আর্টিমিসিয়া অঙ্কিত হলোফার্নেস বধ]

দাম
টাকা ৮৫.০০

কৈফিয়ত

বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সংক্রমণ আমার এক মজ্জাগত ব্যাধি। সেই পল্লবগ্রাহিতার অন্যতম ফসল জীবনী-উপন্যাস। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকজন ইতিহাস-বিখ্যাত মহামানবের জীবনী অবলম্বন করে কিছু কাহিনি রচনা করা গেছে। সেগুলি হয়তো সাহিত্যরীতি অনুসারী 'উপন্যাস' হয়নি, তবে পাঠযোগ্য কিছু একটা হয়েছে বলে আমাদের অনুমান। তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু স্বনামধন্য, সর্বজনপরিচিত। যেমন নেতাজী, গান্ধীজি বা রাসবিহারী বসু। আবার কেউ কেউ পশ্চিমখণ্ডে সুবিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে ধোঁয়াশা মাখানো। সাংস্কৃতিক দূরত্বে, ভাষাগত অন্তরায়জনিত কারণে। অথবা দোষ আমাদেরই—কথাসাহিত্যিকদের। আমরা তাঁদের নিয়ে বাঙলায় এতদিন কিছু লিখিনি। যেমন ধরুন মহাকবি দান্তে।

স্কুলজীবনেও জানতাম, তিনি *দিভিনা কোম্মেদিয়া* অনু-মহাকাব্যের লেখক। জানতাম—জীবদ্দশাতেই তাঁর নরক ও স্বর্গদর্শন ঘটেছিল। নরক ইনফারনো-পরিচ্ছেদে। স্বর্গ : বিয়াত্রিচের পূতপ্রেমে। ব্যস! ওইটুকুই ছিল আমার জ্ঞানদিগন্ত। চাকরিজীবনের প্রথম পর্বে বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পে মেরামতি করতে গিয়ে নজরে পড়েছিল প্রবেশদ্বারের ফটকে দান্তে-রচিত একটি পংক্তি Lasciate ogni speranza voi ch'-entre.

আজ্ঞে না, তাসকালিয়া-ইতালিয়ান ভাষায় নয়। ইংরেজি অনুবাদে

Abandon all hopes ye who enter here!

তার পাঁচ দশক পরে শ্রীশ্যামল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে নরকদর্শনের সৌভাগ্য হল। লিখে ফেলি *দান্তে ও বিয়াত্রিচে*।

বিড়লা-সংস্থার সাংস্কৃতিক বিভাগকে 'লাখো সুক্রিয়া'। তাঁরা যদি কলকাতায় *রোদ্যাঁ* প্রদর্শনীর আয়োজন না করতেন তাহলে ওই মহান শিল্পী আমার অধরাই থেকে যেতেন।

লিন্ডবার্গও একই রকম ঘটনাচক্রে।

রানিশঙ্করীর মতো অসাধারণ তেজস্বী মহিলাকেই কি চিনতে পারতাম, যদি দর্শন করতে না যেতাম *হংসেশ্বরী* মন্দির? একই রকম ভাবে নজর পড়ল প্রথম ভারতীয় মহিলা গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার *কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের* উপর। এন-এথতমা

বৃন্ধ প্রপিতামহী *রূপমঞ্জরী* বা হটু বিদ্যালঙ্কারও তো হারিয়ে যেতে বসেছিলেন ইতিহাসের নেপথ্যে। 'সংবাদ-প্রভাকর' হাতড়ে তাঁকে খুঁজে বার করার হিম্মৎ আমার ছিল না, যদি না গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেশচন্দ্র বাগলের আশীর্বাদ পেতাম। *লাডলি-বেগম*-এর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আমার স্কুলের ইতিহাস-শিক্ষক পূজ্যপাদ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি স্কুল-ক্রিকেট-টীমে ছিলেন আমার সঙ্গে ওপনিং-পার্টনার! *কনকলতা পুরকায়স্থের* নাম জানতে পারি 1940-এ—ম্যাট্রিকের ফলাফল প্রকাশ হতেই। কিন্তু আমার সেই সহপাঠিনীও হারিয়ে যেত বেমালুম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-কে ক'জন মনে রেখেছে? তার সন্ধানে বাঙলাদেশে ছুটে গিয়েছিলাম—স্বীকার করি, কিছু দেরিতে—মাত্র ছয় দশক। তাই তার সন্ধান পাইনি।

আবার ধরুন *শহিদ শের আলি*! সেও এক 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কেউ তার নাম জানে না। নিতান্ত ঘটনাচক্রে নামটা কানে গেল। যখন আন্দামানে গিয়ে সেলুলার জেল-এ শুনতে গেলাম *সোনে লুমিয়ে!* শুনলাম প্রখ্যাত অভিনেতা ওমপুরীর কণ্ঠে!

আনন্দ-স্বরূপিণী অঙ্কুমতিকে অবশ্য নিজেই খুঁজে বার করেছি জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসমুদ্রে। পরিব্রাজক মহাথের কুমারজীবের সন্ধান করতে গিয়ে।

তারপর ধরুন *ডক্টর জানুস কোরচখের* কথা! বিস্ময়কর চরিত্র। ভাবতে পারেন মৃত্যুর পরোয়ানা পাবার পরেও কেউ 'কন্‌ডেম্‌ড্ সেল'-এ বসে রবিঠাকুরের 'ডাকঘর' অনুবাদ করে চলেছে জার্মান থেকে পোলিশ ভাষায়! সানফ্রান্সিস্কোতে অনুজপ্রতিম শক্তি দাশ যদি আমাকে তাঁর কথা না জানাত, তাহলে কিছুতেই লেখা হত না *মৃত্যোর্মা অমৃতম্!*

হিটলার পত্নী মহিমময়ী এশ ব্রাউনের *প্রেমও* রয়ে যেত অজ্ঞাত।

আর্টিমিসিয়াও তেমনি এক অপ্রত্যাশিত ছপ্পড়ফোঁড় প্রাপ্তি। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিন্দিতার ভালোবাসায়। 1970 সালে তাঁর ছবি দেখেছি ফ্লোরেন্সের উফিজি সংগ্রহশালায়। দেখেছি নিশ্চয়; অথচ দেখিনি। মানে, নজর করে। কারণ আর্টিমিসিয়ার নামটাও তখন জানতাম না যে।

'জীবনে অনেক ধন পাইনি—নাগালের বাইরে তারা।
হারিয়েছি তার অনেক বেশি, হাত পাতিনি বলেই।'

নারায়ণ সান্যাল

বর্ষশেষ, ২০০৪

উৎসর্গ

চিত্রশিল্পী, শিল্পরসিক ও অরিগামীশিক্ষক
শ্রীপ্রদীপ দত্ত
পরমস্নেহাস্পদেষু

নারায়ণ সান্যাল
বইমেলা, ২০০৫

আর্টিমিসিয়া

আর্টিমিসিয়া জেন্টেলেস্‌চি। ওর নাম। কী বললে? এমন বিদ্‌ঘুটে নাম জীবনে শোননি? তা তো হতেই পারে। আমিও শুনিনি। আমার এখন বিরাশি চলছে। সারাটা জীবন ইউরোপীয় চিত্রকলা বিষয়ে অনেক বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তবু ও নামটা নজরে পড়েনি। নামটা প্রথম শুনলাম আমার বড় মেয়ে অনিন্দিতার কাছে। আমার অসুখের খবর পেয়ে সে এসেছিল সানফ্রান্সিস্কো থেকে। প্লেনে পড়তে পড়তে আসবে বলে এয়ারপোর্ট থেকে কিনে এনেছিল একটা ইংরেজি বই: The Passion of Artemisia. লেখিকার নাম: Susan Vreeland. আমেরিকায় ফিরে যাবার সময় বইখানা রেখে গেল। বললে, বাবা, পড়ে দেখ। দারুণ বই! পড়ে মুগ্ধ হলাম যতটা, অবাক হলাম তার চেয়ে বেশি। বিস্ময়ের হেতুটা সহজবোধ্য। ইউরোপীয় চিত্রশিল্প নিয়ে এতদিন ধরে এত বই ঘেঁটেছি অথচ এই আর্টিমিসিয়ার নামটা কোথাও পাইনি। কেম্ব্রিজ বায়োগ্রাফিক্যাল ডিক্সনারিতে ওঁর নাম নেই। ইউরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাস সংক্রান্ত কোনো বইতেও নামটা খুঁজে পেলাম না। আগেকার দিন হলে দৌড়াতাম জাতীয় গ্রন্থাগারে। এখন সেটা আমার দৈহিক ক্ষমতার বাইরে। এখন অগতির গতি: ইন্টারনেট। তার মাধ্যমে জানতে পারি: আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেস্‌চি (1593-1653) ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দির একজন নামকরা বিস্ময়কর মহিলা চিত্রশিল্পী। তাঁকে ফ্লোরেন্স আকাদেমির পূর্ণ সদস্য করা হয় মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে। এত কম বয়সে তাঁর পূর্বে কোনো মহিলা শিল্পী এ সম্মান পেয়েছেন বলে জানি না। পরেও পেয়েছেন কী? সেকালীন মহান শিল্পীদের অনেকের সঙ্গে আর্টিমিসিয়ার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—ক্যারাভাজ্জিও, অ্যান্থনি ভ্যান ডাইক, ভ্যালাসকেথ প্রভৃতি। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক গ্যালেলিওর স্নেহধন্যা হয়েছিলেন তিনি। বহুদিন দুজনের মধ্যে পত্র-বিনিময় হয়েছিল। আর্টিমিসিয়ার অনেকগুলি শিল্পকর্ম ছড়িয়ে আছে ইউরোপের বিভিন্ন প্রথমশ্রেণির চিত্রশালায়। বস্তুত শেষ রেনেসাঁ যুগে তিনি সব চেয়ে সার্থক মহিলা চিত্রশিল্পী। অথচ সমকাল তাঁকে প্রত্যাশিত মর্যাদা দেয়নি। শেষ বয়সে আর্টিমিসিয়া ইংলন্ডেশ্বরীর একটি প্রমোদ ভবনের সিলিং-এ চিত্রাঙ্কনের জন্য আহ্বান পান। কিছুটা কাজ করে আবার

ফিরে যান ইংলন্ড থেকে ইতালিতে। ইন্টারনেটের সংকলক বলছেন:

> After her death, she drifted into obscurity, her works often attributed to her father or other artists. Art historian and expert on Artemisia, Mary D. Garrard notes that Artemisia "has suffered a scholarly neglect that is unthinkable for an artist of her calibre". Renewed an overdue interest in Artemisia in recent years has recognized her as a talented seventeenth century painter and one of the world's greatest female artist.

বস্তুত ওই মেরী গ্যারার্ডই আধুনিককালে প্রায়বিলুপ্ত আর্টিমিসিয়াকে লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরেন। বিগত শতাব্দির একেবারে শেষ পর্যায়ে আর্টিমিসিয়ার উপর পাশবিক অত্যাচার সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে একটি ফরাসি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। পরিচালিকা Agnes Merlet. তার কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল—বস্তুত আর্টিমিসিয়ার উপর আধুনিককালে রচিত প্রথম জীবনী-উপন্যাস—The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art, লেখিকা ইতিপূর্বে উল্লেখিতা শ্রীযুক্তা গ্যারার্ড। পরের বইখানি আমার দিকদর্শন যন্ত্র: সুজান রচিত The Passion of Artemisia.

ফরাসি দর্শকেরা আর্টিমিসিয়ার জীবনীর উপর একটি চলচ্চিত্র সাম্প্রতিককালে দেখেছেন। ইংরেজি-জানা পাঠক-পাঠিকা বিগত দশকে অন্তত খানদুই বই পেয়েছেন ওই উপেক্ষিতা এবং নির্যাতিতা অসামান্যা মহিলা শিল্পী সংক্রান্ত। অথচ বঙ্গভাষা-ভাষী পাঠক-পাঠিকা আমার মতো অজ্ঞ—আর্টিমিসিয়া জেন্টেলেস্‌চি নামটাও শোনেনি। তাই নানান সূত্র থেকে তাঁর জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করে এই কাহিনি টি লেখা গেছে।

কোনও বিগত শতাব্দির বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী অবলম্বনে কাহিনি রচনা করার সময় কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিতেই হয়। কথোপকথন, আলাপচারী, ঘটনা-সংস্থাপন কথাসাহিত্যিকের মনগড়া হতে বাধ্য। কিন্তু তা যেন ইতিহাসকে অতিক্রম না করে। পারতপক্ষে তথ্যসীমা যেন লঙ্ঘিত না হয়। 'সত্যসীমা' অতিক্রম না করে। 'রামের জন্মস্থান' বাবরি মসজিদের গা-ঘেঁষে যদি না হয় নাই হল—তাবলে বাল্মীকির নায়ক রাম সকলকলাপারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও কাহিনির খাতিরে মন্দোদরীকে অপহরণ করতে পারেন না। আমাদের এ কাহিনিতেও তেমনি আর্টিমিসিয়ার দু-তিনখানি জীবনী এবং ইন্টারনেট-সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেছি। কাহিনির খাতিরে কোথাও কোথাও নাম-ধাম কিছু বদল করার প্রয়োজন হয়েছে। গ্যালিলিও, মিকেলাঞ্জেলো, কসিমো দ্য মেদিচি, করেজ্জিয়ো প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে শুধু সত্য নয়, তথ্যের সীমারেখাও অতিক্রম করা হয়নি।

কিন্তু কাহিনিতে প্রবেশ করার পূর্বে একটা কথা বিচার করা দরকার। ইয়োরোপীয় চিত্রকলায় মধ্যযুগে ওই একমাত্র প্রতিভাময়ী মহিলা চিত্রশিল্পীকে সমকাল এবং ভবিষ্যৎ যুগ এভাবে উপেক্ষা করল কেন? একটিই জবাব: যেহেতু সমাজ তথা সামাজিক ইতিহাস ছিল পুরুষের

কজ্জায়। হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার, রূপমঞ্জরী, দ্রবময়ীরাও বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ মুছে যেতেন, যদি না *সংবাদ প্রভাকরের* সম্পাদক ওই কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে তাঁদের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি গবেষক তা নজরুপা করতেন। ওই প্রতিভাময়ী পণ্ডিতদের জীবনী-ভিত্তিক উপন্যাস *রূপমঞ্জরী* রচনার সময়েও সংবাদের, তথ্যের অপ্রতুলতায় বিড়ম্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু তা অনতিক্রম্য ছিল না, কারণ লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল অষ্টাদশ শতাব্দির বঙ্গসমাজ। সেখানে আলোচনাকালে এসেছিল আধুনিকযুগে স্ত্রীশিক্ষার আদিকাণ্ডের প্রসঙ্গ এবং সেই পটভূমিকায় হটী বিদ্যালঙ্কারের কথা। এখানে, তা নয়। এখানে ইউরোপের চিত্রশিল্পের বাতাবরণে শেষ রেনেসাঁস আমাদের কাহিনির মূল উপজীব্য নয়। বরং সেই সময়ে জনৈকা প্রতিভাশালিনী মহিলা চিত্রশিল্পীর জীবন-যন্ত্রণার কথাই মুখ্য।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আর একজন ব্রিটিশ মহিলার কথা। মহিয়সী মহিলা: মারী উল্‌স্টোনক্রাফট্ (1759-1794)। রাজা রামমোহনের চেয়ে বয়সে তের বছরের অগ্রজা এবং হটী বিদ্যালঙ্কারের অপেক্ষা ষোল বছরের অনুজা। নাম শুনে চিনতে পারলে? পরিচয় দিলে নিশ্চয় চিনবে। এঁর কন্যার লেখা একটি অদ্ভুত উপন্যাস জগত-বিখ্যাত : *ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন*। সেই আত্মজাটি ছিলেন কবি শেলীর ধর্মপত্নী। এসব কথা জানালে সাধারণে তাঁকে চিনতে পারবে বলে উল্লেখ করছি। আসলে তিনি স্বীয় মহিমাতেই ইতিহাসে শাশ্বত স্থান পাওয়ার অধিকারিণী। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে পিতার সাতটি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়া। স্ত্রীশিক্ষার কোনও আয়োজনই ছিল না। নিজের প্রচেষ্টায় তিনি তিনচারটি ভাষা আয়ত্ত করে একটি বিখ্যাত গ্রন্থপ্রকাশকের (যোসেফ জনমন) দপ্তরে অনুবাদকের কাজ পান। মাত্র উনিশ বছর বয়সে। অচিরেই তিনি হয়ে পড়েন ওই প্রতিষ্ঠানের ভাষাতাত্ত্বিক উপদেষ্টা। কেম্ব্রিজ বায়োগ্রাফিক্যাল অভিধান বলছেন,

> In 1790 she produced her
> 'Vindication of the Right of Man', an answer to Burke's
> 'Reflection on the French Revolution', and in 1792 her
> 'Vindications of the Rights of Woman', a talented work which, advocating the equality, and the main doctrines of the later women's movement, made her both famous & infamous.

বস্তুত পরবর্তী যুগের 'Women's Lib' আন্দোলনের তিনি হলেন প্রথম উদ্‌ঘাতা। বিবাহপ্রথায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজে তিনিই প্রথম 'live together' জীবন প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন জনৈক মার্কিন পর্যটকের সঙ্গে। উনি গর্ভবতী হয়ে পড়ায় সেই মার্কিন নাগরিকটি অর্থাৎ 'নাগর'টি গোপনে ওকে ত্যাগ করে আমেরিকায় কেটে পড়ে। মারী উইলস্টোনক্রাফট আত্মহত্যা করতে যান। ব্যর্থ হন তাতে। সেটা 1795 খ্রিস্টাব্দের কথা। পরে তিনি উইলিয়াম গডউইনের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। পুনরায় গর্ভে সন্তান আসায় বস্তুত বাধ্য হয়ে গডউইনকে বিবাহ করেন। গর্ভস্থ সন্তানকে বৈধতা দান করতে। পাঁচমাস বিবাহিত জীবনের

অন্তে তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে (পরবর্তীকালে শেলীর পত্নী ও *ফ্রাঙ্কেনস্টাইন* উপন্যাসের লেখিকা)। মেয়েকে আঁতুড়ে রেখেই মারী উইলস্টোনক্রাস্ট প্রয়াত হন (1797)।

এতকথা বলছি যে কারণে সেই হেতুটা এবার ব্যক্ত করি: ইউরোপখণ্ডের প্রথম নারী বিদ্রোহিনী— যিনি পাদরিদের দেওয়া সামাজিক বিবাহপ্রথা সারাজীবনে স্বীকার করেননি, সেজন্য সমাজের সব নির্যাতন নীরবে স্বীকার করে নিয়েছেন,তাঁর কথা জানবার জন্য কেম্ব্রিজ বায়োগ্রাফিক্যাল অভিধান তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পেলাম না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল এই বিদ্রোহিণী মহিলা তাঁর আটত্রিশ বৎসর ব্যাপী জীবনে যদিও নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'মিস্ মারী উইলস্টোনক্রাফ্‌ট্' হিসাবে, তবু জীবনের শেষ পাঁচটি মাস তিনি তো ছিলেন 'মিসেস্ মারী গডউইন',— যাতে তাঁর সন্তানটি 'বেজন্মা' না হয়ে যায়।

যা ভেবেছি তাই। কেম্ব্রিজ জীবনীভিত্তিক অভিধানের মহা-মহা পণ্ডিতেরা ওই মহিলাটিকে একেবার উপেক্ষা করেননি। তাঁর কথা বলা আছে। তবে 'W' -তে পাবেন না। খুঁজতে হবে 'G' -তে। কারণ মৃত্যুর পাঁচমাস পূর্ব থেকে তো তিনি আর উইলস্টোনক্রাফট নন্— মিসেস্ গডউইন!

পুরুষশাষিত সমাজের 'সেই tradition সমানে চলেছে'।

মৈত্রেয়ী, গার্গী, মদালসা বা বিশ্ববারা তাঁদের সমকালে কী জাতের মর্যাদা লাভ করেছেন জানি না, কিন্তু মণ্ডন মিশ্রের সহধর্মিণী উভয়ভারতীকে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেনি। কারণ ওই পণ্ডিতা অদ্বৈতবৈদান্তিক আদি শঙ্করাচার্যকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন তথাকথিত 'নরকের দ্বার'কে উপেক্ষা করে তাঁর চতুরাশ্রম ভারতে টিকে থাকতে পারবে না। প্রতিটি যুগে প্রতিটি যুগাবতার শঙ্করাচার্যকে আবির্ভূত হতে হবে ওই দ্বারপথেই।

তত্ত্বকথা থাক। এবার বরং আর্টিমিসিয়ার কাহিনিটা শুরু করি। কিন্তু সে কথা আমি শোনাব না। আমি তাঁর কথা বলার কে? আর্টিমিসিয়া তাঁর জীবনযন্ত্রণার কথা নিজেই বলবেন। উত্তমপুরুষে— থুড়ি—উত্তম নারীতে।

—'এইদিকে একবার আয় মা। এর খাতায় একটা সই দিতে হবে'।

চোখ তুলে দেখি, উর্দিপরা একজন কোর্ট পেয়াদা এসে দাঁড়িয়েছে সদরদোরের সামনে। বাপিকে বলি 'তুমিই আমার হয়ে চিঠিটা নিয়ে নাও না বাপু। আমার হাত জোড়া।'

বাপি ধমকে ওঠে, 'আমি সই দিলে যদি কাজ হাঁসিল হত তাহ'লে বেহুদ্দো তোকে ডাকব কেন?'

অগত্যা স্টোভ থেকে কেটলিটাকে নামাতে হল। এগিয়ে এসে সই দিয়ে চিঠিখানা নিলাম। জানতে চাই, 'কী চিঠি ওখানা?'

—আদালতের সমন। শুক্রবার বেলা এগারোটার সময় তোকে কোর্টে হাজির হতে হবে। তিন নম্বর এজলাসে।

ঘাবড়ে যাই। আদালতকে কে না ডরায়? বলি, 'তা আমাকে ডাকার কী আছে? আমি তো আর আসামী নই।'

—আসামী তো হাজতে, কিন্তু তুইই তো বাদীপক্ষ? আবেদন তো তোরই তরফে আমি দাখিল করেছিলাম তাই তোকে ডেকে জজ-সাহেব সব কথা জেনে নেবেন না? আমার কথাতেই ওই হারামজাদাটাকে জেলে পাঠাবেন?

আরও ঘাবড়ে যাই। বলি, 'সব কথা মানে?'

—'সব কথা' মানে আমি যে অভিযোগটা এনেছি। ও যেটা অস্বীকার করেছে আর কি।

—অস্বীকার করেছে? আগাগোড়া অস্বীকার?

—না, মানে অনেক উল্টোপাল্টা অভিযোগ এনেছে। যে কথা জজ-সাহেব যাচাই করে দেখতে চান। তাই তোকে ডেকেছেন।

—ভিড়ে-ঠাসা খোলা-আদালতে আমাকে তিনি ওইসব প্রশ্ন করবেন? আমাকে জবাব দিতে হবে?

—তিনি কী করবেন না করবেন তা আমি কেমন করে জানব? তবে হ্যাঁ, বিচার হবে খোলা আদালতে। যা সত্যি সত্যি ঘটেছে তাই বলবি। তুই তো কোনো অপরাধ করিসনি। বিচারটা তো তোর হচ্ছে না। তোর ভয়টা কী?

—না, মানে ভয়ের কথা হচ্ছে না, কিন্তু......

—না! শরমের কথাও নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করলে সমাজে বদমায়েশদের দৌরাত্ম্য বাড়তেই থাকবে। বেশির ভাগ নির্যাতিতা মেয়ে মিথ্যা লোকলজ্জার ভয়ে সত্যঘটনার কথা চেপে যেতে চায়। তাতে ওই হারামজাদাগুলো আরও সাহস পায়। ভাবে, মেয়েটা লজ্জায় কারও কাছে এসব কথা বলবে না। জেল নয়, অগস্টিনোকে ফাঁসির দড়ি থেকে না ঝোলালে আমার তৃপ্তি হবে না।

মনে পড়ে গেল অগস্টিনোর মুখখানা। অগস্টিনো বাপির বন্ধু। বয়সে বছর পাঁচেকের ছোট। আমি তাকে আমার মেয়েবেলা থেকেই দেখে আসছি। তার কাঁধে চেপে 'ক্যাপিটল' -এ জৌলুস্ দেখতে গেছি। আমার চেয়ে সে না হোক বিশ বছরের বড়। আর এ বাড়িতে তার যাতায়াত বহুদিনের—মায়ের আমল থেকে। অগস্টিনো-কাকুকে বাপি ফাঁসির দড়ি থেকে ঝোলাতে চায়? না, না, সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। অন্যায় সে করেছে, কিন্তু তাই বলে ফাঁসির দড়ি থেকে.....?

না, আমি বোধহয় উল্টোপাল্টাটা লিখে চলেছি। কী জানেন? এসব কথা কীভাবে গুছিয়ে বলতে হয় তা তো জানি না। আপনাদের এখনো বলাই হয়নি আমি লোকটা কে? অগস্টিনো -কাকুর অপরাধটা কী? কেন তার বিরুদ্ধে বাপি আদালতে মামলা এনেছে।

প্রথমে নিজের পরিচয়টা দিই। আমার নাম আর্টিমিসিয়া। আমার বাবার নাম ওরাজিও জেন্টেলেস্চি। আমার বয়স এখন আঠারো। হ্যাঁ, আঠারোই হবে হিসাব মতো। কারণ এটা তো 1611? আমার জন্ম গত শতাব্দির শেষ দশকে, 1593 সালে। আমাদের নিবাস রোম শহরের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে; বলা যায় শহরতলিতে। সমুদ্রের কাছাকাছি। এবাড়িটা বানিয়েছিলেন আমার দাদু। তাঁর ছিল দুটি সন্তান। আমার নিজের কাকু সৈন্যদলে যোগ দেয়। যৌবনেই শহিদ হয়ে যায়। তাই দাদুর দেহান্তে বাপিই হল এ বাড়ির একচ্ছত্র মালিক। বাড়ি অবশ্য খুব ছোট। একতলা টালির তিন খানি ঘর। আর এক চিলতে উঠান পাড়ি দিয়ে রান্নাঘর। স্নানাগার বা শৌচাগার সে আমলে কোন বাড়িতেই থাকত না। স্নানের জন্য আছে

অতবড় সমুদ্র, আর পানীয় জল সংগ্রহ করে আনতে হত একটা সরকারি ইঁদারা থেকে। কপিকলের সাহায্যে। কুয়োতলায় হত মেয়েলি গুলতানি। পাড়ার নানান বাড়ির কেচ্ছা-কাহিনি।

আমার জন্ম এখানেই। জীবনের প্রথম দশটা বছর কেটেছে এই বাড়িতেই। তারপরের সাত বছর অন্যত্র। ফিরে আসি সতেরো বছর বয়সে। তারপর বছর খানেক এখানেই আছি। মাঝের ওই সাতটা বছরের অনুপস্থিতির কারণটি মর্মন্তুদ। মাতৃবিয়োগ। বাপি দ্বিতীয়বার বিবাহ করল না। সে হয়ে গেল ভবঘুরে চিত্রকর। কাঁহা কাঁহা মুলুকে ছবি এঁকে বেড়াত। সঙ্গে করে নিয়ে ঘোরা সম্ভবপর নয়। আবার দশ বছরের একটা মেয়েকে একা ফেলে রেখে যেতে ওর মন সরল না। সাহসও হল না। পাড়ার উঠতি জোয়ান ছেলেগুলো তো আর সুকদেব গোঁসাই নয়। সেই দশ-এগারো বছর বয়সেই আমি তা বুঝতে পারতাম। বাপিও। আমার এমন দুর্ভাগ্য—চেনা জানা মাসিপিসি—ওই যাকে বলে 'আপনজন', তা জুটলো না। বাপি আমাকে ভর্তি করে দিয়ে এল এ পাড়ার একটি চার্চ সংলগ্ন ফ্রেঞ্চ কনভেন্টে—'সান্তা ত্রিনিতা দেই মুন্তি' কনভেন্টে। ওরা এ রকম অসহায় বালিকা বা কিশোরীদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দেয়। আহার আশ্রয় তো দেয়ই, তার চেয়ে বেশি যা দেয় তা শিক্ষা, সহবত, ঘর-করনার কাজে তালিম। আর নিরাপত্তা।

মায়ের আকস্মিক তিরোধানে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম এ কথা অস্বীকার করব না। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন ভেবে দেখি ঈশ্বরের এই অভিশাপটা একদিক দিয়ে আশীর্বাদ। জীবনের প্রথম দশটা বছর লিখতে পড়তে শিখিনি। এ তল্লাটে সে আমলে মেয়েদের স্কুল বলে কিছু ছিল না। আমাদের পাড়ায় লেখাপড়া জানা মেয়ের সংখ্যা দুহাতের আঙুলে গুনে বলা যায়। তারাও কোনো শিক্ষয়িত্রীর কাছে লেখাপড়া শেখেনি—যেহেতু মেয়েদের কোনও বিদ্যালয়ই ছিল না। নাম সই করতে শিখেছে বাপ-দাদার কাছে।

কনভেন্টে গিয়ে আমার সেই সুযোগটা হয়ে গেল। রোমান স্ক্রিপ্ট্। মাদার সুপিরিয়র ছিলেন সহজ, সরল কিন্তু শক্ত মানুষ, আমাকে বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি 'নান্' নও, কিন্তু এই 'নানারি'টা আপাতত তোমার বাড়ি। নিজের বাড়ি মনে করে এর কাজকর্ম করতে হবে। সিস্টার গ্র্যাজেল্লা সেসব কাজ তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন। এছাড়া এখানে থাকতে হলে কিছু পড়াশুনাও শিখতে হবে বাপু।'

ছয়-সাতটা বছর কেটে গেল কনভেন্টে। আলাপ হল দিদিদের সঙ্গে। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। সিস্টার গ্র্যাজেল্লা, মাদার মার্গারেট, সিস্টার পাওলো। ওঁরা সকলেই বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। নানান কারণে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর জীবন বেছে নিয়েছেন। নানারিতে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল যে, প্রাকসন্ন্যাসিনী জীবনের কথা আলোচনা করা যাবে না। জিজ্ঞাসা করতে নেই। তাই ওঁদের আন্তরগভীরে যে কী বেদনা লুকিয়ে আছে, কীসের বিকর্ষণে ওঁরা সংসার ত্যাগ করে মা-মেরীর আশ্রয়ে এসেছেন তা জানা ছিল না। কে কুমারী, কে সধবা এবং কে বিধবা তাও আন্দাজ করা কঠিন। এ প্রসঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল সিস্টার গ্র্যাজেল্লার সঙ্গে। উনি বললেন, ওটা তোমার ভুল ধারণা আর্টিমিসিয়া। কোনো কিছুর আঘাতে,

সংসারের বিকর্ষণে যে সবাই মা মেরীর শরণ নিয়েছে এটা ধরে নিচ্ছ কেন? সেন্ট পীটর, সেন্ট পলস্ থেকে শুরু করে কত কত মহামানব তো যীসাসের আকর্ষণেই চার্চের দিকে ছুটে এসেছেন। তাই নয়?

তাঁদের কথা জানি না। আমি এসেছি মাকে হারিয়ে। আমি এসেছি আমার বাপি বিবাগী হয়ে যাওয়ায়।

মোট কথা অক্ষর-পরিচয় হল। শুধু সমকালীন ইটালিয়ান নয়। ল্যাটিন এবং ফ্রেঞ্চও। গ্রিকটা বড় কঠিন। ওটা হল না। আমাদের নানারিতে চিলেকোঠায় বাস করতেন একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। একমাত্র পুরুষ বাসিন্দা : ফাদার সিবাস্টিয়ান। অসাধারণ পণ্ডিত এবং শিল্পী। নানারি এবং চার্চের একটি যৌথ গ্রন্থাগার ছিল—অধিকাংশই ধর্মীয় পুস্তক। বাইবেল, অথবা ইহুদি ধর্মের উপর বই। এমনকি ওই যে সাগরপারে একটা বিচিত্র দেশ আছে না—হিন্দুস্থান—সেখান থেকে আমদানি করা সংস্কৃত ধর্মপুস্তক। সেসব বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা পর্যন্ত অন্য রকম। দশবার দশ হলে সেখানে পৃষ্ঠা সংখ্যা 'C' হবে না, হবে 100! শেষ দুটো গোল্লাকে বলে 'সাইফার,' 'জিরো'! কী যে জটিল হিসাব, মাথায় ঢুকতো না। ওকে নাকি বলে 'রকম-ই-হিন্দ্'।

যাক ওসব তত্ত্ব কথা। চিলেকোঠার ঘরে আমরা তিনটি নাবালিকা আশ্রয়প্রার্থিনী লেখাপড়া শিখতে যেতাম। ওই বুড়োর কাছে। আগেই বলেছি ফাদার সিবাস্টিয়ান দারুণ ছবি আঁকতেন। বড় বড় ক্যানভাসে। কখনো বা দেওয়ালে—ফ্রেস্কো অথবা ম্যুরাল। অবাক হয়ে দেখতাম বাপি কিংবা অগস্টিনো -কাকুর চেয়ে এই ফাদার সিবাস্টিয়ানের আঁকা ছবিগুলো অনেক অনেক বেশি প্রাণবন্ত। কী যে তফাৎ সে বয়সে বুঝিনি। এখন বুঝতে পারি। ফাদার সিবাস্টিয়ান ওই প্রয়োগবিদ্যাটি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, যাকে চিত্রশিল্পের ভাষায় বলে 'পারস্পেকটিভ' বা 'পরিপ্রেক্ষিত'। কে তাঁকে শিখিয়েছিল জানি না। বোধকরি তিনি ধ্যানের দৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ত্রিমাত্রিক জগতের প্রতিবিম্ব দ্বি-মাত্রিক চিত্রজগতে বিধৃত করতে হলে কিছু আঙ্কিক নিয়ম মেনে চলতে হবে। যাকে পরবর্তী যুগের শিল্পগুরুরা বলেছেন 'ভ্যানিশিং-লাইন,' 'আই-লেভেল', 'ভিয়ুপয়েন্ট' ইত্যাদি। এ-সব কথা সে আমলে আমার জানা ছিল না। এখন আপনাদের জানা আছে বলে লিখছি। ত্রিমাত্রিক জগতকে কী মন্ত্রে দ্বিমাত্রিক ক্যানভাসে বন্দি করা যায় সে বিদ্যাটি কে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জানি না।* হয় তো

* কাছের জিনিস বড় ও দূরের জিনিস যে ছোট দেখায় এ কথা মিশরীয় শিল্পীরা জানতেন না। গ্রিক ও ক্রিটান শিল্পীরা জানতেন ও মানতেন। কিন্তু জ্যামিতিক সূত্রগুলি জানতেন না। আঙ্কিক সূত্রগুলি সম্ভবত আবিষ্কার করেছিলেন ফ্লোরেন্সের অসামান্য প্রতিভাশালী ভাস্কর ফিলিপ্পো ব্রুনলেস্চী (1377—1446)। এ ছাড়া উচ্চেল্লো (1397-1475), লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (1452—1519)। উচ্চেলোরা পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। প্রয়োগ করেন। প্রয়োগ করে তা প্রমাণ করেন। আর্টিমিসিয়ার জমানায় শিল্পগুরুরা পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মকানুন জানতেন, কিন্তু, সাধারণ শিল্পীরা তা চোখের আন্দাজে করতেন। অভিজ্ঞান সূত্র মেনে নয়। যাঁর চোখ-আন্দাজ যত ভাল তাঁর ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত হত তত নিখুঁত, তাঁর ছবি হত তত বাস্তব, বা 'ফটোগ্রাফিক'। আর্টিমিসিয়া সেই সংক্রামণ যুগের শিল্পী।

তিনিও ছিলেন সন্ন্যাসী। কারণ ধ্যানের দৃষ্টি ছাড়া সেই ভোজবিদ্যা বোধহয় আয়ত্ত করা যায় না। বাপি সেটা আয়ত্ত করতে পারেনি। তার হাত খুলতো সূক্ষ্মকাজে। ফুল-লতা-পাতায়, 'চেরাব্' অর্থাৎ শিশুমূর্তিতে। কিন্তু বৃহত্তর পটভূমিকায়, যেখানে কাছের জিনিস এবং দূরের জিনিস একই চিত্রভূমিতে দেখানো হচ্ছে, সেখানে গোটা ছবিটা কেমন যেন অবাস্তব মনে হত। অগস্টিনো-কাকুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়েছিল ঠিক উল্টোটা। জ্যামিতিক হিসাবে নয়। শুধু চোখ-আন্দাজেই পরিপ্রেক্ষিত-ভোজবিদ্যাটা সে কিছুটা আয়ত্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু নরনারীর প্রতিকৃতিতে, ফুল- লতা-পাতায়—যেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলির টানের প্রয়োজন হত, সেখানে সে ব্যর্থ। তাই ওরা 'যুগলবন্দি' বায়না নিত। মোটামুটি ছকটা চারকোল-পেন্সিলে এঁকে দিত অগস্টিনো -কাকু, মামুলি লাইনগুলোও টানতো। আর যেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলির টানের খেল সেখানে এগিয়ে আসত বাপি।

যুগলবন্দিতে প্রতিটি প্রাচীরচিত্র উৎরে যেত দারুণভাবে। লেখাপড়ায় ছেলেবেলায় আমার মন ছিল না, শিখিনি, কিন্তু বাপি আর কাকুর ওই যুগলবন্দি শিশুকাল থেকেই আমায় কেমন যেন টানত। বাপির রঙিন চক নিয়ে মসৃণ মেঝেতে আঁকিবুঁকি ছবি আঁকতাম। কুকুর, বেড়াল, ব্ল্যাকবার্ড কখনো বা ঘুমন্ত শিশু।

মা মারা যাবার পর বাপি আমাকে কনভেন্টে রেখে কোথায় যেন চলে গেল। রোম ছেড়ে। অগস্টিনো-কাকুও গেল ওর সঙ্গে। কোন এক ব্যারনের প্রাসাদে ম্যুরাল আঁকার বায়না নিয়ে। কনভেন্টে থাকতে নিজের কাজটুকু সেরেই আমি ছুটে যেতাম সেই একান্তচারী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চিলেকোঠায়। দেখতাম হয় তিনি বই পড়ছেন অথবা ছবি আঁকছেন। একদিন জিগ্যেস করেছিলাম, 'ফাদার, আপনি তো গির্জায় যান না। প্রার্থনা করেন না?' বুড়ো বললে, 'ঈশ্বর এক একজনকে এক এক রকম প্রার্থনা-মন্ত্র শেখান। আমার প্রার্থনা-মন্ত্র এই রঙতুলি ক্যানভাস।' ওঁকে অনুরোধ করেছিলাম, ছবি-আঁকার প্রার্থনামন্ত্র আমাকেও শিখিয়ে দিতে। উনি রাজি হননি। ওঁর মতে সংসারে মেয়েদের জন্য ঈশ্বর অন্যজাতের কাজের ব্যবস্থা রেখেছেন। ছেলেরা হরেক-রকম কাজ করবে—লড়াই করবে, চাষ করবে, মাছ ধরবে, নৌকা বাইবে। কেউ বা মা-মেরীর ছবিও আঁকবে। কিন্তু মেয়েদের কাজ অন্যরকম। তারা করবে ঘরের কাজ। পুরুষদের জন্য রান্না করবে, ঘর-দোর সাফ রাখবে, সন্তান মানুষ করবে। ব্যস্! ছবি আঁকবে না।

এটাই ছিল সেকালীন বিশ্বাস। মেয়েদের ছবি আঁকা বারণ। যেমন বারণ গোঁফ-দাড়ি রাখা। কেন? ভগবান সে অনুমতি দেননি যে। তাই পাক্কা ছয়টি বছর স্কুলের বাগানে ফুল ফুটিয়েছি, চার্চের 'আইল' আর 'নেভ' ঝাড়পোচ করেছি, জল দিয়ে মুছেছি, আর অবসর পেলেই জুলজুল চোখে তাকিয়ে দেখেছি ফাদার সিবাস্টিয়ানের ছবি-আঁকা। তাতে বুড়ো আপত্তি করত না। কারণ আমি যে আর্নো নদী থেকে নানান রঙিন পাথর কুড়িয়ে আনতাম। ঘষে ঘষে কতরকম রঙ তৈরী করে দিতাম—সিপিয়া, কোবাল্টব্লু, ভার্মিলিয়ান অথবা ইয়ালো-অকার! নিজে হাতে না আঁকলেও ছবি আঁকার প্রক্রিয়াগুলো দেখে দেখে বেশ কিছুটা শিখে নিয়েছিলাম।

তারপর এক পাতাঝড়া 'ফল'-এর সন্ধ্যায় সিস্টার পাওলো ছুটতে ছুটতে এসে বলে,

আর্টিমিসিয়া! তোর সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। সাক্ষাৎকার-কক্ষে অপেক্ষা করছেন। কে বলত?

আমাদের পাড়ার মুদি বা বেকারির সেই ছোকরাটা নিশ্চয় নয়। বলি, বাপি?

—নীচে গিয়ে দেখ্।

যা ভেবেছি তাই। এই ছয় বছরে বাপি বেশ কিছুটা বুড়িয়েছে। ওর বয়স এখনো পঞ্চাশ হয়নি, কিন্তু দাড়িতে সাদা চাইনীজ হোয়াইট ছোপ।

—আরে ব্বাস! তুই যে একেবারে লেডি হয়ে উঠছিস রে, আর্টি!

এপাশ ফিরে দেখি বসে আছে অগস্টিনো-কাকু। সেও এতদিনে প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। বলি, তুমিও আর কচি খোকাটি নও অগস্টিনো-কাকু। কবে এলে রোমে?

বাপি বললে, সেসব খোশগল্প বাড়ি গিয়ে হবে। তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। মাদার সুপিরিয়ার ছাড়পত্র দিয়েছেন। এবার তুই আমার সঙ্গে রোমেই থাকবি। তোর ছুটি হয়ে গেছে!

অগস্টিনো বলে, আমরা দুজন এতদিন ছিলাম ভবঘুরে আর্টিস্ট। এখন হয়ে গেছি, রোমান গেরস্থ।

বাপি বলল যে, আমার ছুটি হয়ে গেছে। খুশিয়াল হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু আমি তো এখানে বন্দিনী ছিলাম না। এই 'নানারি'টাই যে ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে আমার বিকল্প 'হোম'। সিস্টাররা সবাই আমার দিদি—সিস্টার পাওলো, সিস্টার গ্র্যাজেল্লা। মাদার মার্গারিটা। তাঁর ভিতর আমি যে আমার হারিয়ে-যাওয়া মায়ের আভাস পেয়েছি। আর ফাদার সিবেস্টিয়ানের মধ্যে আমার না-দেখা দাদু। বাগানের প্রতিটি ফুলগাছের সঙ্গে আমার সখিত্ব। গির্জার প্রতিটি 'পিউ'র এর সঙ্গে, নুড়ি-বিছানো পথের প্রতিটি পাথরের সঙ্গে আমার মিতালী। কিন্তু উপায় নেই। এটাই জীবন। বাপির কাছে একদিন সময় চেয়ে নিলাম : কাল যাব।

একটি দিন সবাই আমাকে কত আদর করল, সোহাগ জানালো। অনেকেই বলল, সময় পেলে মাঝে-মাঝে এসে দেখা করে যেও। সিস্টার পাওলো বলে, ইচ্ছা থাকলেই কি হয়? ওর যদি বিয়ে হয় মিলান বা পাদুয়ায়? তাহলে কি যখন-তখন আসতে পারবে?

হঠাৎ বিয়ের কথা উঠে পড়ায় কেমন যেন লজ্জা পেলাম। কথাটা অবশ্য ঠিকই। এতদিন গির্জার বাগানে ফুল ফুটিয়েছি, এখন যে আমার নিজের ফুল-ফোটানোর সময় এসে গেছে।

মাদার সুপিরিয়ার আশীর্বাদ করে বললেন, শুনলাম খবর। তোমার বাবা রোমে ফিরে এসেছেন। তুমি তাঁর কাছে চলে যাচ্ছ। মা মেরী তোমাকে আশীর্বাদ করুন। একটা কথা মনে রেখ, আর্টিমিসিয়া : আমাদের এই আশ্রমও তোমার নিজের বাড়ি। যখনই ইচ্ছে হবে এসে আমাদের সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে যেও। এমনকি তুমি যদি এখানেই থেকে যেতে চাও—কখনো যদি সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে তাতেও আমরা সানন্দে স্বীকৃত। তুমি তো আমাদেরই মেয়ে।

আমার চোখে জল এসে গেল।

দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হলাম।

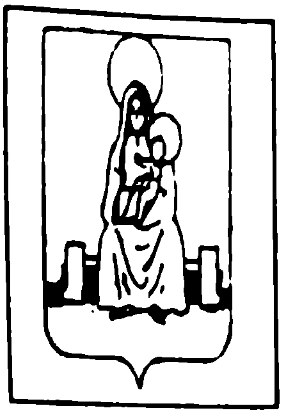

ভেবেছিলাম, পাঁচ ছয় বছর পরে বাড়িতে এসে দেখব সব কিছুর উপর দু-আঙুল ধুলোর আস্তরণ। অবাক হলাম সেটা দেখতে না পেয়ে। বাপি তিন-চারদিন আগে এসেছে। পাড়ার কিছু বেকার ছেলেকে দিয়ে সব ঝাড়-পোঁচ করিয়েছে। এমনকি কিচেনে বাসনপত্রগুলোও ঝকঝক করছে। সেগুলো অবশ্য পাড়ার বেকার ছেলেরা সাজায়নি। যে সাজিয়েছে তার সঙ্গে বাপি আলাপ করিয়ে দিল: 'এ হচ্ছে অ্যালেন। রান্নাবান্না বা ঘরের আর সব কাজ এই করবে। ও আমার সঙ্গেই এসেছে মিলান থেকে।...আর অ্যালেন, এই হচ্ছে আমার একমাত্র মেয়ে, আর্টিমিসিয়া।'

বুঝতে পারি, মহিলাটি আমার মায়ের বিকল্প। মায়েরই বয়সী। কিন্তু ওর মর্যাদাটা কতটুকু? ওকে কি গৃহকর্ত্রীর বিকল্প হিসাবে আমার 'বাও' করার কথা? না কি গৃহস্বামীর একমাত্র কন্যাকে সেই 'বাও' করবে? সমস্যা মিটে গেল ও হাতটা বাড়িয়ে দেওয়ায় 'তোমার কথা ওরাজিওর কাছে এত শুনেছি যে, ও পরিচয় করিয়ে না দিলেও আমি তোমাকে চিনে নিতে পারতাম।'

আমি আর কোন মুখে সে কথা বলি? বাড়িতে যে আমার জন্য এমন একটি বিস্ময় প্রতীক্ষা করছে সে কথা বাপি ঘুণাক্ষরেও জানায়নি। তাই বলি, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে আনন্দিত হলাম।

সত্যিই তা হলাম। দু-চার দিনের মধ্যেই। মহিলা বেশ কাজের। রান্নার হাতও ভালো। সব কিছু ঠিক মতো গুছিয়ে রাখে। আমার ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র ঠিক চিনে নিয়ে আমার ঘরে সাজিয়ে রেখেছে। বড়ঘরটা বাপির। আর পিছনদিকের ঘেরা বারান্দায় একটা জন্‌কে ক্যাম্পখাট পেতে অ্যালেন রাত্রিবাস করে।

অগস্টিনো আগের মতোই যাতাযাত শুরু করল। সে কোথায় থাকে জানি না। কাছে কোথাও হবে। শুনলাম, ওরা 'যুগলবন্দি' এবার রোমে একটা ম্যূরাল আঁকার কাজ পেয়েছে। রোমান ফোরাম-এর একপ্রান্তে প্যালটাইন হিলের পাদদেশে অবস্থিত সান্তা মারিয়া আন্তিকুয়ায়। তারই কার্টুন আঁকা হচ্ছে এখন। বিষয়বস্তু সবই বাইবেল থেকে। সিস্‌তিন চ্যাপেলে মিকেলাঞ্জেলোর অনবদ্য ম্যূরালের অনুসরণে।

দু-চার দিন পরে বাপি সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করল, তুই নাকি আজকাল ছবি আঁকছিস?

অবাক হলাম। প্রতিপ্রশ্ন করি, কে বলল?

—অ্যালেন। তুই 'নানারি' থেকে যেসব মালপত্র এনেছিস, তার ভিতর অনেকগুলি গোটানো ক্যানভাস ছিল। অ্যালেন বললে।

রীতিমতো বিরক্ত বোধ করি। হ্যাঁ, অনেকগুলি ক্যানভাস আমি নিয়ে এসেছি। কিছু সমাপ্ত, কিছু অসমাপ্ত। ফাদার সিবেস্টিয়ান যদিও আমাকে ছবি আঁকতে বারণ করেছিলেন—বলেছিলেন, স্ত্রীলোকে ছবি আঁকবে এটা ঈশ্বরের বিধান নয়—কিন্তু মাদার মার্গারিটা ছিলেন একেবারে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। তিনি আমাকে রঙ, তুলি, ক্যানভাসের জোগান দিতেন।

উনি নিজে ভালো ছবি আঁকতে পারতেন না বটে, তবে চিত্রসমালোচনায় প্রচণ্ড দক্ষ ছিলেন। ছবির ভালোমন্দ বুঝতেন। আমি লুকিয়ে ছবি আঁকতাম।

বিরক্ত হলাম এ কারণে যে, অ্যালেন আমাকে না জানিয়ে আমার জিনিসপত্র ঘেঁটেছে। আমি তাকে আমার আঁকা ছবি দেখাইনি, অথচ সে দেখেছে।

সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলি, হ্যাঁ অবসর সময়ে ওখানে ছবি আঁকার চেষ্টা করতাম। ওখানে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন—ফাদার সিবেস্টিয়ান—তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারেন। ক্যানভাস আর ম্যূরাল।

—তিনি তোকে শেখাতেন?

—না। তাঁর ধারণা স্ত্রীলোক ঘরকন্না করবে আর বাচ্চা মানুষ করবে। বড়জোর সেলাই-ফোঁড়াই। কিন্তু ছবি আঁকিয়ে নয়।

বাপি দৃঢ়স্বরে বললে, আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। বাইবেল কোথায় বলেছেন যে, মেয়েরা তুলি ধরলে নরকদর্শন অনিবার্য? কই দেখি তোর আঁকা ছবি।

ছবিগুলো দেখালাম। বাপি খুশি হল। বললে, 'তোর আঁকার হাত বেশ ভাল। ব্রাশের টান বেশ জোরালো। কিন্তু কম্পোজিশান এখনো দুর্বল। পারস্পেক্‌টিভ ঠিক হয়নি।'

বলি, জানি তা, অথচ ফাদার সিবাস্টিয়ানের পারস্পেক্‌টিভ একেবারে নিখুঁত। কিছু মনে কর না বাপি, তোমার নিজের পারস্পেক্‌টিভ-জ্ঞানও.....।

—সে কি আমি জানি নে? সেই জন্যেই তো ওই অগস্টিনো-ছোঁড়াটাকে গাধাবোট করে নৌবিহার করতে হয়। আসলে কি জানিস? ওই পারস্পেক্‌টিভ জ্ঞান একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। যেমন মানুষের গানের গলা, কবিতা লেখার ক্ষমতা। ও অঙ্ক কষে হয় না। ভগবান যাকে দেন.....।

আমি বাধা দিয়ে বলি, কিন্তু আমি দেখেছি ফাদার সিবাস্টিয়ান আঙ্কিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয় করতেন। ক্যানভাসের উপর কাঠের স্কেল ফেলে। একবার ডানদিকে থেকে। একবার বাঁদিক।

—কিন্তু অগস্টিনো তো তা করে না।

—তাই অগস্টিনো-কাকুর ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত মোটামুটি ঠিক হয়। নিখুঁত হয় না। ওর চোখ-আন্দাজটা ভালো।

—তা সেই চোখ-আন্দাজটুকু তার কাছে থেকে শিখে নে না?

—আপত্তি কী? যদি অগস্টিনো-কাকু রাজি হয়।

—রাজি হবে না কেন? এ তো ঘরোয়া ব্যাপার।

আমিও আন্দাজ করেছিলাম অগস্টিনো-কাকু রাজি হয়ে যাবে। প্রথম দিনই ও বলেছিল, 'আরেব্বাস! তুই যে একদম 'লেডি' হয়ে গেছিস!' একজন উদ্ভিন্নযৌবনা অষ্টাদশীকে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে উপনীত মানুষ ঘেঁষাঘেঁষি বসে ছবি আঁকা শেখাতে রাজি হবে না? এ কি হয়? বিশেষ মেয়েটি যদি গন্ধদ্রব্য মাখে?

অগস্টিনো-কাকু এক কথায় রাজি। আমার আঁকা তেলরঙের ছবিগুলো অনেকক্ষণ ধরে

দেখল। 'অধিকাংশ ছবিই কিছু হয়নি, তবে দু'একটি বেশ ভালোই উৎরেছে।' এটাই হল অগস্টিনো-কাকুর মত। বললে, তুই কিছু ভাবিসনে রে! আমি পনের দিনের মধ্যে তোকে পারস্পেক্‌টিভ ব্যাপারটা শিখিয়ে দেব।

আমি বলি, 'তুমি নিজে জ্যামিতিক নিয়মটা জান? দূরের জিনিস কী-নিয়মে ছোট হয়? 'ওয়র্মস্-আই-ভিয়ু' (পতঙ্গদৃষ্টি) আর 'বার্ডস আই ভিয়ু' (গরুড়াবলোকন)-এর জ্যামিতিগত পার্থক্যটা কী, তা জান?

অগস্টিনো-কাকু ঢোক গিলে বলে, অঙ্ক কষে বা জ্যামিতিক রেখা টেনে তা আঁকা যায় না। স্রেফ এলেম। আঁকতে আঁকতে সেটা আয়ত্তে এসে যায়। তুই দেখবি, তোরও এসে যাবে।

বুঝতে পারি, সেই গূঢ় রহস্যের প্রযুক্তিবিদ্যা অগস্টিনো-কাকু জানে না। তবে অভ্যাসবশে কিছুটা এলেম এসে গেছে ওর। সেটুকুই বা শিখে নিতে দোষ কি? চিত্রকর আমাকে হতে হবেই সেটাই আমার জীবনের ব্রত। যার কাছে যতটুকু শেখা যায় শিখে নিতে হবে।

অগস্টিনো-কাকু রোজই আমাকে শেখাতে আসে। আবার নতুন করে শুরু করতে হল 'স্টিল-লাইফ'—অর্থাৎ টেবিলের উপর ফুলদানি, বই, মূর্তি সাজিয়ে রেখাঙ্কন। একবার এপাশ থেকে একবার ওপাশ থেকে। কখনো পতঙ্গদৃষ্টিতে কখনো বা বিহঙ্গদৃষ্টিতে। কাকু যখন শেখাত তখন বাড়িতে আমরা তিনজন। বাপি সাত সকালে একটা প্রাসাদে কিছু ম্যুরালকাজের ফিনিশিঙ টাচ্ দিতে বেরিয়ে যেত। ফিরে আসতো পড়ন্ত বেলায়। আমরা দুজন বাইরের ঘরে বসে ছবি আঁকা শিখতাম, আর অ্যালেন রান্না করত অথবা ঘরের টুকিটাকি কাজ। কখনো হাত-অবসর হলে এসে বসত আমাদের ছবি আঁকা দেখতে। অগস্টিনোকে বলত, 'আমাকেও ছবি আঁকার কায়দাটা শিখিয়ে দাও না অগস্টিনো!'

কাকু বলত, তুমি মজুরি কী দেবে?

— তোমাকে রান্না করার কায়দাটা শিখিয়ে দেব।

—রান্না শিখে আমার কী ফয়দা? দোকানে গিয়ে একমুঠো লিরা ফেলে দিলেই তো উম্‌দা-উম্‌দা খাবার পাওয়া যায়।

—আর দাম মিটিয়ে দেবার সঙ্গতি যখন থাকবে না?

—তখন তোমার সামনে নতজানু হয়ে 'প্রপোজ' করব! বলব আমাকে বিয়ে কর।

—ফুঃ! আমি তো তা নির্ঘাৎ প্রত্যাখ্যান করব।

এভাবেই ওরা হাসি মশকরা করত আমার সামনে। একদিন অ্যালেন সামনের বেকারি থেকে রুটি কিনে আনতে গেল। নির্জনতার সুযোগে অগস্টিনো হঠাৎ বলে বসে, 'ভালো কথা! আচ্ছা আর্টিমিসিয়া, আমি আজ দুই সপ্তাহ ধরে তোমাকে ছবিআঁকা শেখাচ্ছি। তুমি তো দু-দুটি উইকেন্ডে আমায় মজুরি মিটিয়ে দিলে না? আমার মজুরিটা এবার দাও?'

আমি চমকে উঠি। বলি, 'মজুরি! মানে? সে-কথা তো কিছু হয়নি। আমার পকেটমানি এত সামান্য....'

অগস্টিনো বলে, 'আমার তো তা বিশ্বাস হয় না! তোমার দু-দুটি বুকপকেটই তো আজকাল উপচে পড়তে চায়।'

আম অবাক হয়ে যাই। ওর যে এমন কুমতলব হতে পারে আগে কোনোদিন চিন্তাই করিনি। সদর দরজাটা খোলাই আছে। অগস্টিনো ভ্রুক্ষেপ করল না। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার বাহুমূল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ফেলে। আমি চাপা গলায় বলি, 'এই! এসব কী হচ্ছে?'

—এখনো বোঝনি? তুমি মজুরি দিচ্ছ!

হঠাৎ আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মুখে চুমু খেল।

ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, আমি বাধা দেবার সময় পাইনি। আমার মনে হল আমার মুখটা ফাঁক করে কে যেন এক চামচ 'চিলি-সস্' ঢেলে দিয়েছে। ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে গেলাম কিন্তু ততক্ষণে ও আমার বাঁ দিকের বুকপকেট হাতড়াতে শুরু করে দিয়েছে! আমি কেমন যেন অবশ হয়ে গেলাম।

জীবনের আঠারোটা বছর আমার এমন পরিবেশে কেটেছে যে, এ জিনিসের স্বাদ জানা ছিল না। মাত্র দশ বছর বয়সে নানারিতে চলে যাই। ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ায় তখন আমি খুকি। স্কুলে জীবনে কখনো পড়িনি। 'বয়-ফ্রেন্ড' কাকে বলে জানি না। আর নানারির প্রমিলা রাজ্যে এইসব অভিজ্ঞতার প্রশ্নই ওঠে না।

একটু পরেই বেকারি থেকে ফিরে এল অ্যালেন। তখন আমরা দুজন বেশ কিছু দূরত্ব বজায় রেখে নিশ্চুপ বসে আছি। না আঁকছি ছবি, না করছি গল্পগাছা। অ্যালেন বুদ্ধিমতী। আমাদের দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বলে ওঠে, 'কী ব্যাপার? দশ-পনের মিনিট ছিলাম না, এর মধ্যে তোমরা দুজন ঝগড়া করলে নাকি?'

আমার কণ্ঠে স্বর ফুটল না। আমার ঠোঁটদুটো তখনো জ্বলছে। বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা জালে-পড়া স্যামনের মতো ঘাই দিয়ে দিয়ে উঠছে। অগস্টিনো ওকে বলে, 'তোমার এমন অদ্ভুত ধারণা হল কেন? ঝগড়া করেছি?'

— তোমরা ছবিও আঁকছ না। কথাও বলছ না?

—এ কি তোমার রান্নাঘরের ছ্যাঁকছোক? ছবি আঁকা একটা সাধনার কাজ। আমরা দুজন 'থিংক' করছিলাম।

—ও সরি! আমি বুঝতে পারিনি। আমি তো কোনোদিন আর্টিমিসিয়ার মতো আঠারো বছরের যুগটা পার হয়ে আসিনি!

অগস্টিনো চট্ করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'তোমার সঙ্গে সারাদিন আবোলতাবোল বকলে আমার চলবে না। আজ চলি। আমাকেও তো রুজি-রোজ গারের ধান্দায় থাকতে হয়।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বলে, কাল এই সময়ই আবার আসব। তুমি 'স্টিল-লাইফ' ছবিটাতে রঙ দেওয়া শেষ করে রেখ আর্টিমিসিয়া। 'স্টিল-লাইফ' অত স্টিল হলে চলবে কেন?

আমি ততক্ষণে সামলে নিয়েছি। বুঝতে পারি, স্টিল-লাইফ' বলতে ও কী ইঙ্গিত করছে! চুম্বনকালে আমার ছিল অসাড় ভূমিকা! বলি, 'না! আপনাকে আর আসতে হবে না। আপনাকেও তো রুজি-রোজগারের ধান্ধায় থাকতে হয়। আমি তো আপনাকে কোনো টিউশন ফী দিতে পারছি না!'

অ্যালেন যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ছিল। হঠাৎ থমকে থেমে গেল। শুধু আমার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনটুকুই নয়, সে নিশ্চয় খেয়াল করেছে যে, আমি কাকুকে 'তুমি' না বলে 'আপনি'

বলেছি। তাছাড়া অ্যালেনের সামনে 'টিউশান ফী' দেবার কথাটা বলা উচিত হয়নি। ও হয়তো ভাবছে ঠাকুরঘরে কে ঢুকেছে এই প্রশ্নের সঙ্গে কলা-খাওয়ার প্রসঙ্গ এভাবে উঠে পড়ল কেন?

পরপর তিন দিন অগস্টিনো এল না।

ইতিমধ্যে ব্যাপারটা আমি তলিয়ে দেখেছি। আমার এখন মনে হচ্ছে, হয়তো বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। সেই ক্ষণিক মুহূর্তের স্মৃতি যখন মনে ভেসে আসে তখন আর অনুভূতিটাকে শুধু 'চিলি-সস্'-এর আগুন ঝরা মনে হয় না। বুকপকেট হাতড়ে অগস্টিনো আমার কিছু কেড়ে নিয়েও যায়নি। অনুভূতিটার কথা মনে পড়লে এখনো কেমন যেন তিরতির করে শরীরটা। আসল ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারি। ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত ছিল বলেই ওটাকে অঘটন মনে হয়েছে। না হলে শহরতলির কোন রোমান অষ্টাদশীর কাছে অমন অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক নয়। আরও একটা কারণ আমাদের বয়সের পার্থক্য। ও যদি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা উঠতি জোয়ান হত.....

তাই চতুর্থ দিন অগস্টিনো-কাকু যখন হঠাৎ এসে হাজির হল তখন মনে মনে খুশিয়াল হয়ে উঠি। কাকু জানতে চায়, কী? ছবি আঁকার বাতিক ঘাড় থেকে নেমেছে?

বলি, বাতিক হবে কেন? আমি তো ছবি আঁকাটাকেই প্রফেশান হিসাবে নেব।

—ওমা, সে কি! মেয়েরা তো শখ করে ছবি আঁকে। তাদের আসল কাজ তো রান্না-বান্না, ঘর দোর সাফরাখা আর বাচ্চা সামলানো।

আমি জবাব দিই না। অগস্টিনো আমার অনুমতির অপেক্ষায় থাকে না। রঙ-তুলি-ক্যানভাস পেড়ে সাজাতে থাকে। অ্যালেন উঁকি মেরে দেখে। ফোড়ন না কেটে পারে না: এই তো ফিরে এসেছ তুমি বিন-মজুরিতেই বেগার খাটতে!

'অগস্টিনো বলে', 'এতে অবাক হবার কী আছে? তুমিও তো বিন্-মজুরিতেই ওরাজিওর হেঁসেল সামলাচ্ছ।'

অ্যালেন আর কথা বাড়ায় না। মন্তব্যটা অস্বস্তিকর।

ঘর নির্জন হলে অগস্টিনো বলে, 'সেদিন কি তুমি আমার উপর রাগ করছিলে?'

আমি নতমস্তকে বলি, 'না!'

—ভবিষ্যতে আমি যদি আবার কোনদিন মজুরি দাবি করি তুমি কি আপত্তি করবে?

—ও প্রসঙ্গে আমি কোনও আলোচনা করতে চাই না। আপনি যদি আমাকে ছবি আঁকা শেখাতে না চান—মানে বিনা মজুরিতে—তাহলে আমাকে সে কথা স্পষ্ট বলে দিন!

—তুমি হঠাৎ আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলছ কেন?

—কারণটা আমরা দুজনেই জানি। হয় তুমি চিরকাল যা ছিল তাই আছ, থাকবে। আমার 'কাকু'। অথবা 'আপনি' হয়ে গেছেন আমার বিন-মজুরির মাস্টারমশাই। সিদ্ধান্তটা তো আপনিই নেবেন।

—তোমার একটা ভুল হচ্ছে কিন্তু। মানুষ বদলায়, মানুষে-মানুষে সম্পর্কটাও বদলায়। যে স্কুলে ছিল ক্লাসফ্রেন্ড,পাশ করার পর সে হঠাৎ হয়ে যেতে পারে বয়ফ্রেন্ড। যে ছিল বয়ফ্রেন্ড সে হঠাৎ হয়ে যায় জীবনসঙ্গী। যায় না?

আমি বলি, 'ওটা তো তর্কের খাতিরে বলা। আমাদের ক্ষেত্রে তো তা হয়নি।'

—হয়নি? এককালে আমি ছিলাম তোমার কাকু। কাঁধে তুলে বড়দিনের জৌলুস দেখিয়ে এনেছি। তুমি বালিকা থেকে হয়েছ কিশোরী। এখন অষ্টাদশী তরুণী। আর আমি ক্রমে ঢলে পড়েছি পশ্চিম দিগন্তে।

—আপনার-আমার বয়সের ফারাকটা কিন্তু একটুও বদলায়নি।

—জানি। সেটাই যদি একমাত্র বাধা হয় তাহলে ওরাজিওকে বলব তোমার জন্যে পঁচিশ-ত্রিশের এক রাজপুত্র খুঁজতে। যে প্রিন্স চার্মিং সাদা ঘোড়ায় চেপে আসবে—ফেন্সিং মাস্টার! এক কাঁড়ি 'ডাওরি' চেয়ে বসবে, যা দেবার ক্ষমতা ওরাজিওর নেই।

অবাক হয়ে বলি, বুঝলাম না!

—এই সহজ কথাটা না বোঝার মতো কচি খুকিটি তো আর নও তুমি। এটুকুও কি বোঝ না যে, তোমাকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত ওরাজিও নিজের একটা হিল্লে করে উঠতে পারছে না?

—নিজের হিল্লে? মানে?

—তোমার কী ধারণা? ওই দু-কুড়ি ছুঁইছুঁই বয়সী অ্যালেন কেন বেগার খাটছে? ওরাজিওর সঙ্গে সঙ্গে কেন মিলান থেকে রোমে চলে এসেছে? রান্না প্র্যাক্‌টিস্ করতে?

আমি জবাব দেবার সুযোগ পেলাম না। অ্যালেন এসে জানতে চাইল, কাল সকালেও কি তুমি আসবে, অগস্টিনো?

—কেন বল তো?

—তাহলে কাল দুপুরে একটু সেন্ট্রাল মার্কেটে মান্ডে ফেয়ারটা ঘুরে আসতাম।

—সেন্ট্রাল মার্কেট। সে তো অনেকটা দূর। যাবে কী করে?

—ওই পপালিনোর 'গ্রসারিওয়াগনে'।

পপালিনো এ পাড়ার বৃদ্ধ মুদি। সপ্তাহে একদিন—প্রতি সোমবার—হাট থেকে সে বাজার করে আনতে যায়। এতদিন সঙ্গে যেত ওর ছেলেটা। সেটা সম্প্রতি বিয়ে করে পৃথগন্ন হয়েছে। পপালিনোর স্ত্রী চিররুগ্ন, তাই পপালিনো অ্যালেনকে জুটিয়ে নিতে চায়। অ্যালেনের স্বার্থ আছে। এই মওকায় শহরটা ঘোরা হয়, সস্তায় নিজের বাজারটাও সারা যায়, আবার বয়ফ্রেন্ডের অ্যাকাউন্টে ভালো-মন্দ আহারও জুটে যায়।

অগস্টিনো বলে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পার অ্যালেন। আমি কাল এই সময়েই আসব। আর্টিমিসিয়াকে একা একা থাকতে হবে না।

আমি আঁৎকে উঠি। বাপি তো সাত সকালেই বেরিয়ে যাবে, অ্যালেনও থাকবে না, ওই বুড়োটা যদি আবার তার মজুরি দাবি করে বসে? মুখের মধ্যে চিলি-সস্...শুধু তাই বা কেন? একেবারে ফাঁকা বাড়িতে ও যদি সেখানেই থামতে না চায়? তাড়াতাড়ি বলি, না না। কাল নয়। কাল দুপুরে আমি তো থাকব না।

অগস্টিনোর ভ্রূতে জাগল কুঞ্চন। বললে, কাল তুমি কোথায় যাবে?

—আমার .....ইয়ে....লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে।

—কোথায়?

—ওই তো।.....ইয়েতে.....নানারিতে—সান্তা ত্রিনিতা দেই মন্তিতে।

অ্যালেন অবাক মানে। বলে, কই আমাকে তো বলনি?

—না। বলা হয়নি। বলতাম।

অগস্টিনো অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ল চলি।

আশ্চর্য। আমার চালাকিটা অগস্টিনো ঠিক ধরে ফেলেছিল। পরদিন অ্যালেন সেজেগুজে তার শৌখিন বনেটের ফিতে চিবুকে বেঁধে পপালিনোর গ্রসারস্-ওয়াগনে অভিসারে বার হয়ে গেল। তার আধঘণ্টা পরেই সদর দোরে : ডিং-ডং।

উইপ হোলের ঢাকনা সরিয়েই আমার চক্ষুস্থির। দুহাতে প্যাকেট ঝুলিয়ে মূর্তিমানও এসেছেন অভিসারে—

আমাকে অঙ্কন-বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার অছিলায়।

—এ কি! তুমি! এখন হঠাৎ? কাল না বললাম দুপুরে আমার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে?

—বলেছিলে নাকি? ও হ্যাঁ, তাই তো! ঈশ! কী ভুলো মন দেখ আমার! একেবারে ভুলে গেছি, ভুল করে দুজনের খাবার প্যাকেট কিনে এনেছি। উপায় কি? ঠিক আছে! তুমি লাঞ্চের নিমন্ত্রণ খেতে যাও! আমি একা একাই দুজনের লাঞ্চ বসে বসে খাব এখানে।

বাধ্য হয়ে কেস ঘোরাই। বলি, ঠিক আছে। এসেই যখন পড়েছেন তখন আজ ক্লাসই করি।

—তুমি যদি অনুমতি কর তাহলে আমি গিয়ে খবর দিয়ে আসতে পারি। হঠাৎ একটা জরুরি কাজে আটকে পড়ায়.....

—না, না, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি না হয় কালই নিমন্ত্রণ রাখতে যাব।

—নিমন্ত্রণ তুমি আজই রাখবে। তবে বাড়িতে বসেই!

—তার মানে?

অগস্টিনো জবাব দিল না। রঙ-তুলি ক্যানভাসগুলো টেবিলে সাজাতে শুরু করে।

আমি জিগ্যেস করি, আমার সেদিনের সেই প্রশ্নটার জবাব কিন্তু তুমি দাওনি অগস্টিনো। ঈজেল-বোর্ড লাগাচ্ছ কিন্তু এখনো বলনি হঠাৎ মজুরি চেয়ে বসবে কি না।

অগস্টিনো ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ওটা তো স্বতঃসিদ্ধ! আমি জবাব দেব কী? কেনাবেচার এটাই তো রীতি। মজুরি না দিলে কেউ কি তোমাকে কিছু বেচতে রাজি হবে? এটা কি বিকিকিনির রীতি?

—তবে রঙ-তুলিগুলো টেবিলে নামিও না অগস্টিনো। মজুরি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার পকেট খালি।

—ও কথা বললে আমি শুনব কেন? আমি নিজে হাতে সমঝে নিয়েছি তোমার পকেট ভর্তি।

আমি রুখে উঠি, 'বেশ না হয় তাই। কিন্তু কোন দোকানে খরিদ করব তা কি দোকানদার বলবে? খরিদ্দার নয়? সেটাই কি বিকিকিনির রীতি?'

এবার ও একটু থমকে গেল। বলে, 'তা ঠিক। হয়তো আমারই ভুল। কিন্তু আমার ভুলটা হয়েছে তোমারই কারণে। আমি সেদিন জানতে চেয়েছিলাম,' আমি হঠাৎ তোমাকে চুমু

খেলে.......তোমার কি খারাপ লেগেছিল! তুমি জবাব দাওনি।

একটু গুছিয়ে নিয়ে বলি, ও প্রশ্নটা করা কি তোমার উচিত হয়েছিল কাকু? আমি জীবনে ও জিনিসের স্বাদ কখনো পাইনি....

—গ্রেশাস-মি! তোমার আঠারো বছরের জীবনে তুমি...

—প্লিজ অগস্টিনো। স্টপ ইট্। আমি নির্জন বাড়িতে তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করব না।

হঠাৎ কেমন যেন বদলে যায় ও। এক পা এগিয়ে এল সেই সেদিনের মতো। আমার বাম-বাহুমূল দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে। দরজাটা হাট করে খোলা। অবাধ রাস্তা থেকে কেউ যদি আমাদের চুম্বনরত অবস্থায় দেখতে পায় তাহলে মূর্ছা যাবে না। অথবা সিটিও মারবে না। নরনারীর মুখচুম্বন রোমের প্রকাশ্য স্থানে সেযুগে কিছু অপ্রত্যাশিত দৃশ্য ছিল না। কিন্তু আমার আশঙ্কা ছিল অগস্টিনো সেখানেই হয়তো থামবে না। তাই প্রতিবর্তী-প্রেরণায় হঠাৎ ডান হাতটা বাড়িয়ে কলমকাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে বলি, আমার হাতটা ছেড়ে দাও অগস্টিনো।

ও নজর করে দেখল। ধীরে ধীরে আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে দূরে গিয়ে বসল। বলল, সরি আর্টিমিসিয়া। আমি ভেবেছিলাম, এতদিনে অ্যাফ্রদিতে তোমার কানে কানে বলে গেছেন যৌবনের গোপনবার্তাটা! এটা একপক্ষের মজুরি মেটানো নয়। এই বিচিত্র খেলায় যে যতটা দেয়, সে ততটাই পায়। ভেবেছিলাম, এটা তুমি এতদিনে জেনেছ।

বলি, আমিও দুঃখিত অগস্টিনো। আমিও ভেবেছিলাম যে এতদিনে তুমি জেনেছ যে, এই বিচিত্র খেলাটা জীবনে শুধুমাত্র একজনের সঙ্গেই খেলতে হয়। পথে-ঘাটে সুযোগ পেলেই কুকুর-বেড়ালের মতো নয়।

গম্ভীর হয়ে গেল অগস্টিনো। বললে, তাহলে আমি চলি? একসঙ্গে বসে লাঞ্চ করাটা আর হল না।

—কেন অগস্টিনো? তুমি আজ কেন এসেছিলে? একটা যুবতী একা অরক্ষিত আছে একথাটা জেনে? একটা নারী দেহের আকর্ষণে?

ওর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। বলল, না! কথাটা আগের দিনই তোমাকে বলেছিলাম। আকারে ইঙ্গিতে। আজও বলছি। আরও খোলাখুলি। আমার বয়স হয়েছে। তোমার চেয়ে আমি অন্তত বিশ বছরের বড়। আমাকে তোমার জীবনসঙ্গী হিসাবে পছন্দ না হতেও পারে। পাঁচ-সাত বছর পরে তুমি যখন মধ্যযৌবনে পৌঁছাবে আমি তখন হয়তো বুড়িয়ে যাব। কিন্তু তোমার অবস্থাটাও তো সুবিধের নয়। তুমি যাকে উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বলে পছন্দ করবে তার বরপণও হবে আকাশচুম্বী। ওয়াজিওর পুঁজি কতটা তা আমার ভালো রকমই জানা। তাই ভেবেছিলাম.....

—ঠিক আছে অগস্টিনো। কথাটা আমি ভেবে দেখব।

—তুমি আমার উপর রাগ করনি তো?

—নিশ্চয় নয়।

—তাহলে আমাকে একটা জিনিস দেবে? না, না, ভয় পেও না। আমি তোমাকে স্পর্শ করব না।

অবাক হয়ে বলি, কী?

—আমি তোমার একটা স্কেচ আঁকব। 'রেড-চক' -এ। আধঘণ্টার ব্যাপার, রাজি?

—এতে আমার আপত্তি হবে কেন? আঁক।

অগস্টিনো এগিয়ে যায় সদর-দরজার দিকে। সেটা বন্ধ করে দেয়।

অবাক হয়ে বলি, এ কী? দরজাটা বন্ধ করলে কেন?

—বাঃ! আমি তোমার স্কেচ আঁকব না?

—তার সঙ্গে দরজা বন্ধ করার কী সম্পর্ক?

—ন্যুড স্কেচ আঁকব যে!

আমি লাফিয়ে উঠি, 'এই না! আমি তাতে রাজি নই!'

—অন্তত 'ব্যাকভ্যু'?

—না, না, না! দরজাটা খুলে দাও।

আমি নিজেই এগিয়ে যাই দরজাটা খুলে দিতে। ও বাধা দিতে এগিয়ে আসে। দৃঢ় হাতে আমার হাতটা চেপে ধরে। সেই সেদিনের মতো সবলে টেনে নেয় ওর বুকে। আমি বলতে গেলাম, 'ছেড়ে দাও! আমি চিৎকার করব কিন্তু।' বলা হয় না। 'চিলি-সস্'। আবার!

এ বিদ্যাটা ও ভালোই জানে। আমার প্রতিরোধ মুহূর্তে গলে গেল। আগুনের স্পর্শে মোমের মতো। ও রীতিমতো ওস্তাদ খেলোয়াড়। সঙ্গিনীর দেহে কোথায় কতটুকু চাপ দিতে হয় তা ভালোভাবেই জানে। হঠাৎ মনে হল আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। উত্তেজনায়। তখনই খেয়াল হল আমার ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ! ও জানে কোথায় ব্রা-র হুক।

একবার কোনোক্রমে বলতে পেরেছিলাম—মৃদুস্বরে—'প্লিজ, আর নয়। ছেড়ে দাও লক্ষ্মিটি।' তখন ও আমাকে পাঁজাকোলা করে বিছানার দিকে নিয়ে চলেছে!

প্রথম দিনটাতেই শুধু কষ্ট হয়েছিল।

তারপর আর হয়নি। আমার মনটা যেন দু-টুকরো হয়ে গেছে। একটা মন বলছে, 'এটা অন্যায়', 'এটা পাপ'—আর একটা মন বলছে, এ অনুভূতিটাও তো ঈশ্বরদত্ত ধন। অগস্টিনো দু-তিনদিন পর পর না এলে আমার মন ছটফট করে। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অগস্টিনো এলেই অ্যালেন কোনো ছুতো-নাতা করে বাইরে যায়। প্রথম প্রথম সেটা আমার খেয়াল হয়নি। বোধকরি অবচেতন মন এটা চাইত বলেই চেতন-মনে প্রশ্নটা জাগেনি। তারপর খেয়াল হল—এমন কাকতালীয় ঘটনা তো প্রতিদিন ঘটতে পারে না। বাপি একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সকাল-সন্ধে ছবি আঁকে। বাড়ি ফিরেই দুটি মুখে গুঁজে শুয়ে পড়ে। অ্যালেনও কিছু সন্দেহ করেনি।

নাকি, আমারই ভুল? অ্যালেন সন্দেহ করেছে। সন্দেহ নয়। জানতে পেরেছে। সেদিন অগস্টিনো যে কথাটা বলেছিল তা ফাঁকা বুলি নয়। অ্যালেন মিলান থেকে রোমে পেটভাতায় বেগার খাটতে আসেনি। সে এ বাড়ির মালকিনের ফাঁকা গদিতে উঠে বসতে চায়। বাধা একটাই—এই পোড়ারমুখি। এটা যতদিন না বিদায় হচ্ছে ওরাজিও নতুন সংসার পাতবে না। তাই যেন-তেন-প্রকারে এই অনূঢ়া অষ্টাদশীকে বিদায় করতে সে তৎপর।

একদিন সুযোগ মতো আমি অগস্টিনোকে চেপে ধরলাম। আর দেরি করা উচিত হবে না। এবার অগস্টিনো খোলাখুলি বলুক বাপিকে। অনেক ওজর-আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত ও রাজি হল।

ব্যস! সেই শেষ! তারপর থেকে অগস্টিনো এ বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। দু-দিন, চার-দিন, সপ্তাহ খানেক কেটে যাবার পর বাপিকে জিজ্ঞেস করি, 'অগস্টিনো-কাকু আর আসছে না যে?'

—কেন? ও তোকে বলে যায়নি? ও তো মিলানে গেছে।

আমি জানতে চাই, 'মিলান! মিলানে কেন?'

—সেখানেই তো ওর বাড়ি। বউ-বাচ্চারা থাকে। কেন তুই জানতিস না?

আকাশ ভেঙে পড়ল আমার মাথায়।

না, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার কিছু নেই। অগস্টিনো আমার দৃষ্টিতে কিছু রূপকথার রাজপুত্র ছিল না। তার প্রেমে আমি কিছু হাবুডুবুও খাচ্ছিলাম না। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করব কেমন করে যে, প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তবাসী সেই লোকটিই আমার জীবনে প্রথম পুরুষ? সেই তো প্রথম এসে একটা অজানা-অচেনা অনুভূতি রাজ্যের সিংদরজাটা আমার সামনে খুলে ধরল! আঘাতটা অন্য হেতুতে। অগস্টিনো আমার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে পালিয়ে গেল। সে প্রবঞ্চক! আমার দেহটা ভোগ করেছে। ভালোবেসে নয়। ভালোবাসার অভিনয় করে। একটা নিরুদ্ধ আক্রোশে আমার মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। লোকটা আমাকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গেছে। সে এখন আমার নাগালের বাইরে।

বাপি নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। কথা বলে কম। সরল বিশ্বাসে সবাইকে কাছে টানে। তার একবারও সন্দেহ হয়নি যে, তার এতদিনের আকৈশোরের সঙ্গী, বন্ধু এভাবে তার মেয়ের সর্বনাশ করে পালাতে পারে। তা থাকলে সে আমাকে সাবধান করে দিত। অগস্টিনো যে বিবাহিত অন্তত এই সহজ সরল কথাটা আমাকে জানিয়ে রাখত।

কিন্তু অ্যালেন? এ নাটকে তার ভূমিকাটা কী? তার বাড়ি মিলানে, যেখানে অগস্টিনো বিয়ে করেছে। তার মানে অ্যালেন নিশ্চয় জানত যে, অগস্টিনো বিবাহিত। তাহলে সে কেন ইচ্ছা করে আমাদের বারবার সুযোগ করে দিত? সে কি চেয়েছিল? আমি প্রচণ্ড বিপদে পড়ি? এভাবেই পথের কাঁটা বিদায় করতে চেয়েছিল? আশ্চর্য কুচক্রী মহিলা!

অমন শান্তশিষ্ট মানুষটা যে এভাবে ক্ষেপে উঠবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার উপর সে একটুও রাগারাগি করল না। তার সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ল অগস্টিনোর উপর। অগস্টিনোর বিরুদ্ধে সে নালিশ ঠুকে বসল।

আমাদের আমলে বিচার পদ্ধতি ছিল অন্য রকম। খ্রিস্টান-জগতে যাবতীয় অন্যায়ের বিচার করতেন চার্চ। সুপ্রীম কোর্ট হচ্ছেন মহামান্য পোপ। আমাদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন মহিমার্ণব পঞ্চম পোপ পল। তবে তিনি তো আর এসব ছোটখাট বিচার করবেন না। তাই বাপির আবেদনটা চলে গেল তাঁর Locumtenentie (প্রতিনিধি)-র কাছে। তিনি হচ্ছেন দ্য ইলাসস্ট্রিয়াস লর্ড হেরোনিমো সেলিসিও। রোমের প্রধান বিচারপতি।

[**লেখকের সংযোজন**: ওরাজিও জেন্টিলেস্‌চির আঁকা কোনো ছবির সন্ধান আমরা পাইনি। কিন্তু আদালতে পেশ করা তাঁর দরখাস্তের একটি কপি রোমান আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। তুলট কাগজে, খাগের কলমে, রোমান ভাষায়। তার একটি ইংরেজি আক্ষরিক অনুবাদও সংগ্রহ করা গেছে। বিশেষ কারণে সেটি এখানে দাখিল করা গেল:

"Agostino Tassi deflowed my daughter Artemisia and did carnal actions by force many times, acts that brought grave and enormous damage to me, Oragio Genteleschi, painter and citizen of Rome, the poor plaintiff, so that I could not sell her painting talent for so high a price."

বুঝুন।

তাঁর অষ্টাদশী কন্যাকে অরক্ষিত অবস্থায় একাধিকবার বলাৎকার করায় আবেদনকারী ক্ষুব্ধ! কেন? তাঁর অপমানিতা কন্যার আঁকা ছবি যথোপযুক্ত দামে বিক্রয় করা যাচ্ছে না। সেকালে, আজকের মতো, এই ছিল নারীর মূল্য।]

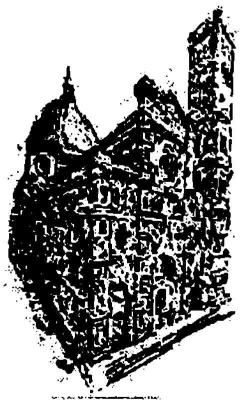

মহামান্য বিচারক লর্ড সেলিসিওর আদালতে সাধারণত জনসমাগম সচরাচর বেশিই হয়। বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে একজন যদি হয় মহিলা, বিশেষত যুবতী, তাহলে ভিড়টা তো বেশি হবেই। আজ আবার একটা মজাদার মামলা হবে: বলাৎকারের কিস্‌সা! ফলে আদালতে তিলধারণের ঠাঁই নেই। সবাই বেকার। মজা লুটতে এসেছে।

মহামান্য বিচারকের আদেশে আসামীকে মিলান থেকে পাকড়াও করে আনা হয়েছে। একথা সবাই জানে; কিন্তু সে যে একটা পালটা মামলা ঠুকে দিয়েছে এটা সবাই জানে না। ওরাজিও জানে। আমাকে জানায়নি। সাহস পায়নি। অগস্টিনো যে উকিলের পরামর্শে এমন একটা মারাত্মক উল্‌টো প্যাঁচ কষেছে তা ছিল ওরাজিওর স্বপ্নের অতীত।

বাপি আমার পিঠে একটা হাত দিয়ে বলল, তোকে হুজুর কিছু প্রশ্ন করবেন। তুই সব কিছু সত্যি সত্যি জবাব দিবি। ভয় পাস নে।

আমি বলি, সত্যি কথা বলতে ভয় পাব কেন? তবে এত লোকের সামনে হুজুর কী জিগ্যেস করবেন জানি না তো......

—না, না, আদালতে মানুষজন আছে কিনা তুই চিন্তাই করিস না। নির্জলা সত্যি কথা বলে যাবি। না হলে ওরা তোর হাতে সিবিল (Sibille) পরিয়ে দেবে।

—সিবিল? তার মানে?

—সিস্‌তিন চ্যাপেলে মিকেলাঞ্জেলোর আঁকা সিবিল-এর (Sibille) ছবি দেখেছিস্ মনে নেই? ডেলফিন সিবিল আর লিবিয়ান সিবিল? ওঁরা হচ্ছেন গ্রিক দেবী। স্ত্রীলোকদের সত্যকথা বলতে বাধ্য করেন।

—বাধ্য করেন? কী ভাবে?

—ওই সিবিল (Sibille)-এর সাহায্যে। সাক্ষীর হাতে ওটা পরিয়ে দেওয়া হয়। হুজুরের যদি সন্দেহ হয় যে, সাক্ষী মিছে কথা বলছে তখন ওই যন্ত্রে চাপ দেওয়া হয়।

—তাতে ব্যথা লাগে না?

—লাগে। যদি সাক্ষী মিছে কথা বলে। যদি সে সত্যি কথা বলে তাহলে কোনো ব্যথা লাগে না।

নকীব হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে ওঠে : হুঁ-শি-য়া-র। মহামহিম লর্ড হেরোনিমো

সেলিসিও, লকামটেনেন্টি আদালতে প্রবেশ করছেন।

যে-যেখানে ছিল উঠে দাঁড়ায়। আদালতকক্ষের একদিকে একটা কাঠের উঁচু মঞ্চ ছিল। মহামান্য ন্যায়াধীশ দু-তিনটি ধাপ অতিক্রম করে তার উপর একটি সিংহাসনে উঠে বসলেন। তাঁর মাথায় রেশমের একটি স্কাল-ক্যাপ, হাতে রূপার ন্যায়দণ্ড। স্কার্লেট রঙের জমকালো জোব্বাটা হাতলের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন। 'পাপাল নোটারি' অর্থাৎ সেক্রেটারি এতক্ষণ ছুরি দিয়ে কিছু খাগের কলম কাটছিলেন। সেগুলি নামিয়ে রেখে রেকর্ডখাতাটা টেনে নিয়ে ঘোষণা করলেন, "আজ চোদ্দই মে, ইয়ার অব দ্য লর্ড ষোলশ' বারো। প্রথম মামলা ওরাজিও জেন্টিলেসচি বনাম অগস্টিনো তাসি।"

বিচারক চোখ বুজে শুনছিলেন। তিনি কোর্ট-ইন্সপেক্টরকে আদেশ করলেন, চার্জ শোনাও এবং মামলার চুম্বকসার দাখিল কর।

কোর্ট-ইন্সপেক্টর মামলার সংক্ষিপ্তসার শুনিয়ে দিলেন। "ওরাজিও জেন্টিলেসচি অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর সহকর্মী অগস্টিনো তাসি সুযোগ পেয়ে তাঁর কন্যা আর্টিমিসিয়াকে বলাৎকার করে। একবার নয়, উপর্যুপরি কয়েকবার। কয়েকদিন ধরে। আসামী অগস্টিনোকে মিলান থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। সে একটি জবানবন্দিতে বলেছে যে, সে ওই অষ্টাদশী যুবতীকে আদৌ বলাৎকার করেনি। তার সম্মতিসাপেক্ষে সে ওই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করেছে। এজন্য সে ওই স্ত্রীলোকটিকে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিয়েছে।"

বিচারকের আদেশে আসামী এবং অভিযুক্তকে সনাক্ত করা হল।

প্রথমেই আমার ডাক পড়ল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। আমি উঠে বসলাম একটি টুলে। নকিব এগিয়ে এসে একখণ্ড হাতে-লেখা পুঁথি মেলে ধরল আমার সমুখে। শুনলাম, সেটি 'দ্য হোলি বাইবেল'। সেটিতে হাত রেখে আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হল, 'যাহা বলিব সত্য বলিব; সত্য বই মিথ্যা বলিব না।'

বিচারক আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চন করলেন। বললেন, সিনোরিনা জেন্টিলেসচি! আশা করি আপনি জানেন যে, সাক্ষী দানকালে আপনার হাতে একটি সিবিল পরিয়ে দেওয়া হবে। রতনচূড়-এর মতো একটি অলঙ্কার। এটিকে বলে সিবিল।

আমি কিছু বলার আগেই একজন দৈত্যাকার কর্মী এগিয়ে এল আমার দিকে। একগাল হেসে বললে, সিনোরিনা, আপনার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিন।

এবারও আমার কথা বলার সুযোগ হল না। লোকটা আমার হাতদুটো টেনে নিয়ে ওই অদ্ভুত নাগপাশটা জড়িয়ে দিল। প্রতিটি আঙুলের গোড়ার একটি প্যাঁচ দিয়ে দুটি হাতের কব্জিতে এমনভাবে জড়িয়ে দিল যে আমি জোড়হস্ত হয়ে গেলাম। লোকটার কাছে জানতে চাই, এটা পরালে কেন? এর তো, কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি মিথ্যা কথা বলি না। বলব না।

লোকটা হাঙরের মতো দাঁত বার করে হাসল। বলল, আমি বাইশ বছর এখানে চাকরি করছি, সিনোরিনা। কয়েক হাজার সাক্ষীর জবানবন্দি নিয়েছি। এমন একজনও পাইনি যে

সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে বলে, 'যাহা বলিব মিথ্যা বলিব : মিথ্যা বই সত্য বলিব না'; অথচ সিবিলের প্যাঁচ পড়লেই গলগল করে সত্য কথা বেরিয়ে আসে।

আমি জনতার মধ্যে বাপিকে খুঁজলাম। দেখতে পেলাম না। সামনেই একটা টুলে বসে আছে আসামী, অগস্টিনো। তার হাতে হাতকড়া। আমি বিচারকের দিকে তাকাই। জানতে চাইছিলাম আমাকে কোনো প্রশ্ন করার আগেই ওই নাগপাশটা আমার আঙুলে জড়ানো হচ্ছে কেন। কিন্তু সে সুযোগ হল না। মহামান্য বিচারক তার আগেই প্রশ্ন করে বসলেন,

—সিনোরিনা জেন্টিলেসচি, আপনার বয়স কত?

—আঠারো বছর দুই মাস।

—তবে তো তুমি সাবালিকা। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, আমি যা-যা জানতে চাইব তার সত্য জবাব দিলে তবেই আমার পক্ষে ন্যায় বিচার করা সম্ভব। কী বুঝতে পারছ?

আমার নজর হয়েছে যে, ধর্মাধিকার আমার বয়স জানার পর 'তুমি' সম্বোধন করছেন। তিনি বাপিরই বয়সী। হয়তো আমার বয়সী মেয়ে আছে তাঁর। জবাবে বলি, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। কিন্তু আমার আঙুলে এই নাগপাশ জড়ানো হল কেন?'

—সেটা কেউ তোমাকে বুঝিয়ে বলেনি বুঝি? ওটা হচ্ছে দেবী সিবিলের (Sybil) আয়ুধ সিবিল (sibille)। ওটা আঙুলে পরানো থাকলে কেউ মিছে কথা বলতে পারে না। এখন আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। সত্য জবাব দাও : তোমার পাড়ার মুদি পপালিনো-র বড় ছেলে মডেনেসিকে তুমি চেন? সে তোমার বয়ফ্রেন্ড?

—মডেনেসিকে আমি দেখেছি। চিনি। তার দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনতে যখন গেছি তখন দু-চারটি কথাও হয়েছে। কিন্তু সে কোনদিনই আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল না।

—'ছিল না' বলছ কেন? সে কি এখন বেঁচে নেই?

—না, না। পপালিনো আঙ্কেলের সেই ছেলেটা বিয়ে করে অন্য পাড়ায় চলে গেছে। এখন কোথায় থাকে আমি জানি না।

—বাঃ! সে খবরও তুমি রাখ দেখছি। তার বয়স কত হবে?

—ঠিক জানি না হুজুর। বছর সাতাশ-আঠাশ।

—সে তোমার বয়ফ্রেন্ড ছিল না? তাহলে তুমি তার সঙ্গে ডেটিং করতে কী করে?

—ডেটিং? আমি? ওই ছেলেটার সঙ্গে?

—হ্যাঁ! তাই বলছি আমি। তোমার সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক ছিল না? কোনোদিন হয়নি?

—নিশ্চয় না, হুজুর!

বিচারক সেই দৈত্যাকার লোকটির দিকে ফিরে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। হঠাৎ আঙুলে নাগপাশের চাপ পড়ল। এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখি আখ-মাড়াইয়ের কলের একটি ছোট সংস্করণের মতো যন্ত্রে নাগপাশের দুটি প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর সেই দৈত্যের মতো লোকটা একটা হাতল ঘোরাচ্ছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে আঙুলে। ডানহাতের মধ্যমা আর অনামিকায় কে যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছে। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে গেলাম। ঠিক তখনই চোখাচোখি হয়ে গেল অগস্টিনোর সঙ্গে।

অগস্টিনো! মানে যে লোকটা আসামী। যার বিচার হচ্ছে। বলাৎকারের অপরাধে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। আমার দৈহিক যন্ত্রণাটা উপভোগ করছে। আমি দাঁতে-দাঁত দিয়ে পড়ে রইলাম। ওই অগস্টিনোর সামনে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।

লক্ষ্য করিনি। বিচারক নিশ্চয় দৈত্যটাকে কিছু ইঙ্গিত করেছিলেন। কারণ সিবিলের চাপ হঠাৎ কমে গেল। তাকিয়ে দেখি, আঙুলের গোড়ায় বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠেছে। দু-এক ফোঁটা টপটপ করে ঝরে পড়ছে।

—তুমি স্বীকার করবে না যে, মডেনেসি-র সঙ্গে তোমার যৌন সম্পর্ক ছিল? তোমার বাবা যখন ছবি আঁকতে বার হয়ে যেত তখন দুপুরবেলা ওই ছেলেটা কি তোমাদের বাড়ি আসত?

এবার তাকিয়ে মনে হল বিচারকের মুখটাও রাক্ষসের মতো। দাঁতগুলো বড় বড়। চিবুক আর গলা একাকার। থলথলে। বরাহ-আকৃতি।

—স্বীকার করা-না-করার কোনও প্রশ্ন উঠছে না হুজুর। পপালিনো আঙ্কেলের ছেলের সঙ্গে অমন বিশ্রী সম্পর্ক আমার আদৌ ছিল না। কোনোদিনই নয়!

—অলরাইট! অলরাইট। এবার বল তো সেনোরিটা, তোমার নাভিমণ্ডলের দু-চার আঙুল নীচে, বামদিক ঘেঁষে একটা জন্ম-জড়ুল চিহ্ন আছে কি না?

আমি বজ্রাহত! হুজুর বললেন, 'এ প্রশ্নের জবাব তুমি নাও দিতে পার। কারণ ডাক্তারি পরীক্ষায় সত্যটা বোঝা যাবে। সিবিলের চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তুমি বরং আমাকে বল: তোমার কী আন্দাজ? তোমার গোপনাঙ্গের এই গূঢ় তথ্যটা আমি কেমন করে জানলাম?'

আমি তখনো বজ্রাহত। উনি তাগাদা দেন, 'কী হল? বল? কিছু তো বলবে?'

—আমি জানি না হুজুর!

—অলরাইট! শোন এবার, মডেনেসি—যাকে তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ড হিসাবে মেনে নিতে রাজি হচ্ছ না—সে তার জবানবন্দিতে একথা আমাকে জানিয়েছে। এবার বল সে কী করে জানল?

দর্শকদলে একটা গুঞ্জন জাগে। কে যেন অস্ফুট বলে ওঠে, 'মেয়েটা কী বেসরম রে! একেবারে বেশ্যা!'

লকুমটেনেন্টে সজোরে তাঁর হাতুড়িটা টেবিলে ঠুকলেন। স্তব্ধতা ফিরে এল আদালতকক্ষে। বিচারক বলেন, দর্শকাসন থেকে কোনো মন্তব্য শোনা গেলে—ইনফ্যাক্ট, কোনো শব্দ শোনা গেলে—আমি কিন্তু সবাইকে চলে যেতে বাধ্য করব। এখানে আপনারা সার্কাস দেখতে আসেননি।

আদালতে আলপিন-পতন নিস্তব্ধতা ফিরে এল।

—আমাকে একটা কথা বলতে দেবেন হুজুর?

দেখি দূরে জনারণ্যে বাপি দাঁড়িয়ে উঠেছে।

—না! আপনাকে যখন সাক্ষী দিতে ডাকা হবে তখন আপনি কথা বলবেন। এখন আপনার কন্যার সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে।.....বলুন, সিনোরিনা জেন্টিলেসচি। ফ্রাঁসেসকো ফিরোন্টনোর সঙ্গে আপনার যৌন সম্পর্ক ছিল?

কোনোক্রমে বলি, তাঁকে আমি চিনি না হুজুর।

—চেনই না? ফ্রাঁসেস্কো হচ্ছে আমাদের হোলি ফাদার স্বর্গীয় কসিমো ফোর্লির আর্দালি! এবার চিনতে পারলে?

—না হুজুর!

—আর পাসকুইনো স্কারপেলিনো? এ নামটা জান কার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। এ মামলার আসামী অগস্টিনোর বন্ধু।

—তার সঙ্গে তোমার কোনো যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?

—না হুজুর। সে একবার ওই অগস্টিনোর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু আমি তাকে পাত্তা দিইনি। ঢুকতেই দিইনি।

—অলরাইট! আর এ মামলার আসামী অগস্টিনো তাসি? তুমি কি একাধিকবার তাকে তোমাদের ফাঁকা বাড়িতে আসতে দাওনি? তার সঙ্গে তোমার একটা যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি?

প্রশ্নটা এমন ভাষায় জিজ্ঞাসা করা হল যে, আমি কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না। বিচারক সেই দৈত্যাকার লোকটিকে ইঙ্গিত করেছিলেন কি না জানি না—লোকটা আবার হাতল ঘোরাতে শুরু করল। রক্তপাত বন্ধ হয়েছিল। আবার ধীরে ধীরে তা শুরু হয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত দিয়ে বলি, ও জোর করে আমাকে... আমাকে...

—সেটা প্রথম কবে?

—ইস্টারের কয়েকদিন আগে।

—তুমি বলছ সে জোর করে তোমাকে বলাৎকার করেছিল। সেক্ষেত্রে তুমি কি বাধা দিয়েছিলে?

—দিয়েছিলাম হুজুর। ওকে আঁচড়ে দিয়েছিলাম। চুল ধরে টেনেছিলাম।

—চিৎকার করনি কেন?

—অগস্টিনো আমার মুখে একটা রুমাল ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

—বাড়িতে তখন আর কেউ ছিল না?

—আজ্ঞে না হুজুর।

—তাহলে ফাঁকা বাড়িতে তুমি ওকে ঢুকতে দিলে কেন? আর দরজা তো তুমিই খুলে দিলে? কেন?

—হুজুর! অগস্টিনো-কাকুকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। সে আমার বাবার বয়সী। সে যে ফাঁকা বাড়িতে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে তা কী করে আন্দাজ করব?

—বাঃ! তুমি তো দেখছি দিব্যি সওয়ালের জবাব দিয়ে চলেছ। অলরাইট! তুমি বাধা দিয়েছিলে, কিন্তু ওকে থামাতে পারনি। মুখে যেহেতু রুমাল গুঁজে দেওয়া হয়েছিল তাই চিৎকার করতে পারনি। তারপর একসময় তোমার বাবার বয়সী লোকটি যখন চলে গেল আর তোমার বাবা ফিরে এল তখন বাবাকে সব কথা বলেছিলে? বলছিলে যে, ওই অগস্টিনো তোমার বাধা সত্ত্বেও তোমার ধর্মনষ্ট করে গেছে?

—না!

—কেন? বলনি কেন?

—বাবাকে কি ওসব কথা বলা যায়?

—ও! যায় না বুঝি? শরমে বাধে? সেক্ষেত্রে তোমার মায়ের বয়সী সিনোরিনা অ্যালেনকে একথা বলনি কেন? সুযোগ মতো।

—ওর সঙ্গে আমার সে রকম ঘনিষ্ঠতা নেই।

—বুঝলাম। তারপর? তোমার সঙ্গে আসামীর দৈনিক যৌন চলতেই থাকে। কেমন? দিনের পর দিন! তা সে-জাতীয় সম্পর্ক কতবার হয়েছে? কতদিন হয়েছে?

—আমার তা মনে নেই!

—আমি নিখুঁত হিসাব চাইছি না সিনোরিনা। আন্দাজ কতদিন? তিন-চার দিন? না, পাঁচসাত দিন? অথবা তার বেশি?

—চার-পাঁচ দিন হবে হয়তো।

—প্রতিবারই কি তুমি বাধা দিয়েছিলে?

আমার আঙুল দিয়ে তখন টপ্‌টপ্ করে রক্ত পড়ছে। এ কী বিচার হচ্ছে? আসামী কে? আমি না ওই শয়তানটা?

—কী হল? 'হ্যাঁ-না' একটা জবাব দাও!

—কোনোবারই আমার সম্মতি ছিল না হুজুর। ও জোর করে—

—কিন্তু প্রতিবারই নির্জন বাড়িতে তুমিই তো দরজা খুলে ওকে বাড়ির ভিতরে আসতে দিয়েছিলে? দরজার গায়ে যে ফুটো আছে তা দিয়ে আগন্তুককে দেখার পরেও কেন তুমি ভিতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছিলে? বার বার?

—ও আমাকে বিবাহ করবে বলেছিল হুজুর।

—সুন্দর যুক্তি। তোমার বাবার বয়সী একজন লম্পট, যে প্রতিবার তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে বলাৎকার করছে, এবং যে লোকটা বিবাহিত—তাকে তুমি বারে বারে দরজা খুলে দিয়েছিলে এই প্রত্যাশায় যে, সে তোমাকে বিবাহ করবে।

—আমি জানতাম না হুজুর যে, ও বিবাহিত।

—এ-কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল? লোকটাকে তুমি বালিকা বয়স থেকে চেন বলছ; তাকে তুমি 'কাকু' বলে ডাক; অথচ তুমি জান না সে বিবাহিত কি না?

—বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি জানতাম না।

—প্রতিবার দরজা খুলে দেবার মজুরি হিসাবে আসামী তোমাকে কত 'ডুকাট' দিয়েছে?

—হুজুর, আমি ওর কাছ থেকে কপর্দক মাত্র গ্রহণ করিনি।

বিচারক সেই দৈত্যের মতো লোকটিকে ইঙ্গিত করলেন। লোকটা হাতল ঘোরালো। চোখে দেখিনি। ডানহাতের আঙুলগুলো আমাকে জানিয়ে দিল—আহ্! আহ্! মনে হচ্ছে আদালত ঘরখানা আবছা হয়ে গেল। হে শান্তা মারিয়া!

মাদ্রে দি দিও! আমি কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি? আমি কি মিথ্যা করে এবার বলব যে, ওরা

সবাই অর্থের বিনিময়ে আমার দেহটাকে ভোগ করেছে? আমি—আমি—বেশ্যা? তাহলে কি ওরা আমাকে রেহাই দেবে? না! সে মিছে কথা আমি বলব না। হে মা মেরী! সেই মিথ্যা স্বীকৃতি দেবার আগে তুমি আমাকে জ্ঞানহারা করে দিও! তার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়!

হঠাৎ কানে গেল, যথেষ্ট হয়েছে। আজ এখানেই বিচার মুলতুবি করা হল। কাল সকাল এগারোটায় আবার বিচার শুরু হবে। আসামী হাজতে থাকবে। আর সবাই কাল হাজিরা দেবে।

আমার হাতের 'রতনচূড়টা' আলগা হয়ে গেল। সেটা খুলে নেওয়া হল। হাতটা তুলে নিয়ে দেখি প্রতিটি আঙুলের গোড়া থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছে।

চোখ তুলে দেখি বিচারক উঠে দাঁড়িয়েছেন। গট গট করে এগিয়ে যাচ্ছেন নির্গমন দ্বারের দিকে। একজন প্রহরী অগস্টিনোর বাহুমূল ধরে হাজতে নিয়ে যাচ্ছে। দর্শকেরাও একে একে চলে যাচ্ছেন। আসামী বা বিচারককে কেউ দেখছে না। সবাই তাকিয়ে আছে এই নষ্টা মেয়েটার দিকে! হঠাৎ কে যেন আমার পিঠে হাত রাখল।

বাপি। একটা ফর্সা রুমাল সে বাড়িয়ে ধরেছে।

—না থাক! রক্তপড়া আপনিই বন্ধ হবে।

—আর্টিমিসিয়া! এটা নে, মা!

—না! কেন? কেন তুমি নালিশ করতে গেলে? এটা কার বিচার হচ্ছে? তোমার প্রাণের বন্ধুর না মেয়ের?

একজন প্রহরী এসে আমাদের দুজনকে এগিয়ে যেতে বলল।

একছুটে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। বাপির বয়স হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে সে আটকা পড়ে যায়। আমি ছুটতে ছুটতে বাড়িতে ফিরে আসি।

কলবেলের শব্দ শুনে অ্যালেন সদর খুলে দিতেই আমি তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিই।

—এ কী! তোমার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন?

কোনো জবাব না দিয়ে আমি ঢুকে পড়ি আমার ঘরে। ভিতর থেকে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ি নিজের বিছানায়। এতক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়ার সুযোগ এল। রাত্রে ওরা অনেক ডাকাডাকি করেছিল। অ্যালেন আর বাপি। আমি দরজা খুলিনি। ততক্ষণে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু আমার পোশাকটা লালে-লাল হয়ে গেছে। সম্ভবত ওরা দুজনও রাত্রে কিছু খায়নি।

বাপি! এ তুমি কী করলে? এর পর আমি পাড়ায় মুখ দেখাব কেমন করে? আমার যা লাঞ্ছনা হয়েছে তার ভার না হয় আমি একাই বইতাম! তুমি কেন চিৎকার করে গোটা রোম শহরকে জানাতে গেলে: এই দেখ তোমরা! আমার মেয়ের কীর্তি!

আঁধার ঘনিয়ে এল। পাড়ার ঘরে ঘরে নিভল বাতি। বিছানায় পড়ে কাঁদছি, আর ছটফট করছি। মনে পড়ে যাচ্ছে ছেলেবেলার কথা। আমরা তিনজনে ভিয়া অ্যাপিয়ায় বেড়াতে যেতাম— বাপি, মাম্মা আর আমি! মাম্মা চুপচাপ বসে ঘুঘুর ডাক শুনত। আর বাপি আমাকে টেনে নিয়ে ওক গাছের ছায়ায় শুয়ে শুয়ে গল্প শোনাত। ভূতের গল্প, রাজপুত্রের

গল্প, মিকেলাঞ্জেলোর গল্প। এই ছিল আমার বাপি।

ছিল!

আর রাত্রে আমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে অন্যজাতের গল্প বলত। সবই বাইবেলের গল্প। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে : রুথ, ইডিথ, নোয়ামি, মারা, সুসান্নাদের গল্প! সুসান্নার একটা ছবি আঁকতে শুরুও করেছিলাম, কনভেন্টে থাকতে। শেষ হয়নি সেটা।

রাত গভীর হয়েছে। পাড়া একেবারে নিশুতি। হঠাৎ কে যেন দরজায় টোকা দিল, আর্টিমিসিয়া। দোর খোল্!

বাপি!

—না! আমাকে বিরক্ত কর না। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

—লক্ষ্মী মা আমার। কথা শোন্......

হয় তো বাধা দিলে অ্যালেনের ঘুম ভেঙে যাবে। আমাদের দুজনের বেদনার ভাগ সেই বাইরের মহিলাটিকে দিতে চাই না। উঠে এসে দরজার ছিটকিনি খুলে বলি, মাঝরাতে কি আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছ?

—না রে। আমি শুধু তোর হাতে ব্যান্ডেজটা বেঁধে দিতে এসেছি।

বাপি নিয়ে এসেছ তুলো, ব্যান্ডেজ, ওষুধ। বাঁ-হাতে একটি পাত্রে আধা-গরম জল। বলে,বস এখানে। ক্ষতস্থানটায় ওষুধ দিয়ে বেঁধে না দিলে সেপটিক হয়ে যেতে পারে? তাহলে জীবনে আর তুই তুলি ধরতে পারবি না।

—এমনিতেও আমি আর তুলি ধরব না!

বাপি কেমন যেন ম্লান হয়ে বলল, প্লীজ—

আমি জানি, বাপির দুরন্ত বাসনা তার মেয়ে বড় আর্টিস্ট হবে। সে নিজে যে সম্মান পেল না—আপ্রাণ চেষ্টা করেও—সেই সম্মান পাবে তার মেয়ে, আর্টিমিসিয়া। তার নিজের আঁকা ছবি কোনোদিন ফ্লোরেন্সের আকাদেমিয়ার কোনো প্রাচীরে ঝোলানো হবে না। কিন্তু তার মেয়ের আঁকা ছবি একদিন-না-একদিন সেখানে ঠাঁই পাবে। বুড়ো মানুষটার এটাই সবচেয়ে রঙিন স্বপ্ন। বোধ করি এই প্রতিশ্রুতি পেলে সে নিজের একখানা হাত কেটে ফেলতেও রাজি।

হাতখানা বাড়িয়ে দিই। বাপি ক্ষতস্থানগুলি ধুয়ে দেয়। ওষুধ লাগিয়ে দেয়। আমি বলি, মাম্মা যদি আজ থাকত তাহলে সে কিছুতেই তোমাকে এ কাণ্ড করতে দিত না। অগস্টিনোর জেল হলে কি আমি সুনাম ফেরত পাব?

—আমার ভুল হয়ে গেছে, মা! হ্যাঁ, তোর মা থাকলে নিশ্চয় আমাকে এই বোকামি করতে দিত না। তবে কি জানিস আর্টিমিসিয়া? এসব নিতান্ত দুদিনের জ্বালা-যন্ত্রণা। সময়ে সবাই এ-কথা ভুলে যাবে।

—বাপি! একখানা হাত কাটা গেলে সময়ে সে কথা ভুলে যেতে পারি। কাটা হাতটা ফিরে আসবে না।

—তোর আঙুলের এ ব্যথা সেরে যাবে। ছবি আঁকতে পারবি তুই।

—আমি আঙুলের ক্ষতির কথা বলছি না বাপি। স্ত্রীলোকের সুনামের কথা বলছিলাম। একবার খোয়া গেলে তা আর ফিরে আসে না।

আজ আদালতে ভিড়টা যেন আরও বেশি। গতকালই সবাই আন্দ াজ করেছিল যে, ধর্মাধিকার আজ এ মামলার রায় দেবেন। মাথা নিচু করে বাপির হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে বসলাম আমার নির্দিষ্ট টুলটায়। বাপি গিয়ে বসল দর্শকদলে। ও পাশের টুলে বসে আছে আসামী অগস্টিনো তাসি। তার হাতে হাতকড়া। হঠাৎ নজর হল বিচারকের ডায়াসের ওপাশে একটা টেবিল পাতা হয়েছে। তার উপর সাদা চাদর পাতা। একটা পাত্রে জলও আছে। ওটা কী? নতুন জাতের 'সিবিল'? সাক্ষীকে দিয়ে ইচ্ছামতো কবুল করানোর কোনো নতুন ফন্দি?

লকুমটেনেন্টি টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে আদালতে। স্তব্ধতা ফিরিয়ে আনলেন। দর্শকদের সাবধান করে দিলেন, কথা না বলতে, শব্দ না করতে।

তারপর আমার দিকে ফিরে গম্ভীরভাবে বলেন, 'তাহলে সিনোরিনা আর্টিমিসিয়া তুমি স্বীকার করছ যে, তোমার বয়স মাত্র আঠারো, তুমি অবিবাহিতা এবং এই বয়সেই তুমি তোমার কুমারীত্ব হারিয়েছ?'

সলজ্জে মাথা নেড়ে স্বীকার করি।

—মাথা নাড়লে চলবে না সিনোরিনা! তোমাকে স্বমুখে স্বীকার করতে হবে। কারণ এটা মামলার ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ থাকবে।

—হ্যাঁ হুজুর, আমি সে কথা স্বীকার করছি।

—'সে কথা' মানে কোন কথা? যেটা বাস্তব সত্য তা স্পষ্টভাবেই বলছনা কেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি আর 'ভার্জিন' নই।

বিচারক পেশকারের দিকে তাকালেন। সে ঘাড় নেড়ে জানালো যে, এই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতিটা আদালতের জাবদা খাতায় নথিবদ্ধ করা হয়েছে : আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি তার কুমারীত্ব হারিয়েছে। সেকথা সে নিজমুখে স্বীকার করেছে। অর্থাৎ ভদ্রঘরের কোনো সুপাত্র তাকে কোনোদিন বিবাহ করতে পারবে না। এটাই সামাজিক আইন!

বিচারক নকিবকে কী-যেন ইঙ্গিত করলেন। নকিব দ্বারপালের দিকে ফিরল। ব্যবস্থা করল : দুজন হুডপরা নার্স আদালতে প্রবেশ করে বিচারককে অভিবাদন করলেন। নোটারি তাঁদের শনাক্ত করলেন। স্থূলকায়া বয়স্কা নার্সটির নাম ডায়াগ্রা, পিয়াজা সান পেট্রোর নার্স। ক্ষীণকায়া মহিলাটিকে চেনা-চেনা লাগল। পরিচয় শুনে বুঝতে পারি এঁকে ইতিপূর্বে দেখেছি। আমি যে নানারিতে ছয়সাত বছর আশ্রিতা ছিলাম সেই সান্তা বিনিতা দেই মন্তি কনভেন্টের সেবিকা সিস্টার জেমিনা ক্যাটারিনা।

বিচারক তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে পুনরায় আমার দিকে ফিরে বললেন, আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি যেন? ও হ্যাঁ, তুমি স্বীকার করছ যে তুমি আর ভার্জিন নও, কেমন?

গোটা আদালতকে জানাতে আমি তো একথা নিজমুখে স্বীকার করেছি। আবার সে

প্রসঙ্গ কেন? উনি কি এই স্বীকৃতি শুনে কিছু তৃপ্তি পাচ্ছেন? একই কথা বারে বারে শুনতে চান? আমি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। আবার বলি, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! আসামী অগস্টিনো তাসি আমাকে বলপূর্বক ধর্ষণ করায়....

—না, না, না, না! অবান্তর একটা কথাও বলবে না, সিনোরিনা আর্টিমিসিয়া। এইমাত্র তুমি যা বলতে যাচ্ছিলে তা প্রমাণিত তথ্য নয়। সেটা তোমার অভিযোগ। আসামী তাসি তোমার সঙ্গে সঙ্গম করার পূর্বেই তুমি তোমার কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়েছ কিনা তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিবাদী তিনজনের নাম করেছে।

এরপর বিচারক সেই দৈত্যাকার সহকারীর দিকে ফিরে বললেন, 'পর্দা খাটাও!'

লোকটা তৎক্ষণাৎ একটি দড়ি ধরে টানল। একটা কালো রঙের পর্দা এগিয়ে এসে টেবিলের মাঝামাঝি খাড়া হল। বিচারক নার্স দু-জনের দিকে ফিরে আঙুল নেড়ে বললেন, 'তোমরা তোমাদের কাজ কর। এই মেয়েটির দেহ পরীক্ষা করে দুটি তথ্য আদালতকে জানাও। এক : ওর 'ভার্জিনিটি' অক্ষত আছে কি না। দুই : ওর নাভিমূলের দু-আঙুল নিচে বাম উরুর দিকে একটি জন্মজডুল চিহ্ন আছে কি না।

দশাসই মহিলাটি এগিয়ে এসে আমার বাহুমূল ধরে বলে, ওই টেবিলে উঠে শুয়ে পড়। মাথা এদিকে, কোমর থেকে পর্দার ওদিকে।

আমার হাত পা হিম হয়ে গেল।

জনতার মধ্য থেকে একটি প্রতিবাদ শোনা গেল : ও তো দুটো তথ্যই স্বীকার করছে, হুজুর। ও কখনো মিছে কথা বলে না।

চোখে দেখিনি। কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারি : বাপি।

বিচারক দৈত্যাকার লোকটির দিকে ফিরে বললেন, ওই লোকটা যদি আবার আদালতের কাজে বাধা দেয় তাহলে ওকে বার করে দিও।

এরপর কী হল আমি জানি না। দুচোখ বন্ধ করে, দাঁতে দাঁত দিয়ে আমি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে থাকলাম। দুজন ধাত্রী আমার পায়ের দিকে চলে গেল। একজন আমার ফ্রকটা উঁচু করে ধরল। প্যান্টিটা খুলে নিল। অপরজন পরীক্ষা করল আমার গোপনাঙ্গ।

পাঁচ-সাত মিনিটের ব্যাপার। তারপরে মুক্তি পেলাম আমি। পরে নিলাম প্যান্টি। নতমস্তকে গিয়ে বসলাম আমার টুলের উপর।

বিচারক জানতে চাইলেন, নার্স ডায়াস্রা। আপনি কী দেখলেন বলুন?

নার্সটি বোধহয় এ জাতীয় কাজে অভিজ্ঞ। বললে, 'আমি এলিজা ডায়াস্রা, পিয়াজা সান পেট্রোর নার্স। সিস্টার দামিনা ক্যাটারিনার সঙ্গে ধর্মাধিকরণের নির্দেশে বর্তমান মামলার বাদী আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচির দেহ পরীক্ষা করলাম। আমি ঘোষণা করছি ওই মেয়েটি তার কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়েছে। ঠিক কতদিন পূর্বে তা বলা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত ওর নাভিমূলের তিন ইঞ্চি নিচে, বামজানুর দিকে একটি জন্মজডুল চিহ্ন আছে।'

এমন ভঙ্গিতে মহিলাটি ঘোষণা করলেন যেন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত কিছু আবিষ্কার করেছেন তিনি।

বিচারক আমার দিকে ফিরে বললেন, সিনোরিনা জেন্টিলেসচি! নার্স ডায়াগ্রার জবানবন্দি অনুসারে আদালত মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে যে, তুমি অবিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তোমার কুমারীত্ব হারিয়েছ। আদালত আরও সিদ্ধান্তে আসছেন যে, তোমাদের পাড়ার মুদি মডেনেসি যে কথা বলেছিল তা সত্য—অর্থাৎ তোমার নাভিমূলে যৌনাঙ্গের কাছাকাছি বামদিকে একটি জন্মজড়ুল চিহ্ন আছে। এ বিষয়ে তোমার কোনো বক্তব্য আছে?

—নতুন কী বক্তব্য থাকবে হুজুর? এ কথা তো আমি আগেই স্বীকার করেছি। আসামী আমাকে বলাৎকার করেছে, ফলে আমি কুমারীত্ব হারিয়েছি। আদালত তো সে কথাই মেনে নিচ্ছেন।

—না, না, মোটেই তা নয়। তুমি ইতিপূর্বে বলেছ যে, মডেনেসি তোমার বয়ফেন্ড ছিল না। তার সঙ্গে তোমার দৈহিক ঘনিষ্ঠতা কখনো হয়নি। তাহলে সে কেমন করে ও কথা জানল?

—সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে, হুজুর। মডেনেসি যদি ও কথা তার জবানবন্দিতে বলে থাকে—নিশ্চয়—বলেছে—আপনি যখন বলছেন— তাহলে তার একমাত্র সিদ্ধান্ত : সে আসামীর ভাড়া করা সাক্ষী। আমার দেহের এই গোপন তথ্য আসামী জানে। সে যাকে বলবে সেও জানবে। ফলে, একমাত্র সিদ্ধান্ত মডেনেসি আসামীর তরফে একজন ভাড়া করা মিথ্যে সাক্ষী।

—না, সিনোরিনা। দ্বিতীয় একটি সিদ্ধান্তও হতে পারে : তুমিই মিথ্যে কথা বলছ। আসামীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হবার পূর্বেই মডেনেসির সঙ্গে তোমার দৈহিক মিলন হয়েছিল। যার অর্থ আসামী তোমার কৌমার্যহরণ করেনি। অর্থের বিনিময়ে তুমি এ জাতীয় কাজ করে থাক। মডেনেসি যে আসামীর তরফে ভাড়া করা সাক্ষী এটা তুমি প্রমাণ করতে পার?

—এটা তো স্বতঃসিদ্ধ! প্রমাণ করব কী করে?

আমি তা প্রমাণ করতে না পারায় মহামান্য বিচারক তাঁর সিদ্ধান্তে এলেন।

আসামী অগস্টিনো তাসির বিরুদ্ধে যে চার্জ তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সে আর্টিমিসিয়ার কুমারীত্ব হরণ করেনি। কারণ প্রমাণিত হয়েছে তার পূর্বে বাদীর সঙ্গে মডেনেসির যৌন সম্পর্ক হয়েছিল। এটা মামলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসামীর বিরুদ্ধে বলাৎকারের অভিযোগও টিকছে না, যেহেতু মামলায় দেখা গেছে যে, মেয়েটির সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে বারেবারে নির্জন বাড়িতে রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে আসামীকে গৃহাভ্যন্তরে আসতে দিয়েছিল। ফলে দুটি অপরাধ থেকেই আসামী বে-কসুর। কিন্তু তৃতীয় অভিযোগ থেকে নয়। রোম-শহরে লালবাতি-জ্বলা রূপোপজীবিনীদের পাড়ায় না গিয়ে অর্থমূল্যে সে একটি ভদ্র পরিবারে এমন কাজ করেছে যা দণ্ডনীয়। ফলে আসামী অগস্টিনো তাসিকে বিচারক নির্বাসন দণ্ড দিলেন। রোম শহরের নগরসীমা সে চব্বিশঘণ্টার ভিতর ত্যাগ করে যাবে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে রোমনগরীতে প্রবেশ করবে না।

মডেনেসির বিরুদ্ধে কোর্ট-ইন্সপেক্টার কোন অভিযোগ আনেননি। ফলে তার অপরাধের বিচার এ মামলায় হতে পারে না।

তৃতীয়ত আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি—বাদী। তার আচরণ নগরপালের আইনবিরুদ্ধ। কিন্তু তার বিরুদ্ধেও কোর্ট-ইন্সপেক্টার কোনও অভিযোগ আনেননি। তদ্‌সত্ত্বেও যেহেতু এটি ধর্মীয় আদালত—বিচারক লর্ড হেরোনিমো ফেলিসিও মহামান্য পোপের তরফে এখানে বিচার করছেন—তাই তিনি নিজে থেকে 'সু-মোটো' নির্দেশে বলছেন : বাদী হয় তিনমাসের মধ্যে লালবাতিজ্বলা অঞ্চলে গিয়ে নাম লেখাবে ওইভাবে উপার্জন করতে। অথবা ওই সময়ের মধ্যে রোমনগরী ত্যাগ করে যাবে।

মামলা খতম্‌।

যে গতিতে আমাদের কাহিনি অগ্রসর হচ্ছে তাতে আশঙ্কা হয়, এই অসাধারণ মহিলার জীবনকাহিনীর চার-আনা অংশও বলা যাবে না। অর্জুন মহাভারতের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি পেয়েছিলেন দ্রোণাচার্যের মতো গুরু, শ্রীকৃষ্ণের মতো সখা, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে মতো অগ্রজ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মতো নেপথ্য পৃষ্ঠপোষক। একলব্যের সে সৌভাগ্য হয়নি। তাই সে মহাভারতে উপেক্ষিত। অথচ অনুপস্থিত গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিতে সে কার্পণ্য করেনি। আর গুরুও দক্ষিণা গ্রহণ করার সময় স্মরণে রাখেনি যে, অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারে তিনি কোনোদিন স্বাক্ষর করেননি।

শিষ্যকে কিছুই নিজ হাতে প্রদান করেননি।

আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচিও ইউরোপিয়ান শিল্প-মহাভারতে একলব্যের মতো উপেক্ষিতা। সমাজ তাঁকে পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। পারেনি। ইতালী ছিল সে আমলে শিল্পজগতের রাজধানী। ফ্রোরেন্স সে রাজধানীর রাজপ্রাসাদ। ফ্লোরেন্স-আকাদেমি সে রাজপ্রাসাদে 'নবরত্নসভা'। লেঅনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, গ্যালিলেও প্রভৃতি সে সভার কলিদাস, ভবভূতি, বরাহ-মিহির। আর্টিমিসিয়া নিজের প্রচেষ্টায় সেই নবরত্নসভায় নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেসব কথা বিস্তারিত বলার সুযোগ পাওয়া মুশকিল।

বিচারক তাঁর রায় ঘোষণা করে আসন ত্যাগ করা মাত্র আর্টিমিসিয়া উঠে দাঁড়ালো। দর্শকদল আদালত চত্বরের বাইরে তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে—এমন একটা আশঙ্কা তার ছিলই। তাই আদালত কক্ষের একটা পাশের নির্গমনদ্বার দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু সেই মুহূর্তে অনেকের দৃষ্টি ছিল তার উপর। ফলে জনরোষকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারল না।

—দ্যাখ, দ্যাখ। ঐ যাচ্ছে সেই বেশ্যামাগী!

হঠাৎ একটা চ্যাঙরা ছেলে সুর করে গেয়ে ওঠে "এই মেয়েটা, ভেলভেলেটা, আমার বাড়ি যাবি? দু-চারমুঠো লিরা দেব, আমার খাটে শুবি?"

কোথায় বড়রা তাকে ধমক দেবে, তা নয়, সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। ঠিক তখনই ওর পিঠে কী যেন একটা নরম ভেজা-ভেজা জিনিস থ্যাস করে আছড়ে পড়ল। পচা কমলা লেবু অথবা ডিম। আর্টিমেসিয়া আর ফিরে দেখল না। মুখখানা কোথায় লুকোবে এই তার একমাত্র চিন্তা। বাপি ওকে খুঁজবে, খুঁজবে, তার পর আন্দাজ করবে সে ভিড়ের মধ্যে মুখ

লুকিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে গেছে। আর্টিমিসিয়া কিন্তু এখন পাড়ায় ফিরতে সাহস পেল না। পাড়ার চ্যাঙড়াগুলো ওর জন্য ওৎ পেতে বসে আছে। বিদ্রূপ করতে। হয়তো হাত ধরে টানতে!

আর্টিমিসিয়া তার চাদরে ডানহাতখানা ঢাকল। মাথার টুপিটা টেনে নামিয়ে মুখখানা আড়াল করল। সন্ধ্যা এখনো নামেনি, তবে পশ্চিমাকাশে মেঘ থাকায় আঁধার নামতে শুরু করেছে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় বিদায়ী সূর্যের শেষ আলোর ছোপ। যেন পাহাড়টা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। বড় রাস্তা ছেড়ে সে গলি পথে এগিয়ে গেল সান্তা মারিয়া দেল পোপোলো চার্চের দিকে। বড় পিয়াজার গা ঘেঁষে সর্পিল পাকদণ্ডীপথে এগিয়ে চলল তার কৈশোরের শান্তির নীড়ে। যেখানে আছেন সিস্টারেরা—গ্র্যাজিল্লা, পাওলো। আছেন মাদার সুপিরিয়র মার্গারিটা। এমন একটা চরম শরমে মেয়েরা মুখ লুকাতে চায় মায়ের আঁচলের তলায়। দুনিয়ায় তখন তার আর কোনো আশ্রয়স্থল থাকে না।

কল-বেলে হাত ছোঁয়াতেই সিস্টার পাওলো এসে দেখল ছোট্টা ফোকর দিয়ে। আর্টিমিসিয়াকে দেখে খুলে দিল সিংদরোজা সংলগ্ন ছোট্ট উইকেট গেটটা। আর্টিমিসিয়াকে জড়িয়ে ধরে বললে, ভাবছিলাম কাল সকালেই একবার তোদের বাড়ি যাব। আজই তো রায় বার হবার কথা ছিল। তাই না?

সে কথার জবাব না দিয়ে আর্টিমিসিয়া বলে, মাদার কোথায়?

সিস্টার পাওলো বুদ্ধিমতী। বুঝতে পারে। ওই লজ্জাজড়ানো অস্বোয়াস্তিকর প্রসঙ্গটা আর্টিমিসিয়া আলোচনা করতে চায় না। তাই বলে, মাদার তাঁর ঘরে। খুব খুশি হবেন তোমাকে দেখলে। চল না, তাঁর কাছেই যাই।

মাদার মার্গারিটা ওদের মধ্যে বয়সে সবার চেয়ে বড়—পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। ওঁর ঘরের পশ্চিমদিকের বারান্দায় একটা টেবিলে পেতে কী একটা প্রকাণ্ড পাণ্ডুলিপিতে ছবি আঁকছিলেন। বইটি 'দ্য হোলি বাইবেল'। ক্যালিগ্রাফি করা, হাতে-লেখা পুঁথি। মার্গারিটা তাতে প্রতিটি পাতার কোনায় কোনায় নক্‌শা আঁকছেন। এগুলিকে সেযুগে বলা হত 'ইলুমিনেট'-করা বই, 'ইলাস্ট্রেটেড' নয়। কারণ প্রতিটি পৃষ্ঠার উপর দিকে, প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে থাকত সোনালী কাজ-করা 'ভিগ্‌নেট'—ফুল-লতা-পাতা, পাখি-প্রজাপতির নক্‌শা। আর্টিমিসিয়াকে দেখে তুলিটা ধুয়ে পাশে রাখলেন। বললেন, আয়! তোর কথাই ভাবছিলাম!

আর্টিমিসিয়া বলে, বাঃ! আঁকছ হলুদরঙের পাখি, আর ভাবছ এই হতভাগীর কথা?

মাদার মার্গারিটা স্বীকার করলেন না, যে আজ সারা দিনই বার বার ওই হতভাগীর কথা তাঁর মনে পড়েছে। আর্টিমিসিয়া যে বস্তুত তাঁর মেয়ের মতো। তাঁর বক্ষপুটে এসেছিল মাত্র দশ বছর বয়সে, মাতৃহীন গৃহে যখন ফিরে যায় তখন সে সপ্তদশী। সেই মেয়েটিকে আজ বিদ্রূপ-উন্মুখ মানুষজনে-ঠাসা আদালতে লাঞ্ছিতা হতে হয়েছে। কিন্তু সিস্টার পাওলোর সামনে সে প্রসঙ্গ না তুলে উনি বলেন, এটা কী পাখি বলতে পারিস?

—না। নাম জানি না। তবে খুব সুন্দর দেখতে।

—ওকে বলে গোল্ডেন অরিয়ল (বেনে বউ, কৃষ্ণ কোথা)।

সিস্টার পাওলো দাঁড়িয়ে ছিল ওর পিছনে। বললে, এ হে হে! তোমার গাউনে, পিঠের দিকে কী যেন নোংরা লেগেছে। কী করে লাগলো?

আর্টিমিসিয়া জানে। ওটা তার লাঞ্ছনার অলঙ্করণ। পচা কমলালেবু অথবা ডিম। কেমন করে ওটা পিঠে লেগেছে সে কথা স্বীকার করতে বেচারির চোখ ফেটে জল বের হতে চায়। মার্গারিটা ঠিকই আন্দাজ করেছেন। তাই আবার প্রসঙ্গটা বদলে সিস্টার পাওলোকে বলেন, আমার আলমারি থেকে একটা পরিষ্কার গাউন নিয়ে এস। আর আর্টিমিসিয়া এখন স্নান করবে। একটু গরম জল বসিয়ে দাও।

সিস্টার পাওলো ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া মাত্র আর্টিমিসিয়া বলে ওঠে, তোমাকে কিছু বলতে চাই, মা। আজকের লাঞ্ছনার কথা।

মার্গারিটা ওর মাথায় হাত রেখে বলেন, তোকে কিছুই বলতে হবে না রে, মা-মণি! আমি সব খবর জানি।

আর্টিমিসিয়া অবাক হয়ে যায়। কেমন করে উনি খবর পেতে পারেন? আদালতে বিচারক রায় ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সে রওনা হয়েছে। তাহলে?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মাদার বলেন, তোকে যে দুজন আদালতে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করেছে তাদের মধ্যে একজন—রোগামতো মেয়েটি—আমাদের হাসপাতালের। সে আগেই এসে সব কথা বলেছে।

—তার মানে তুমি সব শুনেছ? তুমি জান?

—জানি রে। যতটা জানা মঙ্গলজনক তার চেয়ে কিছু বেশিই জানি! তুই ঠিক আছিস তো?

আর্টিমিসিয়া চাদরের তলা থেকে তার ডান হাতখানা বার করে দেখায়। রক্তপাত বন্ধ হয়েছে— কিন্তু ব্যান্ডেজটা ওর লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। মার্গারিটা একটি আর্তনাদ ঠেকাতে মুখে হাত চাপ দিলেন। যেন তাঁর অজ্ঞাতেই ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করল : সিবিল!

—হ্যাঁ! অথচ আমি কিছুই মিথ্যাকথা বলিনি, মা। বলতাম না।

—তোর বাবা তখন কোথায় ছিলেন?

—কোথায় আবার! আদালতেই। সেই তো এ কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। বাপি আমাকে বুঝিয়েছিল—জবানবন্দিতে সব কিছু সত্য কথা বললে ওতে কোনো ব্যথা লাগে না! আমি....আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। এটাই আমার অপরাধ।

আর্টিমিসিয়া মায়ের হ্যাবিট-এ (habit= সন্ন্যাসিনীর পোশাক) মুখ লুকালো। মার্গারিটা বললেন, 'সিবিল হচ্ছে পুরুষদের হাতের একটা অস্ত্র। কোনো অত্যাচারিতা নারী যদি পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে অমনি ওরা ওই অস্ত্রটা বার করে। তুই তো জানিস, 'সিবিল' যন্ত্রটা ব্যবহৃত হয় শুধু স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে? ওদের বিবেক বলে কিছু নেই রে!'

—ওরা মানুষ নয় জানোয়ার।

—হতে পারে। কিন্তু তোর মনোবল ওরা নষ্ট করতে পারবে না—কিছুতেই নয়—যদি তুই শক্ত হয়ে থাকিস। ওরাই হার মানতে বাধ্য হবে।

—কিন্তু বাপি? সে কেন আমাকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিল?

—সিনর ওরাজিও তো পুরুষমানুষ।

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে। বলে, তুমি বলতে চাও বাপি ইচ্ছে করে আমাকে বাঘের মুখে ফেলে দিয়েছে? বিচারশালার ওই অ্যাম্‌ফিথিয়েটারে নিজের মেয়েকে গ্ল্যাডিয়েটার বানিয়ে সবাইকে তামাশা দেখিয়েছে?

—না রে মা-মণি! সে-কথা আমি বলিনি। কিন্তু তিনিও তো নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারেন না। তাঁকেও তো দু-নৌকায় পা দিয়ে দুনিয়াদারি করতে হচ্ছে। একদিকে পিতৃস্নেহ অপরদিকে ওই ধর্ষকামী পুরুষসমাজ!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আর্টিমিসিয়ার। চোখের জল মুছে বললে, এবার আমি যাই, মা! বাপি নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে আমাকে খুঁজছে।

—না। আমি তাঁকে খবর পাঠিয়েছি। জানিয়েছি, তুই আজ রাতে এখানেই থাকবি। শুধু আজ নয়, বেশ কিছুদিন। যতদিন না তোদের পাড়ায় উত্তেজনাটা কমে আসে। তাকে বলেছি তোর জামাকাপড় একপ্রস্থ পৌঁছে দিতে।

আর্টিমিসিয়ার মুখে জবাব যোগালো না। বুঝলো, সে মাতৃহারা হয়নি।

মাদার আবার বলেন, পুরুষদের এ অত্যাচার শুধু মর্ত্যে। আমাদের 'হেভেনলি ফাদারের' দৃষ্টিতে পুরুষ স্ত্রীর কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই তাঁর সন্তান। তিনি তোকে রক্ষা করবেন। একটি শর্তে। যদি তুই মাথা খাড়া রাখতে পারিস। নিজে থেকে ভেঙে না পড়িস!

—কিন্তু আমি কী নিয়ে লড়ব মাদার? আমার তো 'সিবিল' নেই?

—'সিবিল' তো অত্যাচারীর অস্ত্র। সে শুধু যন্ত্রণা দিতে পারে। তোর অস্ত্র হচ্ছে তুলি। তুই শিল্পী! তুলি দিয়ে বেদনাকে ঢাকতে হবে। চিরদিন শিল্পীরা তুলি নিয়েই লড়েছেন—রঙে-রেখায় পার্থিব যন্ত্রণাকে আড়াল করেছেন। কাব্য রচনা করে প্রাণরসকে সঞ্জীবিত রেখেছেন। যারা তোকে লাঞ্ছনা করেছে ওদের ভ্রুক্ষেপ করবি না। ওরা চায়, তুই যেন লজ্জায় কুঁকড়ে যাস্। যন্ত্রণায় মরে যাস্। কেন জানিস?

আর্টিমিসিয়া দু-দিকে মাথা নাড়ে। জানায়, সে জানে না।

—কারণ তোর প্রতিভাকে ওরা ভয় পায়। জুডিথ যে হলোফার্নেসকে চরম শাস্তি দিয়েছিল একথা ইতিহাস ভুলে গেছে, কিন্তু কারাভাজ্জিওর জুডিথ অমর হয়ে আছেন। তোকেও তেমনি শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবাদ করতে হবে, মা-মণি!

—'জুডিথ' কে মা?

—তাঁর কথা পরে একদিন বলব। এখন বরং এই সুযোগে তোকে বলে রাখতে চাই : নারীর প্রতিবাদকে ওরা চাপা দিতে পারে, তার কণ্ঠরোধ করতে পারে, কিন্তু শিল্পকে চাপা দেবার ক্ষমতা ওদের নেই। তুইি তো কোনো অপরাধ করিসনি। তুই কিছুতেই অনুশোচনায় মাথা নোয়াবি না। প্রতিবাদ করবি তোর তুলি দিয়ে। আমি দেখেছি....

—কিন্তু সারা রোমের ধারণায় আমি যে, আমি যে...

—রোম-এর ধারণায় কী যায় আসে? রোম তো বিশ্ব নয়! রোম কতটুকু? ঈশ্বর তোকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একটা মহৎ দায়িত্ব দিয়ে। তাই তোকে দিয়েছেন দুর্লভ প্রতিভা। আমি তা দেখেছি। আমি জানি! তুই রঙ-তুলিতে তোর প্রতিবাদ জানাবি। তোর ছবি যখন বিখ্যাত হবে, ফ্লোরেন্স আকাদেমিয়ার সংগ্রহশালায় টাঙানো হবে, তখন রোম হবে লজ্জায় অধোবদন। আমার এ কথাটায় বিশ্বাস রাখিস মা-মণি।

আর্টিমিসিয়া তার ডান হাতখানা মেলে ধরে। বলে, আমি যে আর কোনোদিন তুলি ধরতে পারব না, মা?

—কে বলেছে তোকে? পারবি। তোর হাতের ব্যথা দু-চারদিন পরেই সেরে যাবে। কারাভাজ্জিওর জুডিথ আর হলোফার্নেস ছবির অনুলিপি আমার কাছে। আমার তাতে মন ভরেনি। তুই আবার ওই একই বিষয়বস্তু নিয়ে একখানা ক্যানভাস আঁক। সেটাই হবে তোর প্রতিবাদ।

—কেন মা? কারাভাজ্জিওর ছবিখানায় তোমার মন ভরেনি কেন?

—কারাভাজ্জিও পুরুষ। তিনি জুডিথকে সুন্দরী রূপে আঁকতেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। কারাভাজ্জিওর 'জুডিথ' সুন্দরী—কিন্তু তার প্রতিবাদী সত্তাটা সেই মহান শিল্পকর্মে ফুটে ওঠেনি।

আর্টিমিসিয়া আবার প্রশ্ন করে, জুডিথ কে মা?

মার্গারিটা জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। তার আগেই ফিরে এল সিস্টার পাওলো। একখানা ধোপ দুরস্ত গাউন হাতে। বললে, আর্টিমিসিয়া! তুমি রাতে খাবে কীভাবে? তোমার ডানহাতের আঙুলগুলো তো ভাঁজ করা যাচ্ছে না।

মার্গারিটা বলেন, তোমার হাতের আঙুল তো ভাঁজ করা যাচ্ছে, সিস্টার পাওলো। তুমি চামচে করে ওকে খাইয়ে দেবে। এ তো সহজ সমাধান। আমি ভাবছি ও কাল রাত্রে অথবা আজ সকালে কী করে খেল?

মাথা নিচু করে আর্টিমিসিয়া বলে, ওরা আমার আঙুলগুলো ভেঙে দেবার পর থেকে আমি তো কিছু খাইনি মা!

—সে কী কথা রে! তাহলে প্রথমেই একটু সুপ খেয়ে নে। তারপর স্নান করতে যা।

মাদার আবার তাকালেন সিস্টার পাওলোর দিকে। সে বুদ্ধিমতী। বললে, আমি এখনি ব্যবস্থা করছি, মাদার।

প্রায় দেড় মাস ওকে থাকতে হল সন্ন্যাসিনীদের ছত্রছায়ায়। ওর দ্বিতীয় মাতৃস্নেহের আড়ালে। নিজের বাড়িতে, নিজের পাড়ায় একবারও যায়নি। ও জানত যে, পাড়ায় পা দিলেই খরজিত্ব প্রতিবেশির দল ওকে চিহ্নিতা করবে দেহ-ব্যবসায়িনী রূপে।

ওরাজিও একটা পুঁটলিতে ওর জামা-কাপড়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে

গেল। মাদার তাকে আড়ালে ডেকে বললেন, আর্টিমিসিয়ার পক্ষে আপনার বাড়িতে এখনই ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। মাসখানেক সে এখানেই থাকুক। চার্চের আশ্রয়ে।

ওরাজিও নতমস্তকে বললে, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই মাদার। অসুবিধা একটাই। আমার হাতে এখন কোনও সঞ্চয় নেই। এই বিশ্রি মামলাটা লড়তে গিয়ে....

মাদার মার্গারিটা ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলেন, ওকে এখানে মাসখানেক রাখতে আপনার কোনও খরচ হবে না। কিছু মনে করবেন না, সিনর জেন্টিলেসচি। কিন্তু কাজটা আপনি ঠিক করেননি—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটা এখন বুঝতে পারছি। আমার পক্ষে ওটা হঠকারিতাই হয়ে গেছিল। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ না করেই বা থাকি কি করে বলুন? আমি প্রতিবাদ করেছিলাম বলেই না অগস্টিনোকে বহিষ্কারদণ্ড দিলেন বিচারক?

—সে তো মাত্র ছয় মাসের জন্য, কিন্তু আর্টিমিসিয়ার কপালে যে মিথ্যা কলঙ্কচিহ্ন তিনি এঁকে দিলেন সেটা ওকে আজীবন বহন করে বেড়াতে হবে।

ওরাজিও জবাব দিতে পারল না।

—অগস্টিনো কোথায় নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে তা আপনি জানেন?

—না। জানি না, জানতে চাইও না।

—আপনি হয়তো জানতে চান না। কিন্তু আপনার জানা থাকা দরকার। অগস্টিনো এখন আছে প্রুশিয়ায়—ব্যাভেরিয়ায়। সেখানে সে বন্দী আছে, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসাবে। সশ্রম কারাদণ্ড—ছয় মাসের।

ওরাজিও অবাক হয়ে গেল। বলে, সে কী! আপনি জানলেন কেমন করে?

—আমি কেমন করে জানলাম সে কথা থাক। তথ্যটা আপনার জানা থাকা দরকার। অগস্টিনো আটক আছে ব্যাভেরিয়ায়। কার্ডিনাল বর্জেস-এর প্রাসাদে। বিনা পারিশ্রমিকে ওই প্রাসাদের সিলিঙে তাকে ছবি আঁকতে হবে। ছয় মাস ধরে। অবশ্য দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাবে। সিলিঙের অলঙ্করণ যদি হিজ গ্রেসের মনোমত না হয় তাহলে ওর মেয়াদ বৃদ্ধি হবে। এজন্যই তার বহিষ্কারের দণ্ড। ও প্রসঙ্গ থাক। আপনি বরং আর্টিমিসিয়ার জন্য একটি সুপাত্রের সন্ধান করুন। বরপণের জন্য চিন্তা করবেন না। রোম নগরপালের এক্তিয়ারে একটি 'ডাওরি ফান্ড' আছে। কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকদের অল্প সুদে তা থেকে ঋণ দেওয়া হয়। আমার সুপারিশে সেটা আপনি যাতে পেয়ে যান তা আমি দেখব। সুপাত্রের ব্যবস্থা হলে মা-মণিকে নিয়ে যাবেন।

ওরাজিও নতমস্তকে ফিরে গেল। আদালত যার ললাটে ওই কলঙ্কচিহ্ন এঁকে দিয়েছে তার জন্য 'সুপাত্র' জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এটাই বোধহয় একমাত্র সমাধান। সুপাত্র না হলেও পাত্র হয়তো জোগাড় হবে। বরপণ যখন পাওয়া যাবে ধারে।

সপ্তম-সর্গের অসমাপ্ত গানে শেষ করতে হবে এ কাহিনি। ওঁর বেদনাকে, যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেছিল ইতিহাস। সে অপরাধ দ্বিতীয়বার করতে চাই না। অন্তত ওঁর প্রামাণ্য জীবনেতিহাসে যেটুকু তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পেরেছি তা জানাই।

আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচির (Artemisia Gentileschi, 1593-1652) জীবন-ইতিহাস প্রথম সংগ্রহ করেন মারী ডি. গারার্ড। চিত্রবহুল গ্রন্থটির নাম আর্টিমিসিয়া জেনিলেসচি (প্রেন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস 1989)। তারও পূর্বে হুইট্নে চাডউইক-এর লেখা Women, Art & Society (লন্ডন 1983)-তে এই শিল্পীর জীবনীর কিছু উল্লেখ আছে। চাডউইক মহিলা শিল্পীর জীবনীতথ্য খুব বেশি সংগ্রহ করতে না পারলেও তাঁর চিত্রগুলিকে সনাক্ত ও তার শৈল্পিক মূল্যায়নে যথেষ্ট কাজ করেন। এই সব সূত্র থেকে Kari Boyd McBride যে সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেছেন আমার মূল তথ্যসূত্র সেটাই। জীবনী সংকলনকারী বলেছেন:

> Artemisia Gentileschi was the most important women painter of Early Modern Europe by virtue of the excellence of her work, the originality of her treatment of traditional subjects and the number of her paintings that have survived.

এ পর্যন্ত তাঁর চৌত্রিশটি চিত্র চিহ্নিত হয়েছে। কিছু ছোট, কিছু বড়। সবই ক্যানভাসে আঁকা তৈলচিত্র। এগুলি এতদিন তাঁর সমকালীন অন্যান্য চিত্রকরের আঁকা বলে ধরা হত। এখন বিশেষজ্ঞরা শিল্পকর্মগুলি এই মহিলা চিত্রকরের বলে শনাক্ত করেছেন। জীবনীকার বলেছেন, She was both praised and disdained by contemporary critical opinion, recognized as having genius, yet seen as monstrous because she was a women excercising a creative talent thought to be exclusively male.

[সমকালীন চিত্র-সমালোচকেরা তাঁর শিল্পকর্মকে প্রশংসা ও নিন্দা দুই করেছেন; কিন্তু তাঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর শিল্পকর্মকে অনেকের চোখেই বীভৎস লেগেছিল, কারণ শিল্পী একজন মহিলা! এই সৃজনশীলতা যে স্ত্রীলোকের মধ্যেও দেখা যেতে পারে তা তাঁদের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায়নি।]

জেন্টিলেসচির জন্ম রোমে, 1593 সালের আটই জুলাই। বাবার নাম ওরাজিও আর মা প্রুডেনশিয়া মনোটোন জেন্টিলেসচি। মায়ের মৃত্যুকালে আর্টিমিসিয়ার বয়স দশ-বারো বছর। বাবা তাকে ছবি আঁকার কিছুটা তালিম দেন। কিছুদিন সে কারাভাজ্জিওর শিক্ষায়তনেও শিক্ষালাভ করেছিল। এখানেই সে Chiaroscuro (আলো ছায়ার তীব্র বৈপরীত্য) বিষয়ে আদিম পাঠ লাভ করে। বস্তুত তার সমগ্র শিল্পকর্মে এই আলো-ছায়ার বৈপরীত্য প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। মায়ের মৃত্যুর পর আর্টিমিসিয়া কিছুদিন চার্চের তত্ত্বাবধানেও ছিল। সেখানেই সে সাক্ষর হয়ে ওঠে এবং চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী হয়। তার সতেরো বছর বয়সে আঁকা একটি

চিত্র: সুসান্না এবং মোড়লেরা (Susanna & the Elders, 1611) চিত্রজগতে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। এই বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক শিল্পী চিত্রাঙ্কন করেছেন; আর্টিমিসিয়ার পূর্বযুগে এবং পরবর্তীকালে। কিন্তু আর্টিমিসিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ক্লাসিকাল বিষয়বস্তুটিকে কেউ দেখেছেন বলে মনে হয় না। বিষয়টা বাইবেল-এর প্রথম পর্বের। সুসান্নার পাতিব্রত্যর কাহিনী

সুসান্না অসামান্যা সুন্দরী। সে কেন তার প্রৌঢ় স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকবে?—এটাই প্রতিবেশী যুবকদের ক্ষোভ। সুসান্না যখন একে একে প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করল তখন তারা সকলে গিয়ে অভিযোগ জানালো পঞ্চায়েতের তিন বৃদ্ধ মোড়লের কাছে। তিন-মোড়লের মধ্যে একজনের উপর পড়ল অনুসন্ধানের ভার। নির্বাচিত মোড়ল ভাবল, সবার আগে সরেজমিন তদন্ত করে দেখা দরকার সুসান্না কতটা সুন্দরী। মেয়েটি যখন নির্জন ঝর্ণাতলায় বিবসনা অবস্থায় অবগাহন করে তখন তাকে দেখা দরকার। কিন্তু বিবসনা সুসান্নাকে দেখে মাথা ঘুরে গেল বৃদ্ধ মোড়ল মশাইয়ের। তার মুখে বর্ণনা শুনে বাকি দুই মোড়লেরও। তাঁরা তিনজনে মেয়েটিকে গোপনে জানালেন যে, সুসান্না যদি তিন রাত্রিতে তিন বৃদ্ধ মোড়লকে তৃপ্ত করে দেয় তবেই তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। সুসান্না স্বীকৃতা হয়নি। ফলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বাইবেল বলছেন মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার পূর্বেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বয়ং ড্যানিয়াল এসে মেয়েটির অপরাধের পুনর্বিচার করেন এবং তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন। বরং তিন কামার্ত পঞ্চায়েত মোড়লকেই শাস্তি দেওয়া হয়।

বাইবেলের এই কাহিনী নিয়ে অনেকেই ছবি এঁকেছেন। কিন্তু তাদের চিত্রধর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাইবেল অনুসারী নয়। বাইবেলে কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য ছিল; সুসান্নার সতীত্ব, তার পাতিব্রতা। মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হবার পরেও সে কামুক মোড়লদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদী মনোভাবের জন্যই সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পায়।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ শিল্পী স্নানরতা সুসান্নার সৌন্দর্য দেখাতেই ব্যস্ত। তার প্রতিবাদী স্বরূপকে মূর্ত করার দিকে নজর দেননি। ধরা যাক মহান শিল্পী তিন্তোরেত্তোর কথা (Jacopo Tintoretto, 1518-94)।

আমরা তিন্তোরেত্তোর চিত্রে দেখছি, স্নানান্তে বিবসনা সুসান্না একটি দর্পণে তার নগ্ন সৌন্দর্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। গাছের আড়াল থেকে বৃদ্ধ মোড়লও তা দেখছে। বাইবেল অবলম্বনে কাহিনি সঙ্কলিত হলেও তিন্তোরেত্তো তাঁর চিত্রের উপজীব্য করেছেন—আদিরস : একটি সুন্দরী ন্যুডের রূপায়ণে।

প্রখ্যাত চিত্র সমালোচক Deirdre Robson এই চিত্রটির সমালোচনায় বলেছেন, "Tintoretto's treatment of the subject is rather awkward for the modern viewer who is forced to identify himself with the elderly male voyeurs. Our eyes, like theirs, focus upon the highlighted and voluptuous charms of Susanna. The Biblical message has been transformed from one of the wifely virtue to female narcissism, even wantoness.

[বর্তমান যুগের দর্শক তাঁর দৃষ্টিতে তিন্তোরেত্তো যেভাবে বিষয়টির উপস্থাপনা করেছেন তাতে বিড়ম্বিত বোধ করেন। চিত্রদর্শনকালে তিনি নিজেকে ওই দর্শনকামী বৃদ্ধ-মোড়লদের সঙ্গে তুলনা করে লজ্জিত হন। ওই কামুক বৃদ্ধদের মতো আমাদের চোখও এই বিবসনা সুসান্নার কামনাদীপ্ত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বাইবেলের আবেদন ছিল রমণীর পাতিব্রত্যে। এ শিল্পে তা রূপান্তরিত হয়ে গেছে তার আত্মকামিতায় এমন কি লাম্পট্যে।]

রেনেসাঁ-যুগে দিকপাল ভেনিশীয় মহাশিল্পী তিন্তোরেত্তোর সঙ্গে অখ্যাত, অজ্ঞাত, আর্টিমিসিয়ার তুলনা যে আপত্তিকর এ কথা জানি; কিন্তু একই বিষয়বস্তুর উপর দুজন প্রায় সমকালীন শিল্পীর শিল্পকর্ম কেন তুলনা করা যাবে না? প্রবীণ প্রখ্যাত শিল্পী বাইবেলের যে খণ্ডকাহিনিকে নির্বাচন করেছিলেন সপ্তদশবর্ষীয়া কিশোরী তাকেই মনোনয়ন করে এঁকেছেন 'সুসান্না ও মোড়লেরা (Sunanna & the Elders 1611)'। এখানে সুসান্না 'নুড' নয়। নগ্নিকা নয়। অথচ বাইবেলের বর্ণনাকেও শিল্পী অস্বীকার করেননি। স্নানান্তে সুসান্না প্রায় বিবসনা, — তবু তার বামজানুতে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মেয়েটি তিন্তোরেত্তোর কল্পনা অনুযায়ী আত্মমগ্ন নয়। মোড়লদের উপস্থিতি সম্বন্ধে অচেতন নয়। তার উৎক্ষিপ্ত দুই বাহু এবং গ্রীবাভঙ্গিতে মূর্ত হয়েছে প্রত্যাখ্যান। প্রাচীরের অপর প্রান্ত থেকে মোড়লদ্বয়ের কামার্ত ভঙ্গির বৈপরীত্যে এই প্রত্যাখ্যানের মুদ্রাটি সোচ্চার। বাইবেলের বক্তব্য এখানে সুপরিস্ফুট। শিল্পীর অনুভাবনা আদৌ আদিরসাত্মক নয়। সুসান্নার পাতিব্রত্যও এখানে ফুটে উঠেছে।

এই ছবিটি আঁকার বৎসরখানেকের মধ্যে আর্টিমিসিয়া তার পিতৃবন্ধু অগস্টিনো তাসি কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। বলাৎকারের মামলাটি প্রায় এক বৎসর চলে। ইতিহাসে পাচ্ছি অগস্টিনো তাসিকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়।

গবেষকদের তথ্যানুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে বিচার শেষ হবার পর আর্টিমিসিয়া আর একখানি তৈলচিত্র আঁকে। বোধ করি সেটিই তার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। লেঅনার্দোর যেমন মোনালিজা, মিকেলাঞ্জেলোর যেমন ডেভিড, পীতা বা সিসতিন চ্যাপেল। এটি সে যখন আঁকে তখন সে ছিল চার্চের ছত্রচ্ছায়ায়। ছবিখানির নাম জুডিথ কর্তৃক হলোফার্নেস বধ (Judith slaying Holophernes, 1612—1613)। এই চিত্রটির সম্বন্ধে সমালোচক বলছেন—

The painting is remarkable not only for its technical proficiency, but for the original way in which Gentileschi portrays Judith, who had long been a popular subject for art.

[প্রযুক্তিগত সাফল্যের জন্যই শুধু নয়, এই শিল্পকর্মটি অনবদ্য এ-কারণে যে, জুডিথ-এর রূপারোপে জেন্টিলেস্‌চি একটি অচিন্ত্যপূর্ব অনুভাবনাকে শিল্পের রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন। এই বিষয়বস্তুটির উপর অনেক পূর্বাচার্য তৈলচিত্র এঁকেছেন, কিন্তু জেন্টিলেসচি এ কাহিনিতে এমন একটি মাত্রা দিয়েছেন যা শিল্পভাবনায় অভূতপূর্ব।]

এই চিত্রটি সমাপ্তির পরেই আর্টিমিসিয়ার বিবাহ হয়। তার পিতা একটি পাত্র জুটিয়ে এনে কন্যার গতি করেন। পাত্রের নাম : পেত্রো আন্তোনিও (Pictro Antonio di Vincenzo

Stiattesi)। সে ছিল ফ্লোরেন্সের এক অনামী চিত্রকর। কিন্তু এই বিবাহের কথা বর্ণনার পূর্বে কথাসাহিত্যিককে অনুমতি দিন—'জুডিথ হলোফার্নেস' চিত্রের পটভূমিকা রচনার:

সিস্টার পাওলো এসে মাদার মার্গারিটাকে জনান্তিকে জানালো যে, আর্টিমিসিয়া একটা দুর্মনস্যতায় ভুগছে। সে ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করে না। কারও সঙ্গে গল্পগুজবও করে না। দিনরাত আপনমনে বাগানে নিশ্চুপ বসে থাকে। মাদার বললেন : আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি। ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তো।

আর্টিমিসিয়াকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে মাদার বললেন, তুই এমন উদাসীন হয়ে গেলি কেন, মা? কাজে হাত দে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকবার চেষ্টা কর। কীভাবে কাজ শুরু করবি বল?

—আপনিই বলুন?

—আমার তো বিশ্বাস, তুই ছবি-আঁকা শুরু করলেই জীবনের প্রতি এই নেতিবাচক মনোভাব থেকে উদ্ধার পাবি। পরম করুণাময় তোকে অঙ্কন-প্রতিভা দিয়েছেন। দুর্লভ সে সৌভাগ্য। তার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যেতে পারলেই এই দুঃখবাদ থেকে তোর উত্তরণ হবে। তুই আমাকে সাহায্য কর 'ইলুমিনেশন'-কাজে। বাইবেলের পাতায় পাতায় ছবি এঁকে।

আর্টিমিসিয়া রাজি হল। এতদিনে সে ডানহাতের আঙুলগুলো মুঠো করতে পারছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে ফিরে এসে বললে, 'ওই বাইবেলের পৃষ্ঠায় ফুল-পাখি-লতাপাতার 'ভিগ্‌নেট' এঁকে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, মাদার। ও কাজ আমার ভালো লাগছে না।

মাদার বলেন, তাহলে এক কাজ কর। একখানা বড় ক্যানভাস আঁকতে শুরু কর। যেমনভাবে সুসান্নাকে এঁকেছিলি।

—কিন্তু বিষয়বস্তু কী হবে?

—আমার পরামর্শ যদি চাস তাহলে আমি বলব তুই জুডিথ আর হলোফার্নেস-এর একখানা ছবি আঁক।

—তুমি অনেকবার জুডিথ আর হলোফার্নেস-এর কথা আমাকে বলেছ। কিন্তু ওদের উপাখ্যানটা আমি জানি না। কোথায় পাব?

—পাবি ওল্ড টেস্টামেন্টে। আমিই তোকে দেব সেটা। কিন্তু দ্য হোলি বাইবেলের জুডিথ-এর উপকথাটি অতি সংক্ষেপে লিখিত। তা হোক, আমার কাছে একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি আছে ওই কাহিনির বিস্তার করে। সেটা লিখেছিল আর এক হতভাগিনী। প্রায় সাত বছর আগে সে মারা যায়। এই কনভেন্টেই সে আশ্রয় নিয়েছিল : সিস্টার হেলেনা। কনজামশনে (যক্ষ্মারোগে) সে আমার কোলে মাথা রেখেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। ওর পাণ্ডুলিপিটি সে আমাকেই দিয়ে যায়। আমি তার কোনও ব্যবস্থা করতে পারিনি। তুই পড়ে দেখ বরঞ্চ।

—দেখব। কিন্তু সিস্টার হেলেনা হঠাৎ এ কাহিনিটি বেছে নিয়েছিলেন কেন? এই উপাখ্যানটি তাঁকে আকৃষ্ট করল কেন?

—সে হতভাগিনী ছিল তোরই মতো 'অত্যাচারিতা'। স্বামীর অত্যাচার থেকে অব্যাহতি

পেতে সে আমাদের কনভেন্টে এসে আশ্রয় নেয়। হেলেনা ছিল সুন্দরী আর তার স্বামী ছিল অত্যাচারী প্রভাবশালী জমিদার। কিন্তু চার্চে এসে যে আশ্রয় নেয়, তাকে রাজনৈতিক প্রভাবশালী জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। কিন্তু জীবনমুখী করতে পারিনি। এই নাটিকাটি লিখেই সে তৃপ্ত হয়েছিল। এটাই তার প্রতিবাদী অবদান। তুই নাটিকাটি পড়ে দেখ প্রথমে। অবশ্য তার আগে দ্য হোলী বাইবেলের ওই কয়টি পৃষ্ঠাও পড়ে নিতে হবে।

—সিস্টার হেলেনার উপর তার স্বামী কী জাতের অত্যাচার করত?

—সেসব কথা পরে বলব। প্রথমে তুই নাটিকাটি পড়ে দেখ।

সে অনেক-অনেক দিন আগেকার কথা। পশুপাখিরা অবশ্য তখন মানুষের ভাষায় কথা বলত না, কারণ এ কোন ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি কথিত উপকথা নয়। জুডিথ এবং হলোফার্নেস দুজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি—একজন ইহুদি অপরজন আসীরিয়। পবিত্র বাইবেলের প্রাচীন খণ্ডে তাঁদের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সাল-শতাব্দি দিয়ে বাইবেল তাঁদের চিহ্নিত করেননি বটে, তবে নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন মরামানুষ। চীনখণ্ডের প্রাচীর হয়তো ততদিনে মাথা তুলে জেগে ওঠেনি কিন্তু মিশরের গিজা শহরে পিরামিডগুলি উঠেছে।

তাহলে প্রথমে ইহুদিদের কথা এবং অসীরিয়দের কিছুটা পরিচয় দিতে হয়।

মানবসভ্যতায় ইহুদিদের দান অনস্বীকার্য। সমরবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা শিল্পে তাদের অবদান যথেষ্ট না হলেও ধর্মে, নীতিশাস্ত্রে তাদের দান অনস্বীকার্য। এদের কাছ থেকেই মানব ইতিহাস লাভ করেছে 'জুডাইজম্'। তার প্রভাব অসামান্য।

সম্ভবত ইহুদিদের আদিনিবাস ছিল ইউফ্রেডিস অববাহিকার দক্ষিণাংশে। শতাব্দির পর শতাব্দি তারা অনিকেত—যাযাবরের মতো ঘুরে মরেছে স্থায়ী বাসভূমির সন্ধানে: হোম-ল্যান্ড'।

শেষমেশ তারা ভূমধ্যসাগরের পূর্বপারে 'কানান' অঞ্চলে আস্তানা গাড়ে। যার নাম হয় প্যালেস্তাইন। একদিকে লবণাক্ত সমুদ্র অপরদিকে উষর মরুভূমি—তার মাঝখানে একফালি জনবসতি—দৈর্ঘ্যে দেড়শ মাইল, প্রস্থে তার এক-তৃতীয়াংশ হয়-কি-না-হয়। চাষ আবাদে ব্যর্থ হয়ে তার যোসেফের নেতৃত্বে পূর্বমুখে রওনা হয়ে এসে উপনীত হয় মিশরে। ক্রমে তারা মিশর-অধিপতির ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দিতে মোজেস্-এর নেতৃত্বে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে তারা আবার মহানিষ্ক্রমণে ভবঘুরের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মোজেস্ সিনাই-পর্বতে ঈশ্বরের দশটি আদেশ লাভ করেন এবং তাঁর অনুগামীদের কাছে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থাপিত করেন।

কানান-এ প্রত্যাবর্তন করে মোজেস্-অনুগামীরা একটি রাজ্য গঠন করেন। কানানাইট আর ফিলিস্টাইনদের পরাজিত করে গড়ে ওঠে ইহুদিদের নতুন রাজ্য প্যালেস্তাইন। ডেভিড

(খ্রিঃ পূঃ 1000-960) গোলিয়াথ অসুর (আশীরিয় সেনাপতি?) কে বধ করে ইহুদিদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। ডেভিডের পুত্র সলোমনের আমলে ইহুদিরা উন্নতির গৌরীশৃঙ্গে উপনীত হয়।

ক্রমে এ রাজ্যটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে—উত্তরাংশে ইসরেইল এবং দক্ষিণাঞ্চলে জুডা। ইতিহাসে দেখছি, ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর উর্বর উপত্যকার ক্যানানিয়ান নৃপতি নেবুচাডনেজারের সৈন্যবাহিনী পূর্বাঞ্চল থেকে অভিযান করে এসে একে একে দুটি রাজ্যকেই পদানত করে। প্রথমে ইসরেইল রাজ্য (722 খ্রিঃ পূঃ) পরে জুডা (586 খ্রিঃ পূঃ)।

সিস্টার হেলেন রচিত নাটকের পটভূমি দেখা যাচ্ছে ওই আসীরিয় নৃপতি নেবুচাডনেজার জুডা অভিযান কালে। হলোফার্নেস ছিল এই অভিযানের সেনাপতি আর জুডিথ ওই জুডার নগরপালের বালবিধবা কন্যা। অর্থাৎ ঘটনা—নাট্যকারের অভিমতে ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বুদ্ধদেবের প্রায় সমকালে।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে আমরা উপনীত হচ্ছি অভিযানকারী বিজয়ী মহানায়ক হলোফার্নেসের যুদ্ধ-শিবিরে। শিবিরটি উষ্ট্রচর্ম নির্মিত। জুডা শহরের উপকণ্ঠে। অভিযানকারী মহানায়কের আদেশে সেই যুদ্ধশিবিরে নীত হয়েছেন শৃঙ্খলাবদ্ধ জুডার নগরপাল আব্রাহাম। হলোফার্নেস অত্যন্ত নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু নররাক্ষস। ব্যাবিলন থেকে যে পথে সে এসেছে সে পথকে করে এসেছে মহাশ্মশান! নরনারীর মৃতদেহে সে পথ এক রক্তাক্ত বিভীষিকা। পরাজিত নরনারীকে ক্রমাগত হত্যা করতে করতে লোকটা ক্লান্ত। তাই যদিও তার বিজয়ী সেনাবাহিনী জুডা-নগরীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তবু সেনাপতির আদেশে কেউ নগরে প্রবেশ করেনি। এখনো তারা লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করেনি।

মহানায়কের আদেশে পরাজিত জুডা-নগরপালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসা হল। হলোফার্নেস সোজা কথার মানুষ। বললে, তোমারই নাম আব্রাহাম? তুমি জুডার নগরপাল?

অবনত মস্তকে বন্দী সে কথা স্বীকার করেন।

—আশা করি তুমি আমার কীর্তিকাহিনির বিষয়ে কিঞ্চিত অবহিত। ব্যাবিলোন থেকে এই জুডায় উপনীত হতে আমি অনেকগুলি জনপদ অতিক্রম করেছি—নিনিভ, সিডন, টায়ার, জেরিকো, জেরুসালেম। সেই জনপদগুলির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা আছে?

বন্দী আব্রাহাম নতমস্তকে নীরব রইলেন।

হলোফার্নেস গর্জন করে ওঠে, কী রে হারামজাদা? কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন? জিবটা কেটে ফেলে দিলে জবাব দিবি?

আব্রাহাম অধোবদনে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, মহানায়ক। শুনেছি সেই জনপদ এক একটি মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে।

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছিস। কিন্তু কেন জানিস? সেই সব নগরের মূর্খগুলো এই সহজ সত্যটা বিশ্বাস করত না : 'কাপুরুষেরা চাষবাস করে, সঞ্চয় করে আর যারা বীর, ক্ষমতাশালী তারা ভোগ করে।' ওই জনপদগুলির প্রত্যেকটিতে আমি সহজ সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম।

ওরা স্বীকৃত হয়নি। ফলে সেগুলি লুণ্ঠন এবং জনশূন্য করে আমাকে অগ্রসর হতে হয়েছে এখন তোর পালা। তোর সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে। হয় আমার শর্ত মেনে নিয়ে আমাদের আপ্যায়ন কর। সেক্ষেত্রে আমরা জুডা নগরে প্রবেশই করব না। এখান থেকেই ফিরে যাব। না হলে কাল সকালে আমরা নগরে প্রবেশ করব। জুডা-নগরীকে শ্মশান করে ফিরে যাব। বল, কী চাস?

আব্রাহাম জানেন, ওই দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। আসীরিয় অভিযানকারীদের সঙ্গে আছে রথারূঢ় দুর্ধর্ষ ধানুকী, রণহস্তী এবং অসংখ্য পদাতিক। এসব কিছুই তাঁর নাই। বললেন, কী শর্ত মহানায়ক? কীভাবে আমরা অতিথিসেবা করতে পারি বলুন?

— শোন্ তাহলে। তোদের সিনাগগের সংলগ্ন রত্নভাণ্ডার আমাদের সৈন্যদলের কাছে উন্মুক্তদ্বার করে দিতে হবে। সব কিছু এতটা রাস্তা আমরা বহন করে ফিরে যেতে পারব না। শুধু স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণখচিত অলঙ্কার এবং হীরা-মণি-মুক্তা আমরা বেছে নেব। এগুলি বহন করে নিয়ে যাবার উপযুক্ত গো-শকটও তোদের জোগান দিতে হবে। রাজি?

আব্রাহাম বললেন, স্বীকৃত না হলে আপনি জুডা নগরীকেও মহাশ্মশানে রূপান্তরিত করবেন। ফলে আমি স্বীকৃত মহানায়ক।

—দু নম্বর শর্তের কথা বলার পূর্বে একটু ভূমিকা করি। আমার সৈন্যদলে অধিকাংশই যুবাপুরুষ। তারা নিজ নিজ গৃহ এবং গৃহিণীকে ত্যাগ করে প্রায় সাতটি চান্দ্রমাস আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরছে। তাদের আহার আমি যোগান দিই। কিন্তু যৌবনকালে আরও একজাতির খিদে তো থাকে। সেটা অন্তত এক রাতের জন্যে তোদের মিটিয়ে দিতে হবে। কিছু বুঝলি?

আব্রাহাম নীরব, নিস্পন্দ।

হলোফার্নেস বলে, কাল সারাদিনে আমার সৈন্যরা তোদের ধনভাণ্ডার থেকে ইচ্ছামতো রত্নসম্ভার সংগ্রহ করে গো-শকটে বোঝাই করবে। তারপর তোদের জুডা নগরীর অন্তত তিনশ যৌবনবতীকে আমাদের শিবিরে পাঠিয়ে দিতে হবে—অনূঢ়া, সধবা, বিধবা যাই হোক। শুধু দেখতে হবে যে, তারা সুন্দরী এবং বালিকা বা প্রৌঢ়া না হয়। আঠারো থেকে আটত্রিশ। বুঝলি কিছু?

আব্রাহাম এবারও জবাব দিতে পারলেন না। হলোফার্নেস বলে, না, না, তাদের আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব না। প্রত্যেকটি সুন্দরী একরাত্রে তিন-চারজন সেনানায়ককে তৃপ্ত করে রাত্রি প্রভাতে শহরে ফিরে যাবে। একরাত্রের পরিশ্রম। ব্যস।

আব্রাহামের শৃঙ্খল মোচন করা হল। হলোফার্নেস বললে, এবার তুই তোর শহরে ফিরে যেতে পারিস। যা।

আব্রাহাম নতমস্তকে প্রস্থানদ্বারের দিকে অগ্রসর হতেই পিছন থেকে হলোফার্নেস বলে ওঠে, ও হ্যাঁ। একটা কথা বলতে ভুলেছি। আজ রাতের জন্য আমার শিবিরে একটি সুন্দরীকে পাঠিয়ে দিস্। রাত্রি প্রথম প্রহর শেষ হলে। মনে রাখিস্ ,সে হারামজাদি যদি আমাকে আজ

রাত্রে তৃপ্ত করতে না পারে তাহলে কাল সকালে আমার তরফে নতুন কিছু শর্ত আরোপ করা হবে।

নতমস্তকে আব্রাহাম ফিরে এলেন নিজ আবাসে। তাঁর অনুচরেরা সব কথা শুনে বজ্রাহত হয়ে গেল। অশুভ সংবাদ বিদ্যুতবেগে প্রবাহিত হয়। অর্ধদণ্ডের ভিতরেই সমস্ত জুডা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ।

নগরপালকে শৃঙ্খলমুক্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল সবাই। কিন্তু সব কথা বিস্তারিত শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নগরীর কেন্দ্রস্থলে সিনাগগের পাশেই পৌরসভাগৃহ। নগরীর নির্বাচিত পঞ্চপ্রধান ঘিরে বসলেন নগরপালকে। সন্ধির সূত্র হিসাবে আসীরিয় সেনানায়কের প্রস্তাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন পঞ্চপ্রধান। তাঁরা ধিক্কার দিতে থাকেন নগরপালকে। এমন অপমানকর প্রস্তাবে কেন রাজি হলেন নগরপাল?

নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে মানুষ যখন চরম অপমানকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় তখন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো সে প্রত্যাঘাতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। পঞ্চপ্রধান কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করতে থাকেন আব্রাহামকে। তিনি বলেন, আমার সে সময় মনে হয়েছিল হলোফার্নেসের প্রস্তাব—তা সে যতই নিষ্ঠুর অবমাননাকর হোক—স্বীকার করে না নিলে জুডা শ্মশানে পরিণত হবে। প্রত্যেকটি বাড়ি লুণ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি রমণী ধর্ষিতা হবে এবং প্রত্যেকটি পুরুষ নিহত হবে। আপনারা মনে করছেন, আমি এককভাবে জুডানগরীর পক্ষে ক্ষতিকারক প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়েছি। হতে পারে। মানুষমাত্রই ভুল করে। তার প্রতিকার হিসাবে আমি এই মুহূর্তে পদত্যাগ করছি। আপনারা বলুন, পঞ্চপ্রধানের মধ্যে কাকে নগরপাল করা হবে। এখনি নির্বাচন হয়ে গেলে তিনি পুনরায় আগন্তুক দানবের সঙ্গে নতুন করে সন্ধির আলোচনা শুরু করতে পারেন।

সকলেই অধোবদনে নীরব রইলেন। বুঝলেন, আসীরিয় দানবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আব্রাহাম কোনও সমাধানে উপনীত হতে পারতেন না। তবু ক্ষুব্ধ এক নগরপ্রধান কণ্ঠে বিষ ঢেলে বলে ওঠেন, এত বিলম্বে নূতন কোনও সূত্রের সন্ধান করতে যাওয়া মূঢ়তার পরিচায়ক। 'নগরপাল নির্বাচন' জুডার ইতিহাসে কখনো এমন রাতারাতি ঘরোয়াভাবে হয়নি। আপনি যখন শুরু করেছেন, তখন আপনিই শেষ করুন। নগরীর তিনশত রমণীকে আপনিই চিহ্নিত করুন।

আব্রাহাম বলেন, তা কেন? আপনারা নগরীর পাঁচটি অঞ্চলের প্রতিনিধি। আপনারা যদি আমার প্রস্তাব স্বীকার করেন তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকা থেকে তিনকুড়ি করে মহিলাকে নির্বাচিত করুন—যাঁরা নিজ নিজ নারীত্ব মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে নগরীকে রক্ষা করবেন।

ক্ষুব্ধ নগরপ্রধান তৎক্ষণাৎ বলেন, আপনি আমাদের নেতা। আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু সে নির্বাচন তো হবে আগামী কাল—আজ রাত্রের জন্য সেই পাষণ্ডের শিবিরে কোন ভাগ্যবতী যাবেন অন্তত সে কথা আপনি বলুন?

আব্রাহামকে জবাব দিতে হল না। প্রবেশদ্বারের কাছ থেকে শ্রুত হল বামাকণ্ঠে এ প্রশ্নের

প্রত্যুত্তর 'মহামান্য নগরপাল তাকে ইতিপূর্বেই নির্বাচিত করেছেন। আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না।'

সকলের দৃষ্টি গেল দ্বারপথে দণ্ডায়মানা নগরপালের দ্বাবিংশতিবর্ষীয়া একমাত্র কন্যাটির দিকে। অনিন্দ্যকান্তি জুডিথ।

আব্রাহাম বলেন, তুই কখন এলি? কে? কে? সেই শহিদ?

জুডিথ ইদ্দিসভাষায় শুনিয়ে দিল একটি প্রচলিত প্রবাদ, যার ইংরেজি অনুবাদ : Charity begins at home (আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও!)

রাত্রি এক প্রহর অতিক্রান্ত। আসীরিয় সেনাধ্যক্ষ আহারান্তে শয্যাগ্রহণের উপক্রম করছিল। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ সে—বেতমিজটা তার প্রতিশ্রুতি রাখেনি। আজ রাত্রে তাঁর শয্যাসঙ্গিনীর ব্যবস্থা করেনি। ঠিক তখনি ওর দেহরক্ষী শিবিরের প্রবেশপথ থেকে সবিনয়ে বলে ওঠে, 'জনাব! জুডা-শহর থেকে দুজন এসেছে হুজুরের সঙ্গে মুলাকাৎ করতে....'

—এত রাত্রে? ওই দুই আদমিকে বলে দে কাল সকালে আসতে।

—আদমি নেহি জনাব। ঔরৎ।

শয্যায় উঠে বসে হলোফার্নেস। বলে, দুজন কেন? ঠিক আছে। ওদের তল্লাশি করেছিস? চোরা গোপ্তা কিছু আনেনি তো?

—জী নেহি জনাব।

—ঠিক আছে। ওদের ভিতরে আসতে বল। তুই চলে যা।

শিবিরের রেশমপর্দা সরিয়ে ভিতরে এল দুটি রমণী। একজন প্রৌঢ়া, অনবগুণ্ঠিতা, অপরজন আপাদমস্তক বোরখা ঢাকা।

—কী চাস তোরা?

—আপনি সেবা করার জন্য একজনকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন তাই এসেছি।—প্রৌঢ়া উত্তরে জানায়।

—তা দুজন কেন?

—জনাব! ইনি হচ্ছেন আমাদের নগরপাল মহামতি আব্রাহামের কন্যা জুডিথ। ইনি পর্দানসিনা। একা কখনো পথে বার হন না। আমি ওই পরিবারের ক্রীতদাসী। ওঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি।

—ঠিক আছে। তুই যা। বাকি রাতটুকু ওই পাশের তাঁবুতে থাকবি। সকালে এসে এই ঔরৎটাকে ওর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবি, যা!

দ্যা হোলি বাইবেল বলেননি কীভাবে জুডিথ সেই দানবটাকে তৃপ্ত করেছিল। তার নারীত্ব এবং কুমারীত্ব তাকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল কি না সে বিষয়েও বাইবেল নীরব। জুডিথ কুমারী অথবা বালবিধবা এ বিষয়েও মতভেদ আছে। বোধ করি সেই অনিবার্য কদর্য আলোচনা এড়িয়ে যেতেই বাইবেল এ বিষয়ে মিতবাক। কিন্তু বাইবেল বলেছেন সেই বীভৎস রাত্রির মাধ্যমে জুডিথ ওই কামার্ত দানবটাকে অতিরিক্ত মদ্যপানে বেহুঁশ করতে

পেরেছিল। পাশের তাঁবু থেকে ডেকে এনেছিল তার সঙ্গিনীকে। তারপর দুজনে মিলে হলোফার্নেসের তরবারির সাহায্যে সেই নরপিশাচের মুণ্ডটি স্কন্ধচ্যুত করেছিল।

শেষ রাত্রে পূর্ব পরিকল্পনামতো জুডিথ কার্য সমাপ্ত করেই শঙ্খধ্বনি করে। জুডার সৈন্যদল অতর্কিতে আক্রমণ করে নিদ্রারত আসীরিয় বাহিনির উপর। সেনাপতির ছিন্নশির নিয়ে একই সঙ্গে রণভূমিতে রণনৃত্য শুরু করে দেয় জুডিথ। তার দক্ষিণ হস্তে আসীরিয় সেনাপতির রক্তস্নাত তরবারি, অপর হস্তে তার ছিন্ন শির। আসীরিয় বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেই শেষরাত্রের রণভূমিতে রথ, অশ্ব, হস্তীর কোনো ভূমিকা ছিল না। বরং জুডাবাসীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং হাতিয়ার বন্ধ।

এই নাটিকায় আর্টিমিসিয়া খুঁজে পেল যা সে খুঁজছিল। পুরুষের পাশবিকতার বিরুদ্ধে নারীর সক্রিয় প্রতিবাদ। সশস্ত্র প্রতিরোধ। মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল তার দুর্মনস্যতা। রঙ-তুলি ক্যানভাস নিয়ে আঁকতে বসে গেল পুরুষের পাশবিতার বিরুদ্ধে নারীর রক্তাক্ত প্রতিশোধ।

সে খোঁজ করতে থাকে এই বিষয়বস্তুর উপর পূর্বাচার্যরা কী এঁকেছেন। ফাদার সিভেস্টিয়ানের সংগ্রহেই পেয়ে গেল একাধিক কপি। সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রটি লুকাস ক্রানাচ দ্য এলডারের (Lucas Cranach the Elder, 1472-1553—বর্তমানে ভিয়েনার চিত্র সংগ্রহশালায় রক্ষিত)। জ্যেষ্ঠ ক্রানাচ ছিলেন ডুরারের পরেই জার্মান রেনেসাঁ শিল্পীদের মধ্যে সর্ববিখ্যাত।

আর্টিমিসিয়ার কিন্তু মন ভরল না। এ কী জুডিথ? ক্রানাচের তৈলচিত্রে দুটি বিশেষ্যপদ আছে— দুটি পুতুল ; কিন্তু ক্রিয়াপদ নেই! যে টেবিলের উপর হলোফার্নেসের কর্তৃত মুণ্ডটি সুসজ্জিত, তাতে এক ফোঁটা রক্তের দাগ লাগেনি। সেটি 'স্পটলেসলি ক্লীন'। যেন অস্ত্রোপচারের পূর্বে অপারেশন টেবিল। জুডিথের সযত্নবিন্যস্ত সাজপোশাকে সদ্যসমাপ্ত বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রতিফলন নেই। এমনকি মনে হচ্ছে জুডিথ ফটো তোলাতে স্টুডিওতে আসার আগে তার তরবারিখানি ধুয়ে মুছে সাফা করে নিয়ে এসেছে! ঠোঁটে লিপিস্টিক দিতেও ভোলেনি। সে যেন শুনতে পেয়েছে ফটোগ্রাফারের নির্দেশ : ইস্‌মাইল! তাই তার মুখ হাসি-হাসি।

আর্টিমিসিয়া সম্পূর্ণ নূতনভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করল।

জুডিথের সহকারিণীকে কেউ এঁকেছেন, কেউ উপেক্ষা করেছেন, যেমন ক্রানাচ। আর্টিমিসিয়া তার অবদানকে অস্বীকার করেনি। তার চিত্রপটে তিনটি চরিত্র; কিন্তু কারও মুখাবয়ব স্পষ্ট করে আঁকা হয়নি; আর্টিমিসিয়া এঁকেছে ক্রিয়াপদটিকে, বিশেষ্য পদগুলি এঁকেছে পাদপূরণার্থে। হলোফার্নেস চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার চুলের মুঠি দৃঢ় হস্তে ধরে আছে জুডিথের সহকারিণী। আলোছায়ার খেলায় আলোক-উৎস জুডিথের দক্ষিণভাগের উপর অংশ থেকে। স্বাভাবিকভাবে যার মুখে যতটা আলো পড়ার কথা ততটাই পড়েছে। জুডিথ চেপে বসেছে দানবটার বুকের উপর। তার দৃষ্টি নীচের দিকে, তাই মুখটা ভাল দেখা যায় না। কিন্তু যেটুকু দেখা যায় তাতে হত্যাকারিণীর প্রচণ্ড উত্তেজনা মূর্ত হয়েছে। তার

মাথায় অবগুণ্ঠন, কিন্তু তার প্রতিশোধস্পৃহা অনবগুণ্ঠিত!

-আর্টিমিসিয়ার পূর্বাচার্য বা সমকালীন কোনও রেনেসাঁ শিল্পী তাঁদের শিল্পকর্মে এ জাতীয় নাটকীয়তা আনতে পেরেছেন বলে আমাদের জাবানেই। সে হিসাবে আর্টিমিসিয়া মহিলা শিল্পী হিসাবেই শুধু নয়, রেনেসাঁশিল্পী হিসাবে একমেবাদ্বিতীয়া, অনন্যা!

মাস দুয়েক পরের কথা। ওরাজিও এল কনভেন্টে মেয়ের তত্ত্বতালাশ নিতে। ইতিমধ্যে মাদার সুপিরিয়ারের সুপারিশে সে রোমের নগরপালের অনুমোদনে মোটামুটি কিছু ঋণ পেয়েছে 'ডাওরি ফান্ড' থেকে। অর্থাৎ নিম্নবিত্তের মানুষ যখন অর্থের অভাবে কন্যার

বিবাহ দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে তখন সেই বিপদগ্রস্ত পিতাকে অতি অল্প সুদে এ ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পিতা সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করে দায়মুক্ত হয়। তারপর ধীরে ধীরে ঋণ পরিশোধ করে।

ওরাজিওকে সাক্ষাৎকক্ষে বসিয়ে রেখে সিস্টার গ্রাজেল্লা এসে সংবাদ দিল মাদারকে। আর্টিমিসিয়াকে সঙ্গে করে মাদার নীচে নেমে এলেন 'সাক্ষাৎকক্ষে'।

ওরাজিও সসম্মানে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনার স্নেহের দান আমি জীবনে ভুলব না, মাদার। আমি সমস্ত ব্যবস্থা সেরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। আপনি অনুমতি দিলে আমার কন্যাটিকে এবার নিয়ে যাব।

মাদার বললেন: আপনি 'ডাওরি' ঋণটা পেয়েছেন এ খবর পেয়েছি। কিন্তু আর্তির জন্যে যে ইতিমধ্যে সুপাত্রের ব্যবস্থাও করেছেন এ খবরটা পাইনি। সে কাজটি কি সুসম্পন্ন হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব কিছু সুপাত্র বলতে পারি না। তবে আর্টিমিসিয়ার যে অবস্থা তাতে এর চেয়ে ভালো পাত্র আর জোগাড় করতে পারলাম কই?

— ছেলেটি কি রোমেই থাকে? কী করে? কত বয়স?

—আজ্ঞে না। রোমের বাসিন্দা নয়। ও থাকে ফ্লোরেন্সে। ও একজন আর্টিস্ট। এই আমারই মতো। 'ফ্রিলান্স-আর্টিস্ট'। ছবি আঁকে, বেচে। কমিশন পেলে ম্যুরাল বা ফ্রেসকোও আঁকে।

—তার বয়সটা এখনো বলেননি।

—বয়স আর কত হবে? বছর চল্লিশ। প্রৌঢ় নয়। দেখতেও মন্দ নয়। মাতৃপিতৃহীন। একাই থাকে ফ্লোরেন্সে।

—কোথায় তার সন্ধান পেলেন? এত কথা জানলেন?

—'ম্যাচমেকারের' মাধ্যমে। সে আমাদের অঞ্চলে একজন নামকরা ম্যাচমেকার। তার হাতে কিছু অগ্রিম পাঠিয়েছি। ছেলেটি রোমে এসে পৌচেছে। আমি আর্টিমিসিয়াকে আজ নিয়ে যাব। ওদের দুজনের পরিচয় করিয়ে দেব। দুজনে যদি দুজনকে পছন্দ করে তবেই বিয়েটা হবে। নচেৎ নয়।

মাদার বলেন, তা তো বটেই। আমরা তো নিমিত্তমাত্র। ওরা দুজনেই তো সংসার করবে। তুই কী বলিস রে আর্তি?

আর্টিমিসিয়া অধোবদনে এতক্ষণ উৎকণ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'আমি কাল যাব। আজ যাব না, মা!'

কথাটা মনে ধরল মাদারের। জনান্তিকে তাঁর 'আর্তি'র সঙ্গে এ বিষয়ে কিছু কথা বলা দরকার। এ এমন একটি মরণ-বাঁচন সমস্যা, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যে, মুহূর্তমধ্যে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ঘটনা যে সময়ের তখন ইতালিতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মেরই জয়জয়কার। ওরা রোমান ক্যাথলিক। আজ বিয়ে, কাল ডিভোর্স, পরশু-ম্যারেজ, এমন আইন নেই। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলে সেই 'টিল ডেথ্ ডু আস পার্ট' পর্যন্ত অচ্ছেদ্যবন্ধন।

মাদার ওরাজিওকে বললেন, আপনার বাড়িতে যে মহিলাটি ছিলেন —অ্যালেন, না কী যেন নাম—তিনি কি মিলানে ফিরে গেছেন?

—না, আর্টিমিসিয়ার বিবাহটা না মিটে গেলে তাকে ছাড়তে পারছি না। আমার বাড়িতে আর কেউ নেই তো...

আর্টিমিসিয়া বললে, তাহলে কাল এস বাপি, আজ নয়।

— বেশ তো, তাই হবে। এখান থেকে সরাসরি আমি তোকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব। ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে আসব। তোরা দুজনে লাঞ্চ করতে করতে আলাপ করবি। তোরা দুজনে রাজি হলে পরশু দিন্ বিবাহ্ হতে পারে।

—মাত্র একদিন পর? — বিস্মিত মাদার প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি দু'হাত এক করে দিতে না পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

—আপনি ছেলেটির সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন তো?

—নিশ্চয়। এ ম্যাচমেকার খুবই বিশ্বস্ত। তাঁকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি।

—কী নাম পাত্রটির?

—পেত্রো আন্তোনিয়। ম্যাচমেকার বলল, তার ঘরের দেওয়ালে এত ছবি যে, দেওয়ালটা যে কী রঙের তা ঠাওর হয় না।

—তার মানে তার কোনো ছবিই বিক্রি হয় না?

—না, না, সেকথা বলিনি। হয়তো সে একদিক থেকে যত আঁকে ওদিক দিয়ে ততই বিক্রি হয়ে যায়। বুঝলেন না?

মাদার বললেন, হ্যাঁ বুঝেছি এ তো সোজা কথা। পাটিগণিতে এ জাতের অঙ্ক থাকে। ভরা চৌবাচ্চায় যত বেগে জল আসে ততবেগেই আর একটি পাইপ দিয়ে নির্গত হয়ে যায়। তাই চৌবাচ্চা উপচে পড়ে না।

ওরাজিও হেঁ-হেঁ করে হাসল।

আর্টিমিসিয়া আবার বললে, আমরা দুজনে যদি রাজি হই তাহলে বিয়েটা হবে কোথায়? ফ্লোরেন্সে না রোমে?

—না, না, বিবাহ সম্পন্ন না হবার আগে আমি কি পেত্রোর হাতে তোকে ছেড়ে দিতে পারি? বিবাহটা হবে এখানেই। রোমেই।

—রোমের কোন গির্জায়। —মাদার জানতে চাইলেন।

ওরাজিও আমতা আমতা করে বলে, না, রোমে ঠিক নয়। একটু শহরতলিতে। একটা প্যারিশ চার্চে। সেখানকার পাদরিকে আমি বলে রেখেছি।

—কেন? রোমের কোনো চার্চ নয় কেন? আমাদের চার্চেই হতে পারে।

—না, মাদার। আমি ব্যাপারটা বেশি জানাজানি করতে চাই না। মহামান্য লোকামটেনেন্টির রায়টার কথা সবাই জানে তো। একটা হাঙ্গামা হতে পারে।

—বুঝলাম। তা পেত্রো আন্তোনিয়কে আপনার মেয়ের ব্যাপারটা জানিয়েছেন তো?

—নিশ্চয়।

— সে কত 'বরপণ' দাবি করেছে? ডাওরি কত দিতে হচ্ছে?

—ত্রিশ ডুকাট। একটু বেশি হয়ে গেল। কিন্তু কী করি বলুন?

—না, বেশি তো হয়নি। ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রাই তো নির্দিষ্ট বাজার দর।

—নির্দিষ্ট বাজার দর? মানে? কোথায় লেখা আছে?

—'দ্যা হোলি বাইবেল'-এ। জুডাম তাই পেয়েছিল। সেকথা যাক। আপনি তাহলে কাল কখন আসছেন?

—সকালেই।

আর্টিমিসিয়া আপত্তি তোলে, 'না বাপি, তুমি একেবারে সেই লাঞ্চ-টাইমে এসো। তুমি আমি, আমরা দুজন এখান থেকে সরাসরি রেস্তোরাঁয় যাব। তারপর আবার সরাসরি এখানেই ফিরে আসব।

ওরাজিও একটু অবাক হয়। বলে, 'কেন? বাড়িতে যাবি না একবার?'

—কী দরকার? তুমি তো গোপনেই ব্যাপারটা সারতে চাইছ। তাছাড়া মহামান্য লেকামটেনেন্টির রায়টার কথা তো পাড়ার সবাই জানে।

ওরাজিও একটা 'হ্যাক্‌নি-ক্যারেজ' ভাড়া করেছিল। সেটা এসে থামল ভোজনাগারের সম্মুখে। বাপি নেমে এল। মেয়েকে হাত ধরে নামালো। আর্টিমিসিয়ার পরিধানে একটি হাল্‌কা গোলাপি রঙের রেশমের গাউন। ওর নিজের নয়। সিস্টার গ্রাজেল্লা এটা ওকে পরিয়েছে আজকের বিশেষ দিনে। ঊর্ধ্বাঙ্গে ফ্রিল দেওয়া জ্যাকেট। তার মাথাতেও একটি শৌখিন বনেট। ওরাজিও হোটেল বয়কে কী যেন জিগ্যেস করল। লোকটা তর্জনিসঙ্কেতে দ্বিতলে যাবার সিঁড়িটা দেখিয়ে দিল। দুজনে উঠে এল দ্বিতলের ফাঁকা ছাদে। সেখানে দূরে দূরে জোড়ায়-জোড়ায় সুবেশ তরুণ-তরুণী। অধিকাংশ টেবিলই ফাঁকা। ওদের দেখতে পেয়ে একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দু-এক পা এগিয়ে এসে ওরাজিওর করমর্দন করল। আর্টিমিসিয়া লজ্জায় তার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। না হলে দেখতে পেত সে মাথা থেকে টুপিটা খুলে আর্টিমিসিয়াকে বাও করছে।

রেস্তোরাঁর অবস্থানটা খুবই সুন্দর। আদ্রিয়াটিক সমুদ্রের একেবারে কিনারে। খোলা

ছাদে বিরাট এক একটা ছাতার নীচে এক একটি টেবিল। দু-তিনটি চেয়ার। একতলাতেও ভোজনাগার আছে; কিন্তু ওদের জন্য ফাঁকা ছাদের একটি টেবিল 'বুক' করা হয়েছিল। স্থান নির্বাচনটা কে করল? পাত্র না কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা? সেটা জানা নেই আর্টিমিসিয়ার। যেই হোক, তাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো। ভাগ্যে কী লেখা আছে জানা নেই। যদি বিয়েটা ভেঙেও যায় তবু স্থানমহাত্ম্যে এই মধ্যাহ্ন আহারের স্মৃতিটা সহজে মুছে যাবে না ওর মন থেকে। এতো সুন্দর পরিবেশে ও কখনো মধ্যাহ্ন আহার করেছে বলে মনে পড়ল না।

পশ্চিমে আদিগন্ত 'কোবাল্ট-ব্লু' সমুদ্র। দুরন্ত সামুদ্রিক লোনা হাওয়া। এখন অবশ্য মধ্যাহ্ন রৌদ্রতাপে তা মরকত-মণির মতো এমারেল্ড গ্রীন। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় শঙ্খশুভ্র ফেনা। পাড়ের কাছে দীর্ঘপদ স্যান্ডপাইপারের দল গুগ্‌লি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর আকাশে দু-চারটি সীগাল ক্রমাগত, চক্রাকারে পাক খাচ্ছে। তাদের শীৎকারে ভেসে আসছে একটি করুণ মূর্ছনা। কেন? ওদের একটানা শব্দটা এমন করুণ কেন?

ওরাজিও ভদ্রলোককে— নিঃসন্দেহে সে পেত্রো আন্তোনিয়—বললে, 'তোমরা মধ্যাহ্ন-আহারটা সেরে নাও। আমি ঘণ্টা-দেড়েক পরে আসব।'

আর্টিমিসিয়া বলে, তুমি খাবে না একসঙ্গে?

—না রে। তোরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় সেরে নে। ফর্মাল 'ইনট্রোডাকশন' নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন।

পেত্রো হাসল। জবাব দিল না।

ওয়াজিও নীচে নেমে গেলে পেত্রো বলে, বল আর্টিমিসিয়া। তোমার কোনো ডাকনাম আছে?

আর্টিমিসিয়া নতনেত্রেই বলে, না।

মাদার সুপিরিয়ার ওকে আদর করে ডাকেন : 'আর্তি'। সে কথাটা বলার সময় এখনো আসেনি।

—তুমি তো এখন 'সান্তা ত্রিনিতা দেই মুন্তি কনভেন্ট' থেকে আসছ। তাই না?

—আপনি চেনেন? আর্টিমিসিয়া এখনো নতনেত্র।

—না। আমি তো রোম-এর বাসিন্দা নই। আমি থাকি ফ্লোরেন্সে। রোম শহরের বিশেষ কিছুই চিনি না। দু-একবার এখানে এসেছি। ভ্যাটিকান দেখেছি। সিস্‌টিন চ্যাপল দেখেছি। কলোসাস আর ট্রেভির ফাউন্টেন দেখেছি। তার বেশি কিছু দেখা হয়নি।

এই সময় একজন হোটেল-বয় নোটবই হাতে এসে দাঁড়ালো। পেত্রো জানতে চাইল, কী খাবে বল?

—আপনিই অর্ডার দিন।

—তা তো দেবই। কিন্তু তুমি কী খাবে না জানলে....

—আমি নেব পাস্তা আর ফিশকারি, আর ও হ্যাঁ, একটা স্যালাড।

—ব্যস? চিকেনের কোনো ডিশ নেবে না? আইসক্রীম?

—না, না। আর কিছু নয়।

পেত্রো অর্ডার দিল। নিজের জন্য বলল, আপাতত একটা আবসান্থ-এর বোতল আর পর্ক-কাবাব। আইস-কিউব।

—আর কিছু নেবেন না? —জানতে চায় মেয়েটি।

— নেব। এটা তো অ্যাপিটাইজার।

বেহারাটা যখন নির্দেশমতো তার নোটবইতে লিখে নিচ্ছে তখন আর্টিমিসিয়া চুপি চুপি চোখ তুলে তাকায়। ওকে দেখে।

হ্যাঁ, বাপি ঠিকই বলেছিল। ওর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গালে বসন্তের দাগ। সূচালো গোঁফ এবং মুখে 'ফ্রেঞ্চকাট' দাড়ি। চুলগুলি অবিন্যস্ত, তবে এখনো সাদা হতে শুরু করেনি। শুধু জুলপির কাছে কিছুটা সূক্ষ্ম চাইনিজ হোয়াইটের আঁচড়। পেটানো একহারা চেহারা। কিন্তু পোশাক -পরিচ্ছদ নিতান্ত সাধারণ। সেটা যেন এই ভোজনাগারের সঙ্গে নিতান্ত বেমানান। কেন? এমন একটা দিনে সে পাটভাঙা পোশাক পরে এল না কেন? ও আর্টিস্ট! তাই নিজের সাজসজ্জা সম্বন্ধে উদাসীন?

বেহারা চলে যাবার পর পেট্রো এদিকে ফিরল। দুজনে চোখাচোখি হল। দুজনেই হাসল। পেত্রো প্রশ্ন করে, বল আর্টিমিসিয়া, আমার সম্বন্ধে তোমার কী কী জানবার আছে?

আর্টিমিসিয়া এতক্ষণে তার জড়তাকে কাটিয়ে উঠেছে। এখানে লজ্জা করলে চলবে না। এটা তার জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ। এখনি তাকে নিতে হবে এমন একটি সিদ্ধান্ত যাতে তার জীবন সার্থক অথবা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তাই স্পষ্ট করে জানতে চায়, 'আপনি কি আমার সম্বন্ধে সব কথা শুনেছেন?'

পেত্রো দরাজ হাসল। বললে, এটা কি একটা প্রশ্ন হল? একটি সুন্দরী রোমান অষ্টাদশীর 'সবকথা' কি ফ্লোরেন্সে বসে আমার পক্ষে জানা সম্ভব? আমি কি গণৎকার?

আর্টিমিসিয়া আরও দৃঢ় হল মনে মনে। বললে, 'সবকথা' মানে রোমের আদালত আমার সম্বন্ধে কী রায় দিয়েছে?

—হ্যাঁ, জানি। তোমার বাবার বন্ধু অগস্তিনো তাসির সেই মামলার ব্যাপারটা তো? সেটা তোমার বাবা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

—তা সত্ত্বেও আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলেন কেন?

— কেন হব না? প্রথম কথা, ও ব্যাপারে আমি তোমার কোনো দোষ খুঁজে পাইনি। তোমার কাকু ছিল একটি লম্পট শয়তান! তোমার বয়স কম, তাই সেটা বুঝতে পারনি। এটাতে তোমার অপরাধ কোথায়?

—আপনি 'প্রথমত' বল্লেন। আর কোনো কারণ ছিল কি?

—হ্যাঁ। দ্বিতীয়ত আমার এ খন খুব আর্থিক টানাটানি যাচ্ছে। 'ডাওরিটা' নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

—প্রয়োজনটা কি এতই প্রচণ্ড যে, পাত্রী কানা-খোঁড়া কুৎসিত হলেও আপনার আপত্তি ছিল না?

পেত্রো হো-হো করে হেসে ওঠে।

—এর মধ্যে হাসির কী আছে?

—শোন, বুঝিয়ে বলি: ম্যাচমেকার তোমার রূপবর্ণনা এমন বিস্তারিতভাবে করেছিল যে, আমি তোমাকে না দেখেই তোমার একটা পোট্রেট এঁকে ফেল্‌তে পারতাম! তবে সেটা দেখে কেউ ভুল করে ভাবত বুঝি 'হেলেন অব্ ট্রয়'।

আর্টিমিসিয়া মুখ লুকিয়ে হাসে। ছেলেটি অন্তত আলাপচারিতে দড়। জানতে চায়, বাপির কাছে শুনেছি, আপনি ছবি আঁকেন। কী জাতের ছবি? ওয়াটার কালার? না অয়েল পেন্টিং?

—ওয়াটার কালার আমি আঁকি না। সবই অয়েল মিডায়ামে।

—কী জাতীয় বিষয়বস্তু?

—সব রকমই — স্টিল-লাইক, ল্যান্ডস্কেপ, পোর্ট্রেট্, বিব্‌লিকাল বিষয়বস্তু।

—আপনি পারস্পেকটিভের আঙ্কিক নিয়মটা জানেন?

—গ্রেশাস মী! তুমি জান? 'পারস্পেকটিভ' কাকে বলে বল তো?

—না, মানে ত্রিমাত্রিক বিষয়বস্তুকে দ্বিমাত্রিক ক্যানভাসে আঁকার পদ্ধতি।

পেত্রো তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারল না। ওর ব্যাখ্যাটা হজম করতে তার কিছুটা সময় লাগলো। তারপর বললে, 'চিত্র শিল্প সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানলে কী করে?'

—আমাদের কনভেন্টে একজন বৃদ্ধ চিত্রকর আছেন—ফাদার সিবেস্টিয়ান। তাঁর কাছে। তিনি তেলরঙে আঁকেন। ওয়াটার কালারও, টেম্পারা এবং ওয়াশ!

—তুমিও কি ছবি আঁক নাকি?

—চেষ্টা করি কিছুটা। লুকিয়ে লুকিয়ে। কনভেন্টে মেয়েদের ছবি আঁকা বারণ।

পেট্রো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, এ-কথা তো তোমার বাবা আমাকে বলেননি। কী জাতীয় ছবি এঁকেছ তুমি? ওয়াটার কালার না প্যাস্টেল?

—আমি সামান্যই এঁকেছি। সবই অয়েল-মিডিয়ামে। সবই চেষ্টা করেছি। ওই আপনি যা বললেন, স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ, বিব্‌লিক্যাল থীম।

এই সময়েই বেহারা খাবারের ট্রে নিয়ে উপস্থিত হল। প্লেটগুলি সাজিয়ে দিল টেবিলে। পেত্রো বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। গেলাসে আবসাছ্ ঢেলে একটা চুমুক দেয়। বলে, ছবি আঁকার প্রসঙ্গ থাক। আর কী জানতে চাও, বল?

আর্টিমিসিয়া বলল, আপনি তখন বললেন যে, আপনার আর্থিক টানাটানি যাচ্ছে। তাহলে এমন একটা রেস্তোরাঁ বেছে নিলেন কেন? এখানে খাবারের দাম নিশ্চয় খুব বেশি।

পেত্রো গম্ভীর হয়ে গেল। একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'ভেনু'টা নির্বাচন করেছেন তোমার বাবা। 'মেনুটা' তুমি-আমি। কিন্তু বিলটা তোমার বাবা মেটাতে প্রতিশ্রুত। তাই আমি মধ্যাহ্ন ভোজের আইটেম এত সংক্ষিপ্ত করেছি।

মর্মাহত হল আর্টিমিসিয়া। এমন কোর্টশিপের দ্বৈত-আহারে সচরাচর বয়ফ্রেন্ডই বিল

মেটায়। বুঝতে পারেনি, তার বাপি এ বিষয়ে এতই উদ্‌গ্রীব যে, ওদের আহারের বিলটাও তিনি মিটিয়ে দিতে স্বীকৃত। কেন? আর্টিমিসিয়ার একটা গতি না হলে সে অ্যালেনকে বিবাহ করতে পারছে না? ধীরে ধীরে যে রোমান্টিক মুডটা গড়ে উঠছিল তা যেন একটানে শতছিন্ন হয়ে গেল। এতক্ষণে আবার কানে ভেসে এল সীগালগুলোর আর্ত শীৎকার — ক্যাঁও, ক্যাঁও, ক্যাঁও —কেন? কেন? কেন?

ঘণ্টা-দেড়েক পরে ওরাজিও ফিরে এল। বললে, এদের রান্না বেশ ভালোই। তোমাদের লাঞ্চটা পছন্দ হয়েছে তো?

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল জুত করে।

পেট্রো বললে, হ্যাঁ, খাবার সুস্বাদু। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন? আপনি কি মাঝে মাঝে এখানে আসেন?

—আরে না, না। এ তো আমার কাছে স্বপ্ন রাজ্য। তবে আমিও তো ওদের নীচের হল কামরায় আজ লাঞ্চটা সারলাম।

আর্টিমিসিয়া বলে, সে কি! তাহলে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে আহারে বসলে না কেন?

ওরাজিও হেসে বললে, বড় হলে বুঝবি। এখনো তো মেয়ের বাবা হস্‌নি।

পেট্রো অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে, এটা আপনার কেমনতর কথা হল সিনর ওরাজিও? বয়স হলে ও মেয়ের 'মা' হতে পারে, কিন্তু 'বাবা' হবে কোন্ সুবাদে?

অট্টহাস্যটা সংক্রামিত হল ওরাজিওর তরফে। আর্টিমিসিয়া মুখ লুকিয়ে হাসল। ওরাজিও বলে, সে যা হোক, তোমরা কি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলে?

আর্টিমিসিয়া জবাব দিতে পারল না। পেত্রো আগ্‌বাড়িয়ে বললে, 'আজ্ঞে, আধাআধি এসেছি। মানে এক তরফা। আমি তো রাজিই, তবে ও তরফের জবাবটা জানি না। প্রস্তাবটা গৃহীত হয়নি, তবে প্রত্যাখ্যাতও হয়নি।

ওরাজিও দুদিকে মাথা নাড়ে। বোঝা যায় যে, সে কিছুটা হতাশ হয়েছে।' বেচারি খরচ তো কিছু কম করেনি। হয়তো তার আশা ছিল দেড়-ঘণ্টার সময়ই যথেষ্ট। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।

সমাধান করে দিল আর্টিমিসিয়া। পেট্রোকে সরাসরি বললে, আপনি সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়িতে আসবেন। বাপি আপনাকে জানিয়ে দেবেন তাঁর সিদ্ধান্ত —

পেট্রো তৎক্ষণাৎ বলে, তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত তো তিনি জানিয়েই দিয়েছেন।

আর্টিমিসিয়া এ কথার জবাব দিল না।

পেট্রো একটু অপেক্ষা করে বললে, ঠিক আছে। তাই আসব। সে সময় তুমি বাড়িতে থাকবে তো?

—না। আমি এখান থেকে সরাসরি আমাদের কনভেন্টে ফিরে যাব। তাতে অসুবিধা নেই। আপনি যা জানতে চাইছেন তা জানতে পারবেন।

—অলরাইট। ধন্যবাদ। আমাকে একটি স্মরণীয় মধ্যাহ্ন বিশ্রম্ভালাপ উপহার দেওয়ার জন্য।

আর্টিমিসিয়া উঠে দাঁড়ায়। জবাব দেয় না। গাউনের দু'প্রান্ত দু'হাতে ধরে 'কার্টসি-বাও' করে।

ওরা নেমে এল দ্বিতল থেকে। ইতিমধ্যে ওরাজিও রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে দিয়েছে। ভোজনালয়ের সামনেই এক-ঘোড়ার একটি হ্যাক্‌নি-ক্যারেজ দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়ের হাত ধরে ওরাজিও তাতে উঠে পড়ে। গাড়িটা রওনা হল। পেত্রো তখনো দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে। অ্যার্টিমিসিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মাথার টুপিটা খুলে 'বাও' করে।

— ছেলেটিকে তোর কেমন লাগল? জানতে চায় চলন্ত গাড়িতে বসা ওরাজিও।

সে-কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে আর্টিমিসিয়া জানতে চায়। বাপি, 'মাদ্‌মোয়াজেল' কাকে বলে?

—আমরা যাকে 'সিনোরিনা' বলি। অর্থাৎ অনূঢ়া প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের সম্বোধন। ওটা ফরাসি কায়দায়। পেত্রোরা ফ্লোরেন্সে থাকে তো? ওখান ওর অনেক ফরাসি ক্রেতা আছে বোধহয়। কিন্তু সে-কথা থাক। যা জিজ্ঞেস করছিলাম তার জবাবটা দে। কেমন লাগল পেত্রো আন্তোনিওকে?

এবারও সেকথার জবাব না দিয়ে ও একেবারে রঙের টেক্কাটাই নামিয়ে দিল, তুমি ওকে জানিয়ে দিতে পার : আমি রাজি।

—রাজি? মানে, ওকে তোর পছন্দ হয়েছে?

— সেসব প্রসঙ্গ তো এখন অবান্তর, বাপি। আমি তো এককথাতে জানিয়ে দিয়েছি। তুমি আগামীকাল আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পার।

ওরাজিও গুম মেরে গেল। এটাই যে মনে মনে চাইছিল। কিন্তু বোধহয় ঠিক এ ভাষায় নয়। যেন তার আদরের মেয়েটি নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এ প্রস্তাবে তার সম্মতি জানাচ্ছে। ম্যারেজ অব্ লাভ নয়, ম্যারেজ অব কন্‌ভিনিয়েন্স।

রোম শহরের পাথর বিছানা পথে ঘড়ঘড় করে পাল্কিগাড়িটা এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্য মুখে। ঘোড়াটা জানে না — নাকি ওটা ঘোটকী? — কোথায় তার অন্তিম যাত্রা শেষ হবে। তার দু'চোখের দুপাশে ঠুলি বসানো। চালকের কশাঘাতে সে চলেছে সমুখ পানে। কখনো ডানে বেঁকছে, কখনো বাঁয়ে। স্বেচ্ছায় নয়। চালকের চাবুকের অমোঘ নির্দেশে।

ওরাজিও জানতে চায়, কেন? পেত্রোকে তোর পছন্দ হল না কেন?

—ওমা! সে-কথা কখন বললাম? আমি তো বলেছি ওকে জানিয়ে দিও, আমি রাজি। কালই সে ব্যবস্থা করতে পার বললাম তো!

আবার কিছুটা দম ধরে ওরাজিও বলে, তা ব্রাইডের তরফে কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে চাস?

— কাউকেই না।

—অন্তত একজন 'ব্রাইডস্-মেইড' তো লাগবে বিয়ের সময়?

— সে অ্যালেনই হতে পারবে। তাকে নিশ্চয় চার্চে নিয়ে আসবে তুমি!

—অ্যালেন! বলিস কী! সে তো তোর মায়ের বয়সী!

—'বয়সী' কেন? সে তো দু'দিন পরেই আমার 'মা' হয়ে যাবে!

ওরাজিও একেবারে নিভে যায়!

আর্টিমিসিয়া বলে, আমাকে ভুল বুঝো না, বাপি। আমি এ-কথা রাগ করে বলিনি। পাড়ায় আমার কোনো বান্ধবী নেই। কনভেন্ট থেকে কোনো সিস্টার আসতে পারবেন না। অনুমতিই পাবেন না। এঁরা খুবই 'কনজারভেটিভ'। তাছাড়া, এটা আমার নিয়তি। ভুলটা তোমার। তার আগের ভুলটা অবশ্য আমারই। যারই হোক—আদালত থেকে আমার কপালে যে কলঙ্কচিহ্ন এঁকে দিয়েছে তাতে ছয়মাসের মধ্যে আমাকে রোম ছেড়ে চলে যেতে হবে। ফ্লোরেন্স তো সে হিসাবে স্বর্গ। সেখানেই ছিল মেৎর মিকেলাঞ্জেলোর বাড়ি। লেঅনার্দোর আদি নিবাস! তুমি তো জান বাপি—আমার জীবনের একটাই স্বপ্ন : ফ্লোরেন্স আকাদেমিয়ার দেওয়ালে ওই সব দিকপাল শিল্পীদের সঙ্গে আমার একখানা ছবিও টাঙানো থাকবে সেখানে।

ওরাজিও মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। বলল, নিশ্চয় তা হবে রে। তোর বাপি পারেনি, পারবে না। কিন্তু ওটা তারও স্বপ্ন!

—আমি জানি। তাছাড়া আরও একটা কথা বলব, আমাকে বাধা দিও না। এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার দেখ্ভালের জন্য একজন মহিলার প্রয়োজন। অ্যালেনকে তুমি স্বীকার করে নাও!

ওরাজিও এবারও জবাব দিল না।

—আরও একটা কথা: অগস্তিনো তাসির সঙ্গে যদি তোমার ভবিষ্যতে দেখা হয় — হবেই — তবে তাকে নিয়ে আবার 'যুগলবন্দি' বাঁধতে পার। আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তোমার জীবিকার প্রয়োজনে অগস্তিনো তাসি অপরিহার্য।

ওরাজিও একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, তার মানে তুই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিস্?

—তুমি বড় অবান্তর প্রশ্ন কর, বাপি। আমি তাকে ক্ষমা করার কে? সে যদি কোনো অপরাধ করে থাকে, পাপ করে থাকে, তবে সে তার শাস্তি পাবেই।

—শাস্তি সে তো পেয়েই গেছে। ছয়মাস ধরে বিনা মজুরিতে তাকে ম্যূরাল আঁকতে হচ্ছে। এক রকম সশ্রম কারাদণ্ডই!

—আমি আদালতের শাস্তির কথা বলছি না। বলছি, সে যদি ঈশ্বরের কাছে অপরাধ করে থাকে তবে ঈশ্বরই তাকে শাস্তি দেবেন! কিন্তু ছবি আঁকা ব্যাপারটা এতদিনে আমি কিছুটা বুঝেছি। তোমরা দুজনে দুজনের পরিপূরক। আমি যে ভুল করেছি, তার শাস্তি আমি পাব, মাথা পেতে মেনে নেব। তাই বলে,তুমি কেন তোমার পথে চলতে পারবে না?

ওরাজিওর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

তার মানে হল: তার সেই ছোট্ট মেয়েটাকে সে আজ নতুন করে যেন চিনতে পারছে! এই ক্ষমাশীলা মেয়েটি তার অচেনা!

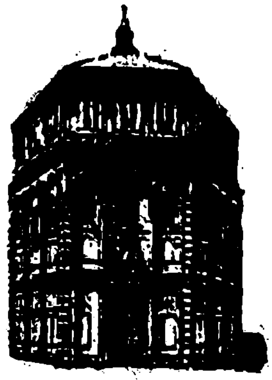

বাপিকে যে কথা বলেনি তা অকপটে স্বীকার করল মাদারের কাছে। আর্টিমিসিয়া রোম থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল। রোম ক্ষমতাদর্পী, রোম নিষ্ঠুর, সে পুরুষের দুর্গ! আর্তি আঁকবে, ছবি আঁকবে। একের পর একটা ক্যানভাস নামাবে। পুরুষ জাতির অন্যায়ের প্রতিবাদ সে জানিয়ে যাবে: রঙে আর রেখায়। আজ তা কেউ স্বীকার করবে না। সমকাল স্ত্রীলোককে চিত্রাঙ্কনের অধিকার দিতে নারাজ। কিন্তু না শুনেও আর্টিমিসিয়া বিশ্বাস করেছিল সেই আশ্বাসে : কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী.....

কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিপুলা। একদিন না একদিন শিল্পানুরাগীরা মেনে নিতে বাধ্য হবেন : আর্টিমিসিয়ার সাধনাকে।

শহরতলীর একান্তে একটি প্যারিশ-চার্চে পাদরি দু হাত মিলিয়ে দিলেন

মাদার সুপিরিয়ার আসেননি। সিস্টার গ্রাজেল্লা নয়। এসব উৎসবে ওঁদের যোগদান মানা। তবে অ্যালেন এসেছিল। আর্টিমিসিয়ার পরিধানে একটি সুন্দর রেশমী ওয়েডিং-গাউন। এটা তার মায়ের। একটা সুটকেসে কিছু মাতৃস্মৃতি গুছিয়ে ওরাজিওর হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল অ্যালেন। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন এগুলি সযত্নে রাখা ছিল ওরাজিওর হেপাজতে। আর্টিমিসিয়ার মা এগুলি নাকি শেষ সময়ে তার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, এগুলো ঐ পুচকেটার জন্য।

মায়ের ফুলকাটা ওয়েডিং-গাউন, একছড়া মুক্তোর মালা, একজোড়া বালা, আর জোরা কানের দুল। চরম অভাবের মধ্যেও ওরাজিও তা থেকে কোনো কিছু বার করেনি বিক্রি করতে বা বন্ধক রাখতে। মেয়েকেও কোনোদিন বলেনি।

বরবধূ রওনা হল রোম থেকে ফ্লোরেন্সে।

একদিনে এতটা পথ অতিক্রম করতে পারে না ঘোড়ার গাড়ি। তাই মাঝপথে দু একরাত বিশ্রাম নিতে হয়। কখনো ঘোড়া বদলও হয়। ওরা সারাদিন গাড়িতে ঝাঁকানি খেতে খেতে সন্ধ্যায় এসে পৌঁছালো এক আম্‌ব্রিয়ান গণ্ডগ্রামে। তখন দিনান্তের সূর্য পাহাড়ের কোলে রাতের জন্য বিশ্রাম নিতে গেছে। পশ্চিমাকাশে সোনা-গলানো রোদ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। দু'পাশে ভুট্টো জনার বজরা আর অলিভ ক্ষেত। মজুর আর মজুর রমণীরা ক্ষেতে কাজ করছে। ক্রমে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। একটি-দুটি করে কৌতূহলী তারাসুন্দরীর দল উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে বোধহয় নববধূকে দেখতে। ঝোপে ঝাড়ে জ্বলছে গুচ্ছ গুচ্ছ জোনাকি। ঘোড়ার গাড়িটা এসে থামল একটি পান্থশালার সম্মুখে। ইতালিতে তখন বড় বড় সড়কের ধারে ধারে এমন পান্থশালার আয়োজন। আশ্রয় নেয় যাত্রীর দল। নুড়িয়া টালির দ্বিতল

বাড়ি। একতলায় বড় একটা খানা-কামরা। দ্বিতলে পান্থশালার মালিকের দুখানি মাত্র শয়নকক্ষ। হল-কামরায় ওক-কাঠের টেবিল আর বেঞ্চি, টেবিলের উপর কোনো টেবিল চাদরের ঝামেলা নেই। পান্থশালায় যারা আশ্রয় নেয় তারা ওই কাঠের টেবিলে পাশাপাশি বসে যায়। রান্নার আয়োজন পিছন দিকে, সংলগ্ন পাকঘরে। খাবার পরিবেশন করে মালকিন, তার মেয়ে আর প্রতিবেশী দু একটি পল্লীরমণী। যাত্রীরা ইচ্ছামতো আহার্যের অর্ডার দেয়। মালকিন যা রান্না করেছে তাই খুশি মতো আহার করতে হবে। যে পদটি যতবার চাও, পাবে। আহার 'পেটচুক্তির' নয়। 'লিরা-চুক্তি'। ওই যাকে তোমরা বল 'পাইস্-সিস্টেম'। পাইস তো চলে না, চলে লিরা। তাই ওকে বলে 'লিরা-চুক্তি'খানা। প্রতিটি আসনে একটা করে নম্বর সাঁটা। খাদকের অর্ডার মতো পরিবেশিকা পাতায় আহার্যটা দেবার সময় হাঁকাড় পাড়ে। দূরবর্তী এল্‌ম-কাঠের টেবিলে বসে মালিক অথবা মালকিন স্লেটে চক্‌পাথর দিয়ে লিখে যায় কে-কী কতটা খাচ্ছে।

খাদ্য বলতে ঘরে করা ব্রাউন রুটি, ভেড়ার মাংসের স্টু, পেঁয়াজ-বীনের একটা ঝোল আর জুকিনি-আলু-ট্যাড়সের একটা হ্যাংচাপ্যাচাং তরকারি। এ-ছাড়া একরকমের তাড়িও পরিবেশন করা হচ্ছে টিনের পাত্রে। গৌরবে তাকে বলা হয় 'ওয়াইন'! পরিবেশিকা হাঁকাড় পাড়ে — 'সাতাশ নম্বরে আর একপিস্ রুটি, একত্রিশে আর এক পেগ্ 'ওয়াইন', পাঁচ-নম্বরে আর এক হাতা 'স্টু'

চিত্রগুপ্তের খাতায় তৎক্ষণাৎ টিক্ পড়ছে নম্বর-মোতাবেক। এ নরক ত্যাগ করে যাবার আগে হিসাব মতো চিত্রগুপ্তকে লিরার হিসাব মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

কামরার বাইরে একটা চৌবাচ্চায় ভরা আছে হাতমুখ ধোবার জল। কেউ তা বড় একটা ব্যবহার করছে না। শীতটা জাঁকিয়ে পড়েছে। তবে আর্টিমিসিয়া কনভেন্ট-লালিতা। হোক ঠাণ্ডা, সে ওই আধময়লা জলেই কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিল, মুখে-চোখে দিল জলের ঝাপ্‌টা। দিয়েই মনে হল হাড়ের মধ্যে একটা হি হি-কাঁপন। ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। পেত্রো মালিকের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলে এল। একরাত্রের জন্য আশ্রয় চাইল।

আর্টিমিসিয়ার সারা গা-গতরে ব্যথা। দিনভর গাড়ির ঝাঁকানিতে। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। ওরা দুজনে বসে পড়ে টেবিলে। নম্বর একুশ-বাইশ। পরিবেশনকারিণী রুটি, সুপ আর ওয়াইন দিয়ে মুখপাত করল। নুন-লেবু-লঙ্কা দেওয়াই আছে।

যারা আহারে বসেছে, তারা প্রায় সবাই ক্ষেত মজুর-মজুরনি। কেউ কেউ বসেছে সপরিবারে। তারা স্থানীয় লোক, কিন্তু বাড়িতে রান্নাবান্নার হাঙ্গামা রাখে না। সরাইখানাতেই দিনান্তের আহারটা সেরে যায়। বাকি সারাটা দিনই ওদের নানা রকম দৈহিক পরিশ্রম করতে হয়। রান্না করার সময় কোথায়?

হঠাৎ প্রবেশ দ্বারে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ। সস্ত্রীক। বৃদ্ধের মুখে সাদা দাড়ি। মাথায় পালক-গোঁজা বাহারে টুপি। গায়ে গরম কোট ও ভেস্ট। সম্ভ্রান্ত চেহারা। তাঁর গিন্নিরও ধোপদুরস্ত বাহারে পোশাক-আশাক। যারা আহার করছিল তাদের মধ্যে অনেকেই উঠে দাঁড়ালো। পান্থশালার মালকিন ছুটে এল তাঁর কাছে: সিনর! আপনি নিজে.... ?

—কেন? আমার কি আসা মানা?

— না, না, কী যে বলেন। এ তো আমাদের সৌভাগ্য।

— শোন হে! আমরা দুজনও আজ এখানে খাব। এখনি বসব আহারে।

— সে কী, সিনর। আমাদের খাবার?

— কেন? আমি কী আম্‌বিয়ান নই? এইসব খেয়েই মানুষ হইনি?

পেত্রো তার পার্শ্ববর্তীকে জনান্তিকে প্রশ্ন করে জেনেছে, ইনি স্থানীয় ভূম্যধিকারী। ছোট-খাটো জমিদার এই এলাকার। তিনি পেত্রোকেই বললেন, 'একটু সরে বস, ভায়া। এই বুড়ো-বুড়িকে বসতে দাও।'

পেত্রো সসম্ভ্রমে সরে বসল। বৃদ্ধ লাঠিগাছটা দরজার পাশে ঠেকিয়ে রেখে বসে পড়ে হাতের গ্লাভস্ জোড়া খুলতে থাকেন। গাঁয়ের মানুষ কাঁটাচামচ দিয়ে খায় না। উনি হয়তো কাঁটা চামচে খান। আজ ব্যতিক্রম হল। মালিককে বললেন, শোন হে হ্যারল্ড! তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমার খাবারের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ পেয়ে স্বয়ং তদন্ত করতে আসিনি। তবু মাঝে মধ্যে একটু তত্ত্বতালাশ নিয়ে দেখতে হয়। কই হে সুন্দরীরা, আমাদের দু-খানা পাতা দাও, না না, প্লেট নয়, সবাই যে-পাতায় খাচ্ছে।

শেষ সম্বোধনটা পরিশেনকারিণীদের প্রতি।

পরিবেশন করছিল যে মেয়েটি সে আদেশ মতো পাতের কোণে নামিয়ে দিল এক চামচে সৈন্ধব লবণ, কাগজি লেবু আর ব্রাউন-রুটি। দুজনের পাতে। রেখে গেল দুটি টিনের মগ। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়া এসে বড় জগ থেকে তাতে ঢেলে দিল ঘরে-করা চোলাই মদ। তারা পিছন ফিরতেই জমিদার মশাই বললেন : দাঁড়াও।

ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কই তুমি তো হাঁকাড় পাড়লে না—বাইশ তেইশে কী কী দিলে?

মেয়ে দুটি বিহ্বল হয়ে পান্থশালার মালিকের দিকে তাকায়। সে নিজেই ওদের হয়ে কৈফিয়ত দাখিল করে 'তাই কি পারে ওরা? আপনি নিজে থেকে আমার অতিথি হয়েছেন......

—তাহলে তো আমি তোমার খানা-কামরায় সামিল হতে পারব না। আমি আজ যাদের সঙ্গে পংক্তি ভোজনে বসেছি, তাদের প্রতি তোমরা কী ব্যবহার কর তাই যাচাই করতেই তো এসেছি। তুমি যেদিন নিমন্ত্রণ করবে সেদিন কব্জি ডুবিয়ে খাব। আজ নয়।

—তাই হবে হুজুর!

বৃদ্ধ আহারের পূর্বে কী যেন বিড়বিড়-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বোধহয় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানালেন দিনান্তের আহারের জন্য। তাঁর গৃহিণীও একই সঙ্গে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আহারে মন দিলেন। আহার এবং পরিবেশন চলতেই থাকে। বৃদ্ধ এক চুমুকে মদটুকু গলাধঃকরণ করে মেয়েটিকে বললেন: আমাকে আরও দু-হাতা ওয়াইন।

তারপর পেত্রোর দিকে ফিরে বললেন, তোমাকে তো চিনতে পারলাম না ভায়া? মনে হচ্ছে তুমি দলছুট ভিনদেশী চিড়িয়া?

—আমি স্যার ভিনদেশীই। রোম থেকে ফ্লোরেন্স যাচ্ছি। একরাতের জন্য উঠেছি এই সরাইখানায়।

স্নানরতা সুসান্না ও মোড়ল, জ্যাকোপ্পো তিন্তোরেত্তো (1518-94)

সেন্ট জনের জন্ম, আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি

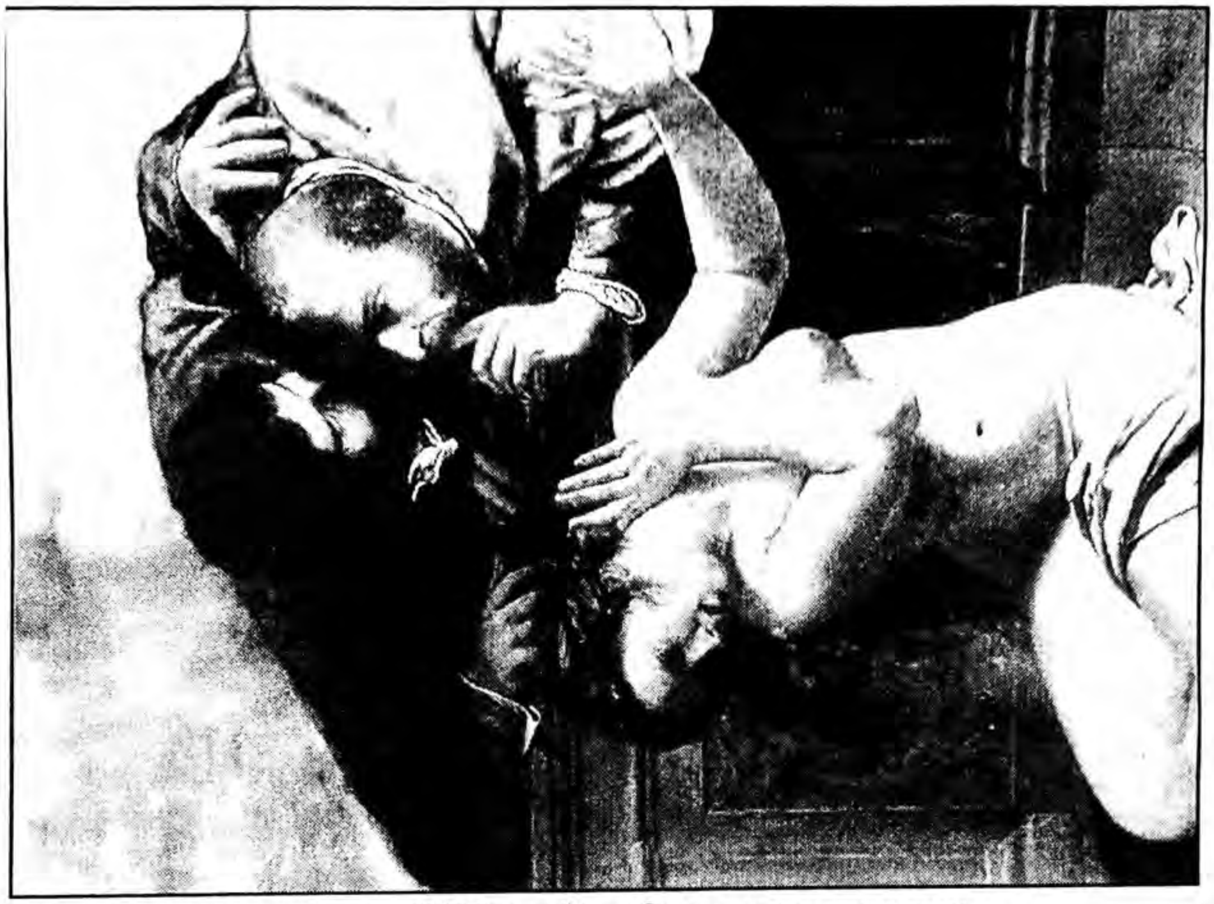

স্নানরতা সুসান্না ও মোড়লদ্বয়, আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি [তেলরঙ/ক্যানভাস/1612]

মরালগ্রীব মাদোনা, পারমাঞ্জালো

[তেলরঙ/কাঠের প্যানেল/1536/216 সেমি x 132 সেমি/উফিজি, ফ্লোরেন্স]

জুডিথ কর্তৃক হলোফার্নেস বধ, আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি
[তেলরঙ/ক্যানভাস/ 1620/199 x সেমি x163 সেমি/উফিজি, ফ্লোরেন্স]

জুডিথ ও হলোফার্নেসের কর্তিত মুন্ড, ক্রীনাচ দ্য এল্ডার

আত্মপ্রতিকৃতি, আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি [তেলরঙ/ক্যানভাস/1638]

ম্যাগদালেনের অনুশোচনা, আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি [তেলরঙ/ক্যানভাস/1630-32]

—তাই বল। একাই যাচ্ছো?

—আজ্ঞে না। সস্ত্রীক। —ইঙ্গিতে পার্শ্ববর্তিনীকে দেখিয়ে দিল।

আর্টিমিসিয়া উঠে দাঁড়িয়ে 'বাও' করল।

—তোমার নামটি কী, বাবা? কী করা হয়?

—আজ্ঞে, পেত্রো আন্তোনিও আমি চিত্রশিল্পী। আমার স্ত্রীর নাম আর্টিমিসিয়া অন্তোনিয়।

—বাঃ বেশ। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। আজকালকার ছেলেমেয়েরা — মানে তোমরা, বেশ দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াও। আমরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। আমার তো মনে পড়ে না বিয়ে করার পর এই বত্রিশ বছরে কোথাও সস্ত্রীক বেড়াতে গেছি। কি গো? তোমার মনে পড়ে?

জমিদার গিন্নি চর্বণান্তে মাংসটা গলাধঃকরণ করে বললেন, তোমার মনে না পড়াই স্বাভাবিক। কারণ তুমি দারুণ ভুলোমানুষ! তোমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।

—তার মানে? গেছিলাম? কোথায়? কবে?

—ভেনিস। আমাদের 'আগুরি'-র সময়।

—আহ্! আগুরি! সে তো অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। বত্রিশ বছর হয়ে গেল।

—না, তেত্রিশ। —সংশোধন করে দিলেন মহিলা।

পেত্রো বলে, আপনাকে কি উনি সব সময় এভাবে সংশোধন করে দেন?

—হ্যাঁ, বত্রিশ বছর ধরে — আই মীন, তেত্রিশ। কেন? তোমার ভুল ওই সুন্দরী ঘরওয়ালীটি কি সংশোধন করে দেন না?

—আজ্ঞে না। ও সে সুযোগ এখনো পায়নি। আমরা তো আর বত্রিশ — মানে ইয়ে .... তেত্রিশ বছর ধরে একসঙ্গে ঘর করিনি।

—বটে? কতদিন ঘর করেছ শুনি? ... না, না, তুমি হিসেবে ভুল করবে। আমি তোমার ঘরওয়ালির কাছেই জানতে চাইছি। কি গো বৌমা, কদ্দিন 'বে' হয়েছে তোমাদের?

আর্টিমিসিয়া মুখ নিচু কার বললে, সাত-আট ...

—সাত - আট বছর! বল কি হে! আটবছর আগে তো তুমি নিতান্ত খুকিটি ছিলে? বয়স কত এখন তোমার?

বৃদ্ধা আবার ধমক দেন, আহ্! এ কী অসভ্যতা! সদ্যোপরিচিতা ভদ্রমহিলাকে কি বয়স জিজ্ঞেস করতে আছে?

—ভদ্রমহিলা! কী বলহ গো? ও তো ছোট খুকির বয়সী। কী গো ভদ্রমহিলা, তাই নয়? — বৃদ্ধ আবার জানতে চাইলেন আর্টিমিসিয়ার কাছে। কিন্তু তাকে জবাব দিতে হল না। বৃদ্ধাই আবার ধমকে ওঠেন, তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। ও কি ছোটখুকিকে দেখেছে? জানে, সে কত বড়?

পেত্রো বলে, 'আমি একটা কথা বলব সিনর? আপনাদের দুজনেরই ভুল হচ্ছে।'

এবার বৃদ্ধাই রুখে ওঠেন, 'ভুল। কী ভুল? আর্টিমিসিয়া জানে - ছোটখুকির কত বয়স?'

ঘরসুদ্ধ সকলেই উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। শুনছে ওঁদের তর্কাতর্কি।

পেত্রো বললে, 'আমার স্ত্রী বলেননি যে আমাদের সাত-আট বছর হল বিয়ে হয়েছে!

—বলেনি? ঘর সুদ্ধ সবাই শুনেছে!... কী গো? তোমরা শোননি? ও বলেনি সাত-আট বছর?

কেউ জবাব দেয় না। পেত্রোই আবার বলে, আজ্ঞে না সিনোরা। ও 'সাত-আট' বলতে বলতেই সিনর ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে ধরে নিয়েছেন যে 'সাত-আট বছর'। ও বলতে চেয়েছিল - 'সাত-আট ঘণ্টা'।

—ঘণ্টা! মানে? বৃদ্ধ জানতে চান।

—ঘণ্টা-মানে স্যার, সারাদিনের চব্বিশ ভাগের একভাগ।

বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। বোধকরি তিনি হিসেবটা বুঝতে পারেন না। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিমতী স্ত্রী সমাধান করে ফেলেছেন। বলেন, বল কী হে? তার মানে আজই দুপুরে তোমাদের 'বে' হয়েছে? তোমরা ফ্লোরেন্স যাচ্ছ হানিমুনে? পুষ্পনগরীতে ফুলশয্যা পাততে?

—আপনার প্রথম আন্দাজটা ঠিক, মাদাম। দ্বিতীয়টা নয়। অর্থাৎ আজ সকালেই রোমের একটি চার্চে আমাদের বিবাহ হয়েছে। তবে ফ্লোরেন্সে আমরা হানিমুনে যাচ্ছি না। সেখানেই আমার বাড়ি।

বৃদ্ধ একেবারে উচ্ছ্বসিত : এ হী! মাদোনা সান্তা!.... আজই ওদের 'আগুরি'! ফুলশয্যা!

আর্টিমিসিয়া ভীষণ লজ্জা পেল। কিন্তু খানা-কামরার বারোজন একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে : লা গ্রাণ্ডি.. 'আগুরি'! ফুলশয্যা!

বৃদ্ধ তাঁর সহধর্মিণীর দিকে ফিরে বললেন, বল গিন্নি? এ ক্ষেত্রে কী আমাদের করণীয়?

বৃদ্ধা ভেড়ার মাংস চর্বণ করতে করতে বলেন, আগে তোমার বুদ্ধির দৌড়টা আমরা শুনি? একজোড়া ভিনদেশী কপোত-কপোতী উড়তে উড়তে তোমার রাজ্যে এসে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। আজ সকালেই তাদের 'বে' হয়েছে। আজ রাতেই তাদের 'আগুরি'। এ ক্ষেত্রে জমিদার মশাই কী করতে বলেন?

বৃদ্ধ বললেন, এত রাতে শ্যাম্পেন জোগাড় করা শক্ত। সব মদের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আর হ্যারল্ডের ভাঁড়ারে ও অমৃত থাকে না — আমি জানি — সে বানায় পচাই আর চালায় 'ওয়াইন' বলে! তা হোক! সেই তাড়ি-ওয়াইন সেবন করেই আমরা ওকে 'টোস্ট' দেব। কই হে হ্যারল্ড, শোন: সব্বাইকে তার টিনের পাত্রে টইটম্বুর এক এক পাত্র তোমার ওয়াইন দাও! আমার অ্যাকাউন্টে!

বৃদ্ধ থামতেই জমিদার গিন্নি বলেন, ব্যস! হয়ে গেল? এই তোমার হিম্মতের দৌড়?

—আবার কী?

বৃদ্ধা সেকথার জবাব না দিয়ে এবার দায়িত্বটা নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। গৃহস্বামীকে বললেন, শোন হ্যারল্ড! এখনি কাউকে পাঠিয়ে দাও বেসিলিওর ফ্লাওয়ার শপে। অনেক-অনেক ফুল নিয়ে এস। দোকান যদি বন্ধ হয়ে থাকে বেসিলিওকে টেনে তুলে দোকান খোলাও। এখনো ফুলের মরশুম শেষ হয়নি। ক্রকস, ডায়াস্থাস, ক্যানা, লিলি, পপি, মায়

গোলাপও পাবে। আর এক বান্ডিল আগরবাতি, একটা বড় ক্যান্ডেলস্টিক। .... আর শোন সিনেরা হ্যারল্ড! তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে দোতলায় যাও। কিছু মনে কর না মা! আজ রাতে তোমার শোবার একটু কষ্ট হবে। তোমাদের মাস্টার্স বেড-রুমটা এদের ছেড়ে দিতে হবে। একটা পাটভাঙা ধোপ চাদর বিছিয়ে দাও। ফুল দিয়ে বড় খাটটা সাজিয়ে দাও। এরা দুজন ওই পালঙ্কে আজ শোবে।

পেত্রো তার সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রীর দিকে ফিরে হাসে। জমিদার গিন্নিকে বলে, আর মাডাম, আমার কী করণীয়?

বৃদ্ধা মুচকি হেসে বললেন, তোমার তো মস্ত বড় কাজ, হে। আমরা শুধু ফ্লাওয়ারের যোগান দিলাম, তুমি ডি-ফ্লাওয়ার করবে। পারবে তো?

সবাই অট্টহাস্য করে ওঠে। আর্টিমিসিয়া তার মুখখানা কোথায় লুকাবে ভেবে পায় না। বৃদ্ধা বলেই চলেন, আরও একটা কাজ তোমাকে করতে হবে বাপু। হিম্মতে কুলাবে তো?

—বলুন ম্যাডাম?

—কনে কখনো হেঁটে হেঁটে ফুলশয্যা কক্ষে যায় না। তাকে পাঁজাকোলা করে তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে। পারবে তো? আমরা শুধু হাততালি দেব।

আবার সবাই চিৎকার করে ওঠে : লা গ্র্যান্ডি! হো হো! হা-হা!

বৃদ্ধ বলেন, দেখ বাপু, তোমার হিম্মতে না কুলালে, আমাকে ছেড়ে দাও! আমিই ওকে পাঁজা-কোলা করে দোতলায় নিয়ে যাব। কী বল গিন্নি, পারব না? তোমাকে তো নিয়ে গেছিলাম।

এবার বৃদ্ধার লজ্জা পাওয়ার পালা।

আবার সবাই সমস্বরে শেয়ালের ডাক ডেকে ওঠে।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ান, বলেন, সাইলেন্স! সাইলেন্স প্লীজ!

সবাই চুপ করে যায়। বৃদ্ধের দেখাদেখি উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ বলেন, ও লর্ড যেসাস! আমরা সমবেতভাবে প্রার্থনা করছি : তুমি এই নবদম্পতিকে আশীর্বাদ কর। এরা যেন দীর্ঘকাল বিবাহিত জীবনে সুখী হয়।

সকলে বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে সমস্বরে বলে ওঠে : আমেন!

আর্টিমিসিয়ার বিবাহ উৎসব ছিল নিরাড়ম্বর। রোমে। নতুন বাড়িতেও কেউ তাকে অভ্যর্থনা করতে প্রতীক্ষা করছে না। ফ্লোরেন্সে। কিন্তু এই গণ্ডগ্রামে অপরিচিত নিরক্ষর মানুষগুলো তাদের দুজনের জন্য আনন্দঘন ফুলশয্যার ব্যবস্থাটা করেছে। এরা কেউ তাদের চেনে না — নিতান্ত গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষ। তবু যীসাস্-এর 'ল্যভ দাই নেবার' মন্ত্রে বিশ্বাসী। যার যতটুকু সাধ্য করেছে। আর কিছু না পারুক হেসেছে আর প্রভু যীসাস-এর কাছে তাদের দুজনের আনন্দঘন বিবাহিত জীবনে কামনা করেছে আর্টিমিসিয়ার দু'চোখে জল ভরে এল। আনন্দে।

অবশেষে ফ্লোরেন্স। স্বপ্নলোকের সেই পুষ্পনগরী। যাত্রা করার পর তৃতীয় দিন পড়ন্ত বেলায় ওরা সেই পুষ্পনগরীতে প্রবেশ করল। দক্ষিণ-তোরণ দিয়ে — যার নাম 'প্রোর্টা রোমানা'। শহরতলির অন্তেবাসী টালির দোচালাগুলি সরে গেছে অতিক্রান্ত পথের নেপথ্যে। এখন দেখা যাচ্ছে পাথর -বাঁধানো রাজপথের দুইধারে সারি সারি দ্বিতল অথবা ত্রিতল বাড়ি। রোম-নগরীর তুলনায় তাদের আকার, উচ্চতা, আয়তন সবই অল্প। কিন্তু সৌন্দর্যে নয়। প্রতিটি বাড়ির অঙ্গে বিচিত্র-রাঙা ফুলকাটা গাউন — ক্রোম ইয়ালো, ইয়ালো অকার, বার্নট সিয়েনা অথবা লাইট সিনামন। প্রতিটি বাড়ির ব্যালকনিতে ফুলের সম্ভার। যেন রাজমিস্ত্রি নয়, চিত্রশিল্পীর দল তাদের এঁকেছেন গগনপটের ক্যানভাসে। পাশাপাশি দাঁড়ানো উৎসবসাজে সজ্জিতা পৌরললনার দল। ওরা কি জানে শহরে এল একজন নতুন বাসিন্দা?

পেত্রো গাড়ির জানলা থেকে হাত বার করে বললে, ওই দ্যাখো পালাজ্জো পিত্তি। মেডিসি রাজপ্রাসাদ। এখানেই এককালে বাস করতেন 'লরেঞ্জো দ্য ম্যাগ্‌নিফিশেন্ট', মানে মিকেলাঞ্জেলোর পেট্রন। এখন থাকেন ইলা গ্র্যান্ডুকা কসিমো দ্য মেডিসি। ওবাড়ির বাগানে, দরবার- কক্ষে প্রাসাদের সর্বত্র অপরূপ ভাস্কর্য আর তৈলচিত্র! অতি সুন্দর, তাই নয়?

আর্টিমিসিয়া এক কথায় মেনে নেয়। জানতে চায়, তুমি কখনো ভিতরে ঢুকে দেখেছ?' মেডিসি প্যালেসে?

—না। কখনো প্রয়োজন হয়নি।

আর্টিমিসিয়া একটু অবাক হল। 'প্রয়োজন হয়নি' মানে? ইতালির শ্রেষ্ঠ সংকলকের প্রাসাদে ভাস্কর্য বা চিত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখার কোনও প্রয়োজনও বোধ করেনি? লোভ হয়নি? ও তাহলে কেমনতর ফ্লোরেন্টাইন শিল্পী!

পেত্রো গাড়োয়ানকে নির্দেশ দিল সান্তা মারিয়া চার্চের চারিদিক একবার ঘুরিয়ে দেখাতে। গাড়িটা চক্কর মারল নির্দেশমতো। সান্তা মারিয়া দেল ফিওর গির্জা আর ডুমোকে প্রদক্ষিণ করে গাড়িটা এবার চলল পুবমুখো। আর্নোর ধারে ধারে স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে।

পেত্রো বললে, পরে একদিন তোমাকে বলব, কীভাবে ব্রানেলেশ্চি ওই বিরাট গম্বুজটা বানিয়েছিলেন। টাওয়ারটা বানানো হয় তাঁর প্রয়াণের পরে। উনি দেখে যেতে পারেননি। টাওয়ারের মাথায় আছে একটা ঘণ্টাঘর। প্রতিদিন ঠিক দুপুরে বারোটার সময় ওখানে ঘণ্টা বেজে ওঠে। সবাই বুঝতে পারে অ্যাপোলোদেব মধ্যগগন অতিক্রম করলেন।

পেত্রো কোচম্যানকে বলল, এবার বাঁদিকে কর্সো দেই তিন্নোচত্তর দিকে যেতে হবে। এখানে রঙরেজিনীদের বাসা। নানান রঙের কাপড় রাঙায় ওরা। পড়ন্ত রোদে রঙ-বেরঙা জামা-কাপড় শুকাচ্ছে। শীতালি হাওয়ায় সগর্বে ফুলে ফুলে উঠছে। পাথরে বাঁধানো সড়ক। ঘোড়ার খুরের শব্দে রাজপথ মুখরিত—খপ্, খপ্, খপ্।

অবশেষে গাড়িটা তার যাত্রা শেষ করল। একটা ত্রিতল 'অকার'-রঙের বাড়ির দিকে নির্দেশ করে পেত্রো বললে, ওইটা হল আমার বাড়ি।

'আমাদের বাড়ি' বলল না কিন্তু। যেন বাড়ির সেই একমাত্র মালিক। মালকিন নেই। আজও আসেনি। আর্টিমিসিয়া নামল গাড়ি থেকে। গায়ে-গতরে বেশ ব্যথা। কোচম্যান আর পেত্রো ওর ব্যাগ-বাক্স উঠিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল। পেত্রো বলল, 'আমি থাকি তিনতলায়। এস—'

সামনেই একটা পাইন কাঠের ছোট্ট গেট। একচিল্‌তে বাগান। তাতে একটা ডুমুর গাছ আর একটি পীচ। নুড়ি বিছানো সরু পায়ে-চলা পথের ও প্রান্তে বাড়িটা মাথা তুলেছে। যেন অচেনাকে সম্মান জানাচ্ছে: 'আসুন, আসুন।' দ্বিতল ও ত্রিতলে রাস্তার দিকে ঝোলা বারান্দা। আর্টিমিসিয়ার নজরে পড়ে, বাগানের একান্তে একটা পাথরের ইঁদারা। কারা যেন কপিকলে জল তুলছে। তারা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল আগন্তুকদের। কিন্তু কোনো কথা বলল না। আর্টিমিসিয়া বুঝতে পারে, ওই ইঁদারাটাই পানীয় জলের উৎস। তাকে কি প্রতিদিন বালতি করে তিনতলায় জল টেনে তুলতে হবে? এতদিন সে কাজ নিশ্চয় করত পেত্রো; ফলে কাজটা ভাগাভাগি করে করতে হবে। এটুকুই সান্ত্বনা।

একতলায় পাশাপাশি দুটি দোকান। মনে হল একটি মণিহারী, অপরটি ওই যাকে বলে 'ফাস্ট-ফুড'-এর দোকান। সেই দোকান-ঘর থেকে বার হয়ে এলেন একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক। পেত্রোর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। উনি বললেন, 'শুভ অপরাহ্ণ।'

পেত্রো হয়তো শুনতে পেল না। অথবা শুনতে চাইল না। আর্টিমিসিয়া থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। উনি ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম সিনোরিটায় আপনি নিশ্চয় সিনোরা অন্তোনিও? আমি এই একতলার খাবারের দোকানটার মালিক : পপালিনো।'

আর্টিমিসিয়া খুশি হল। তাকে অভ্যর্থনা জানাবার মতো এবাড়িতে অন্তত একজন মানুষ আছে। যে লোকটা জানত যে, পেত্রো রোম-এ গেছে বিয়ে করতে। আর্টিমিসিয়া তাঁর করমর্দন করে বললে, 'ধন্যবাদ সিনর পপালিনো। শুভ অপরাহ্ণ!'

পেত্রো ততক্ষণে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। সেখান থেকেই হাঁক পাড়ে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাৎ পরেও হতে পারে, আর্টিমিসিয়া। মালপত্রগুলো প্রথমে বুঝে নাও।

পপালিনো ওর হাতটা ছেড়ে দেয়। আর্টিমিসিয়া মিষ্টি হেসে এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে।

পাথরের খাড়া খাড়া ধাপ। একদিকে কাঠের রেলিঙ। অপর দিকে পাথরের দেওয়াল। দ্বিতলে ল্যাণ্ডিঙে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন বৃদ্ধা। গাড়ির শব্দে কৌতূহলী হয়ে হয়তো দেখতে এসেছেন, কে এল — কারা এল।

এবার অবশ্য পেত্রো অভদ্রতা করল না। বৃদ্ধার সঙ্গে তার সদ্যপরিণীতা বধূর আলাপ করিয়ে দিল।

—ইনি দোতলায় থাকেন। সিনোরা ফিনা লিপ্পি। আমরা ডাকি 'গ্রানি', আর এ হল.....

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বৃদ্ধা বলেন, পরিচয় দিতে হবে না। আমরা প্রতিদিন তোমার প্রত্যাশা করছি, নাতবৌ। কী নাম তোমার?

— আর্টিমিসিয়া জেন্টেলেসচি।

পেত্রো সংশোধন করে দেয়, 'এখন আর 'জেন্টেলেসচি' নয়। 'আন্তোনিও।

বৃদ্ধা বললেন, 'পরে ভালো করে আলাপ হবে। এখন ওপরে ওঠ। ঘর দোর সব গুছিয়ে নাও গে। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে অসঙ্কোচে চেয়ে নিও দিদি। আমার বাতের ব্যমো, না হলে নিজেই উঠে যেতাম তিনতলায়।'

তিন তলায় তিনখানি কামরা। প্রথমেই একটা বড় ঘর। সেটা পেত্রোর বসার ঘর তথা স্টুডিও। ম্যাচমেকার কিছু মিছে কথা বলেনি। দেওয়ালে পাশাপাশি গাদাগাদি ছবির মিছিল। খানতিনেক কাঠের চেয়ার। টেবিলে রঙ-তুলি ক্যানভাসে উপচিয়মান। তারপরে শয়নকক্ষ। ডবল বেড খাট। একটি ইজিচেয়ার, টেবিল, গা-আলমারি। তাতে বেশ বড়মাপের একটা ভেনিসীয় কাচের আয়না। শয়নকক্ষ পেরিয়ে ওপাশে ছোট একটি পাকঘর। স্টোভ, র‍্যাক, একদিকে গাদা দেওয়া জ্বালানি কাঠ, বড় হাণ্ডায় জল। দেওয়াল থেকে ঝুলছে কিছু পাত্র: ফ্রাইং প্যান, হাতা, খুন্তি, ইত্যাদি। টেবিলে কিছু ডিশ, কাঁটা-চামচ, কাপ-প্লেট।

আর্টিমিসিয়া খুশি হল তার সাজানো সংসার দেখে। পেত্রো কোচম্যানকে দাম মিটিয়ে ফিরে এল। বাক্স-প্যাটরাগুলো টেনে টেনে নিয়ে এল স্টুডিও থেকে শয়নকক্ষে। তারপর ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে, 'কী? ঘর পছন্দ হয়েছে?'

—হ্যাঁ, না হবে কেন? দোতলার ওই, গ্র্যানির সংসারে আর কে আছেন?

—আর কেউ নেই। বুড়ি একেবারে একাই থাকে। বিধবা। একটা বকাটে নাতি ছিল। সেও বছর দুয়েক হল সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। বুড়ির ঠ্যাঙে বাত। জল টেনে উপরে তুলতে পারে না। সেটা আমিই তুলে দি। বেশি নয়, দিনে তিন বালতি

আর্টিমিসিয়া বলে, 'ভালো ভাড়াটে পেয়েছ তো? তাকে দিনে তিন বালতি জল তুলে—দিতে হয়?

—ভাড়াটে! কে ভাড়াটে?

—ওই গ্র্যানি। ও তোমার ভাড়াটিয়া তো?

—আরে না, না! ওই তো হল এই তিনতলাবাড়ির মালকিন্। আমিই বরং ভাড়া আছি তার তিনতলায়। তা আজ প্রায় চল্লিশ বছর। আমার মায়ের আমল থেকে।

আর্টিমিসিয়া অবাক মানে। তার মনে পড়ে যায়, গাড়িটা যখন বাড়ির সামনে থামে তখন পেত্রো কেমন চালের মাথায় বলেছিল: 'আমার বাড়ি!'

সে রাতে ওদের রান্না করতে হল না। পেত্রো একতলার দোকান থেকে খাবার কিনে আনল। আর্টিমিসিয়ার অনাড়ম্বর নতুন জীবন শুরু হল এভাবেই। অবশ্য সারাদিন গাড়ির ঝাঁকানিতে ক্লান্ত দেহটা মুক্তি পেল না। মাথা গোঁজার আশ্রয়ের বিনিময়ে তাকে দাম মেটাতে হল। মরদের শান্তি মিটিয়ে।

প্রথম সাতদশ দিন পেত্রোর উৎসাহে কোনো খামতি দেখা গেল না। নববিবাহিতা বধূকে নিয়ে গোটা শহরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। ভাবখানা, এ শহরে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, তা সবই পেত্রো আন্তোনিয়র কীর্তি। কখনো অশ্বশকটে কখনো পদব্রজে। দু-একবার পথপার্শ্বের কফি শপ-এও নিয়ে গেল সঙ্গিনীকে। তারপরেই কেমন যে ভাঁটা পড়ল পেত্রোর উৎসাহে।

আর্টিমিসিয়ার যা কিছু গোপন রহস্য তা ও সাত দিনই যেন আবিষ্কার করে ফেলেছে। এখন আর ছেলেমানুষী করা চলে না। সাত সকালে প্রাতরাশ সেরে যে ছবি আঁকতে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, কে জানে? দুপুরে কোথায় খায়, কী খায় তাও অজানা। ফিরে আসে এক প্রহর রাত্রে। কখনো বগলে আবসাম্বের বোতল। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলে মদ্যপানের বিলাসিতা।

মাত্র এক সপ্তাহের ভিতরেই যে তার বিবাহিত জীবন এমন ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে তা ছিল আর্টিমিসিয়ার দুঃস্বপ্নেরও অগোচর। কে জানে, হয়তো ওর মায়েরও ছিল একই জাতের বিড়ম্বনা। কারণ ওর বাবা ওরাজিও ঠিক এভাবেই সকালে দুটি নাকে মুখে গুঁজে বার হয়ে যেত। ফিরত একপ্রহর রাতে। তবে বোতল-বগলে নয়। ওরাজিও ছিল প্রখ্যাত চিত্রকর কোরাজ্জিওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু কোরাজ্জিও বেশিদিন বাঁচেনি। কোরাজ্জিওর প্রয়াণের পর বাপি জুড়ি বেঁধেছিল তাসী-কাকুর সঙ্গে। পেত্রো কোথায় কী আঁকতে যায় আর্টিমিসিয়া জানে না। প্রশ্ন করলে সে এড়িয়ে যায়।

মাসখানেকের মধ্যেই কেমন যেন বর্ণহীন একঘেয়ে হয়ে পড়ে সদ্যোবিবাহিতার জীবন। কাজ তো সবাই করে। সব নববধূকেই পার হয়ে আসতে হয় বিবাহিত জীবনের এই বিড়ম্বিত প্রথম অধ্যায়টা। সারাদিন ঘরের কাজ করে আর একটা কান সজাগ থাকে সদরদোরের 'ডোর-বেলটার' শব্দের প্রত্যাশায়। কখন ফিরে আসবে কর্মক্লান্ত ঘর্মস্নাত ঘরের মানুষটা। নৈশাহারের তর সয় না, নতুন জীবনসঙ্গিনীর হাত ধরে, টানাটানি করে। আর্টিমিসিয়ার ঘরের মানুষও ঘরে ফেরে। সন্ধ্যায় নয়, দেড় প্রহর রাতে। আর তার বগলে প্রায় প্রতিদিনই থাকে এক বোতল আবসাম্ব!

প্রতিদিন অপরাহ্ন বেলায় প্রসাধন সেরে ও চুপটি করে গিয়ে দাঁড়ায় রাজপথের উপর ঝোলা বারান্দাটায়। দেখে, পথে নরনারীর অলস পদচারণ। ফেরিওয়ালার দল ঝাঁকা-মাথায় অথবা ঠেলা গাড়িতে নানান সওদা ফিরি করে। ফল-ফুল-মাথার ফিতে, আগরবাতি, ডুমুর জুকিনি, কন্দমূলের আনাজপাতি বা ঘরে-করা ব্রাউন রুটি। কোনো কোনো বৃদ্ধ লাঠি ঠুকঠুক করে সান্ধ্যবিহারে বার হয়েছে গায়ে শতছিন্ন পশমের কোট, গলায় গলবন্ধ, মাথায় টপ হ্যাট বাচ্চার দলও হুটোপুটি করে রাস্তায়। আর দেখা যায় সুসজ্জিত তরুণ-তরুণী হাত ধরাধরি করে সান্ধ্যভ্রমণে বার হয়েছেন। ওরা কত সুখী! ভালোবাসা-বাসির প্রাথমিক পাঠ নিচ্ছে হয়তো এই সপ্তদশই শমাপ্ত হবে আজীবন পথচলার দ্বৈতজীবনে। ও হতভাগীর সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্‌বেগ উদ্বেলিত জীবনের স্বাদ পায়নি। পাবে না। তারও বিবাহ হয়েছে। তবে প্রেমের পথপরিক্রমায় নয়—বাধ্যতামূলক বিবাহ! 'ম্যারেজ অব কন্‌ভিনিয়েন্স'!

স্টুডিও-ঘরে দেওয়া ভর্তি পেত্রোর আঁকা ছবিগুলো দেখেছে বারে বারে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সবই তেলরঙের ক্যানভাস। বিষয়বস্তুর বিস্তারে খাম্‌তি নেই। স্থিরচিত্র, নৈসর্গিক দৃশ্য, প্রতিকৃতি এবং বাইবেল-বর্ণিত ঘটনাবলী : 'অ্যানানসেশান, নেটিভিটি,' যীশুক্রোড়ে মা-মেরী, রেপ অব দ্য স্যাবাইন্‌স, অশ্বচ্যুত সেন্ট পলের কনভার্শান—কী নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য। একটা চিত্রপটেও আর্টিমিসিয়ার শিল্পসচেতন মনে কোনো রেখাপাত করেনি। সবাই যেন সচেতনভাবে চিত্রকরের স্টুডিওতে এসে ভিড় করেছে। নাটকে তাদের চরিত্রটা অভিনয় করতে হবে যে।

তাদের প্রপোর্শান-এ গল্‌তি নেই। সবাই সামনে ফেরা। সবার মুখেই সমান আলো, আলোছায়ার বৈপরীত্য নেই। যেন সারবাঁধা এক সারি পুতুল। নাটকের ওরা কুশীলব মাত্র, কিন্তু নাটকীয়তা নাই। পেত্রো যেন উচ্চেলোর যুগেই থমকে থেমে গেছে। অ্যাঞ্জেলিকো, ম্যাসাচ্চিও, বত্তিচেলি, লেঅনার্দো বা মিকেলাঞ্জেলো, তাদের যেন সে চেনে না।

প্রতিবেশিনীরা কেউ এল না। ওর সঙ্গে আলাপ করতে। এটাই বোধ হয় ফ্লোরেন্সের কেতা। যে-যার বাড়িতে নিজ-নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে চায়। প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে আলাপ হত—যদি পেত্রো ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত তাদের বাড়িতে। বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিত। কিন্তু তেমন কোন ঘটনা ঘটল না। অথচ পেত্রো আন্তোনিয় একান্তচারী নির্বান্ধব মানুষ যে নয়, তো বোঝা যায়। কারণ সে নিজে তো প্রায়ই বন্ধুদের বাড়িতে যায়। কখনো বা নৈশাহারও সেরে আসে। দুপুরে সে যে গির্জায় সিলিঙ আঁকতে যায়—অন্তত সে তাই বলে—সেখানেও ও একা কাজ করে না নিশ্চয়। গল্পচ্ছলে দু-একদিন তাদের উল্লেখ করেছে। আর্টিমিসিয়া অনুযোগও করেছে—'কই তুমি তো তাদের একদিনও নিমন্ত্রণ কর না। তোমার বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে না তো?'

পেত্রো জবাব দেয়নি। মুখ নিচু করে জবাবটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। আর্টিমিসিয়া কিন্তু থামতে পারেনি। বলে, 'কী হল? কোনো জবাব দিলে না যে?'

—না থাক। আমরা, এই তো ভাই আছি! দুজনে। নিরালায়।

—তুমি ভালো আছ। কিন্তু আমার কি ইচ্ছে করে না তোমার বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে? এভাবে একা-একা আমার দিন যে কাটে না।

পেত্রো তবু কোনো জবাব দেয় না।

—কোনো কারণ আছে কি, পেত্রো? আমাকে এমন আড়াল করে রাখার?

এবার মুখ তুলে বলে, 'আছে, আর্টিমিসিয়া। কিন্তু কথাটা অপ্রিয়। শুনলে তুমি অহেতুক দুঃখ পাবে। থাক না সেকথা—'

—না, থাকবে না। তুমি বলো আমাকে। কেন এভাবে আমাকে সবার চোখের আড়ালে রাখতে চাইছ। তুমি আজন্ম ফ্লোরেন্সের বাসিন্দা—তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।

পেত্রো এবার বলতে বাধ্য হল: 'ব্যাপারটা অপ্রিয়। তাই তোমাকে বলতে চাইনি। আমার বন্ধুপত্নীরা নিশ্চয় লক্ষ্য করবে তোমার ডান হাতের আঙুলের ওই বিশ্রী ক্ষত চিহ্ন গুলো। আমার মুখে বসন্তের দাগ আছে। কেউ জানতে চাইলে বলতে পারি : হ্যাঁ, ছেলেবেলায় আমার বসন্ত হয়েছিল। কিন্তু তোমার আঙুলের ওই.....',

আর্টিমিসিয়া একটু থমকে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। পেত্রো আরও বলে, 'কোনো স্ত্রীলোকের হাতে ওই 'সিবিল'-এর দাগ দেখলেই ওরা আন্দাজ করবে—আদালত তোমাকে দিয়ে কিছু স্বীকারোক্তি আদায় করাতে চেয়েছিল। ওদের কৌতূহল হবে: কী অপরাধ? কী স্বীকারোক্তি?

আর্টিমিসিয়া তার ডানহাত খানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কথাটা মিথ্যে নয়।

আদালত সারাজীবনের জন্যে তার দক্ষিণ হস্তে এক শাশ্বত কলঙ্কচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। উপায় নেই। মহামান্য লর্ড হেরোনিমো ফেলিসিও লকুমটেনেন্টি তাকে সারাজীবনের জন্য 'সলিটারি ইম্‌প্রিজনমেন্ট'-এর শাস্তি দিয়েছেন। সভ্যসমাজে সে হাতখানা দেখাতে পারবে না। তার নিয়তি : একক নির্বাসন।

রবিবারের ছুটির দিন। 'সাবাথ ডে'। সেদিন চার্চে সিলিঙ সাফা করার কাজ বন্ধ। সচরাচর পেত্রো বাড়িতেই থাকে। যদি না বন্ধুদের নিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে হুল্লোড়ে যায়। ঘোড়াদের তো আর 'সাবাথ-ডে' নেই। তাই তাদের মরণপণ দৌড়াতেই হয়। যারা দেখতে যায় তাদের কেউ হয় আমীর, কেউ ফকির।

এই রবিবারে পেত্রো ঘোড়দৌড়ের মাঠে যায়নি। ইজিচেয়ারে পা-এলিয়ে বারান্দায় রোদ পোহাচ্ছিল। হঠাৎ বেমক্কা বলে বসে, 'কই আর্টিমিসিয়া, তুমি তো তোমার আঁকা ছবিগুলো আমাকে দেখালে না? কিছু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই। আজ বার কর।'

পেত্রোর শিল্পচেতনার সম্বন্ধে ওর মোটামুটি ধারণা হয়েই গেছে। ও যে আর্টিমিসিয়ার চিত্রে নাটকীয়তা অথবা, বাস্তবতা বা 'চিরোসকিউরো' পছন্দ করবে না এমন একটা ধারণা হয়েছে। তাই তার ছবিগুলো আজও বাক্সবন্দি পড়েই আছে। বার করেনি। আজ বাধ্য হয়ে বার করে দেখাতে হল। ওর কোনো ছবিই আজ পর্যন্ত ফ্রেমিং হয়নি। গোল করে গোটানো ছবিগুলো মুখগুঁজে পড়ে ছিল প্যাঁটরায়। অনুরুদ্ধ হয়ে একে একে বার করে দেখালো।

প্রথমেই কিছু স্কেচ। গরু, ছাগল, ভাঙা বাড়ি, ভিখারি, কুকুরছানা। পেত্রো সামনে ধরে, দূরে সরিয়ে পরীক্ষকের সমজদার দৃষ্টিতে সেগুলি দেখে বললে, 'তোমার ড্রইং বেশ জোরালো, আর্টিমিসিয়া। এবার দেখাও অয়েল কালারগুলি।'

ও প্রথমেই বার করে দেখালো : *লায়ার-বাদিকা*।

পেত্রো প্রশংসা করল। মোটামুটি ভালোই হয়েছে। এখানটায় কোবাল্ট ব্লু রঙ না ব্যবহার করলেই ভালো হতো। ব্যালেন্সিং নষ্ট হয়ে গেছে।

আর্টিমিসিয়া সেকথার জবাব না দিয়ে মেলে ধরল পরবর্তী তৈলচিত্রটি : *সুসান্না আর মোড়লেরা।*

—এটার বিষয়বস্তু কী? ছবিটার ক্যাপশান?

—*সুসান্না আর মোড়লেরা।* বিব্‌লিকাল থীম।

—ও বুঝেছি, বুঝেছি। ভেনিশিয়ান পেইন্টার জ্যাকোপ্পো তিন্তোরেত্তোর একখানি ছবি আছে, এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে। কিন্তু সেখানে সুসান্না ছিল অপূর্ব একটি ন্যুড। সেটাই হবার কথা। কারণ সুসন্নাকে নগ্ন-স্নানরতা অবস্থাতেই দেখেছিল মোড়লেরা। আর বাইবেল বলেছেন: সুসান্না ছিল অপূর্ব সুন্দরী।

আর্টিমিসিয়া স্বীকার করে, 'তা ঠিক তবে মহান শিল্পী যে খণ্ডমুহূর্তটি বেছে নিয়েছেন তখনো সুসন্না জানে না যে, লুকিয়ে একজন বৃদ্ধ তার নগ্ন সৌন্দর্যে মোহিত, তাই সে প্রসাধনে আত্মনিমগ্না। আমি বেছে নিয়েছি তার দশ মিনিট পরের একটা মুহূর্ত—যখন মোড়লেরা আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের জঘন্য প্রস্তাবটা পেশ করেছে।' সুসান্না শিহরিতা।

কোনক্রমে তার নিরাবরণ নিম্নাঙ্গটা অন্তত আবৃত করেছে। সে প্রবলভাবে ওই ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে। তাই ও ন্যুড নয়।

পেত্রো মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'সেটাই তোমার ভুল হয়েছে আর্টিমিসিয়া। তুমি একটি অনবদ্য ন্যুড আঁকার সুযোগ হেলায় হারিয়েছ।'

আর্টিমিসিয়া দৃঢ়স্বরে বলে, 'না! বরং তিন্তোরেত্তোই ভুল করেছেন!'

—এতবড় কথাটা তুমি বলতে পারলে? তুমি জানো, জ্যাকোপ্পো তিন্তোরেত্তো কত বড় শিল্পী?

—আলবাৎ তিন্তোরেত্তো মহান শিল্পী এ কথা অনস্বীকার্য। তাঁর প্রতি আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান। কিন্তু আমরা তো তার আঁকা একটি শিল্পকর্মের সমালোচনা করছি পেত্রো — তাঁকে নয়। ভেবে দেখ, মহান বাইবেল এখানে কী বলতে চান? সুসান্নার কাহিনির মূল প্রতিবেদনটি কী? তার পাতিব্রত্য—তার নগ্ন সৌন্দর্য নয়! সেই উপকাহিনি আমাদের বলতে চায়: আদর্শ থেকে, বিবেকের নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অপেক্ষা মৃত্যুবরণ বাঞ্ছনীয়! সেজন্যই ঈশ্বরপ্রেরিত বিচারক ড্যানিয়েল এসে সুসান্নাকে উদ্ধার করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি গভীর আস্থা, একান্ত বিশ্বাসই এই উপকথার মূল বক্তব্য। নগ্ন নারীর দেহসৌন্দর্য নয়।

—তাহলে তিন্তোরেত্তো কেন এই ভুলটা করলেন? 'ভুল' শব্দটা অবশ্য তোমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

—কারণ তিনি ছিলেন পুরুষ শিল্পী! ন্যুড আঁকার লোভ সামলাতে পারেননি।

— অ! ঠিক আছে— বাকি ছবিখানা দেখি?

আর্টিমিসিয়া কিছুটা মর্মাহত হল। বুঝতে পারে, পেত্রো তার সহজ সরল যুক্তিটা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। একই কারণে — সে নিজে পুরুষ বলে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভেনিশীয় শিল্পী বাইবেলের মূলসূত্রটা অগ্রাহ্য করেছেন একটি অনবদ্য 'ন্যুড' আঁকার উৎসাহে। মহান বাইবেলের যা মূল আবেদন — সুসন্নার পাতিব্রত্য, তার দুর্জয় সাহস, তার ঈশ্বরনির্ভরতা হারিয়ে গেছে একটি ন্যুড আঁকার প্রলোভনে।

এবার সে মেলে ধরে তৃতীয় তৈলচিত্রটি : *জুডিথ ও হলোফার্নেস*।

—এটা কী? দুটি স্ত্রীলোক একজন শক্তিমান পুরুষকে চিৎ করে পেড়ে ফেলে হত্যা করছে। গুড গড! এ তো বীভৎস!

— না, পেত্রো! বীভৎসতাই এ শিল্পের একমাত্র আবেদন নয়। 'হলোফার্নেস' ছিল বর্বর, নৃশংস। তাকে হত্যা করে ওই দুটি মেয়ে—জুডিথ আর আব্রা — জুডা নগরী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করছে। এ চিত্রের আবেদন : জুডিথ-এর দুঃসাহসিকতায়,তার মহত্ত্বে!

পেত্রো মাথা নেড়ে বললে, 'দুঃখিত! এটা মানা যায় না। তুমি এই একই বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা জার্মান শিল্পী ক্রানাচ দ্য এলডারের অয়েল পেন্টিংটা দেখেছ?

— দেখেছি। আমার মন ভরেনি। ক্রানাচ একটা অবাস্তব ছবি এঁকেছেন। তাঁর ছবিতে মনে হয় জুডিথ তাঁর স্টুডিওতে এসেছে একটি প্রতিকৃতি চিত্র আঁকাতে। তার হাতে তলোয়ার — তাতে একফোঁটা রক্ত নেই। টেবিলে হলোফার্নেসের কাটা-মুণ্ড, তাতেও একফোঁটা রক্ত

নেই। ঘটনা যদিও একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী মুহূর্ত, তবু ক্রানাচ তাঁর ছবিতে 'ভার্মিলিয়ান-রেড' ব্যবহারই করেননি। কিছু মনে কর না পেত্রো, বাস্তবতাকে এভাবে অস্বীকার করাটাই আমার কাছে বীভৎস লেগেছে।

পেত্রো অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। শিল্পীর স্বাধীনতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তা এক তরফা হতে পারে না। শিল্প-দর্শক কী প্রত্যাশা করে, কী চায় তা শিল্পীকে বুঝে নিতে হবে। তোমার ছবিটা দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে ওঠে। ক্রানাচ দ্য এলডার একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে যে ছবিটা এঁকেছেন তা জনপ্রিয়। তোমার এ বীভৎস রূপ দর্শক কোনোদিনই মেনে নেবে না। আয়াম সরি।

আর্টিমিসিয়া ক্যানভাসটা গুটিয়ে নিতে নিতে বললে, 'আমিও তোমার সঙ্গে তর্ক করব না পেত্রো। কিন্তু দেওয়ালে টাঙানো তোমার আঁকা ওই ছবিখানা দেখতে গেলে আমার ও গা গুলিয়ে ওঠে।'

ভ্রূকুঞ্চন হল পেত্রোর। বললে, 'আমার আঁকা ছবি? কোনখানা?'

—ওই তো দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে— *'রেপ অব দ্য স্যাবাইনস্।'*

—কিন্তু ওটাতে আমি তো ভার্মিলিয়ান রঙ ব্যবহার করিনি। এ ছবিতে কেউ কাউকে হত্যা করছে না, রক্তের চিহ্নমাত্র নেই।

—না, হত্যা করছে না! কিন্তু ছবিটা নিঃসন্দেহে বীভৎস এবং অশ্লীল! একদল রোমান যোদ্ধা কতকগুলি বিবস্ত্রা সাবাইন রমণীকে যৌথ বলাৎকার করছে! এর মধ্যে সৌন্দর্য কোথায়?

—কী আশ্চর্য! এটা তো একটা ক্লাসিকাল থীম।

—ওটা 'ক্লাসিকাল থীম' হয়েছে একটি মাত্র হেতুতে। যারা এঁকেছে এবং যারা আঁকিয়েছে তারা সবাই ছিল পুরুষ। চিত্রশিল্প এবং ললিতকলা ছিল এবং আছে পুরুষদের কব্জায় — শুধুমাত্র সেই কারণে।

পেত্রো ব্যঙ্গোক্তি করে, 'আশার কথা যে, এখন চিত্র শিল্পটা আর পুরুষের একচেটিয়া দখলে থাকবে না। মহিলা শিল্পীর দল এবার আসর মাৎ করতে গুটি গুটি এগিয়ে আসছেন।'

আর্টিমিসিয়া জবাব দিল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল। চিত্রশিল্প নিয়ে সে আর তার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনোদিন আলোচনা করবে না। ওরা দুজন ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। পেত্রো পড়ে আছে প্রাক-উচ্চেল্লোর শিল্পজগতে। সে অতীতমুখী।

আর আর্টিমিসিয়ার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। সে প্রতিবাদিনী!

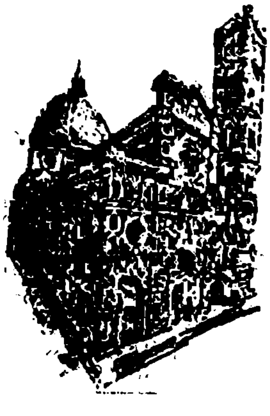

মাস ছয়েক পরের কথা। ভোর রাত্রে ওর কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠল। উঠে গিয়ে বমি করে এল। পেত্রোর ঘুম ভাঙেনি। সে জানতেও পারে না। কিন্তু ওর আর ঘুম এল না। একটা আশঙ্কায় —আশঙ্কা? না আকাঙ্ক্ষার? বাকি রাত সে চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইল।

পর পর দুমাস বাদ গেছে। আকৈশোর যে মাসিক চক্রাবর্তন ছন্দে আবদ্ধ হয়ে ছিল তাতে অপ্রত্যাশিত ছেদ পড়েছে। না, অপ্রত্যাশিত কেন হতে যাবে! এমনটা তো হয়। সব মেয়েরই হয়।

বিবাহিত জীবন শুরু হবার পরে। কারও দুবছর পরে, কারও বা পাঁচ, ওর ক্ষেত্রে তা মাত্র ঘটেছে ছয় মাস পরেই, এই যা।

নানান চিন্তায় ওর মনের মধ্যে হতে থাকে উথাল-পাথাল। পেত্রো এটাকে কী ভাবে নেবে? সে কি খুশি হবে না? ওদের সংসারে একটা চুনুমুনু এলে? ও নিজে তো দারুণ খুশি হবে। ওর জীবনের নিঃসঙ্গতার অবসান ঘটতে চলেছে। এই নিস্তব্ধ প্রেতপুরীটা শিশুকণ্ঠের কল-কোলাহলে অচিরেই মুখরিত হয়ে উঠবে।

কিন্তু তার ছবি-আঁকার স্বপ্নটা? পেত্রো কোনো সাহায্য করেনি এতদিন। করবেও না। ওর সাধনায় যদি ওকে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অচঞ্চল থাকতে হয়, তাহলে তাকে সম্পূর্ণ একাকী সাধনায় নিমগ্ন থাকতে হবে। শিশুজননীর পক্ষে সংসার সামলিয়ে সে কাজের প্রচেষ্টা অবান্তর স্বপ্ন। কিন্তু তাই বলে .....

প্রাতরাশের টেবিলেই পেত্রো বেমক্কা প্রশ্ন করে বসে, 'তোমার কী হয়েছে বল তো? সকাল থেকেই দেখছি মুখ ভার! কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছ? চিঠিপত্রে?'

আর্টিমিসিয়া স্বচকিত হয়ে ওঠে। বলে, 'না, না। চিঠিপত্র কিছু তো আসেনি। দুঃসংবাদ কেন হবে?'

—তাহলে তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে পড়েছ কেন? মনে হচ্ছে, কী যেন ভাবছ?

—হ্যাঁ ভাবছি। একটা কথা চিন্তা করছি। সময় হলেই তোমাকে জানাব।

—বাঃ ! এটা কেমন কথা? আমরা স্বামী-স্ত্রী। তোমার কোনো কথাই তো আমার কাছে গোপন রাখা ঠিক নয়।

আর্টিমিসিয়া রুখে ওঠে, 'তুমি কি তোমার সব কথা আমাকে জানাও? সারাদিন তোমার কোথায়-কোথায় কাটে? কোথায় ছবি আঁক? কারা তোমার বান্ধবী তা কি বলেছ?

পেত্রো নিজেকে গুটিয়ে নেয়। নিঃশব্দে প্রাতরাশ শেষ করে ফেলে। কাঁধের উপর ব্যাগটা ফেলে সে বেরিয়ে যায় একটু পরে। আরও দু-চার দিন পরে ও নিশ্চিত বুঝতে পারল যে, সে এখন সন্তানসম্ভবা। কিন্তু সাহস করে কথাটা বলতে পারল না। জানতে চায়, 'তুমি আকাদেমির অ্যাপ্রেন্টিস্-মেম্বারশিপটা ছেড়ে দিয়েছিলে কেন, পেত্রো?'

—ত্রৈমাসিক চাঁদাটা দিতে হবে না বলে। এ তো সহজ কথা।

—কিন্তু ওখানে তুমি তো অনেক সাহায্যও পাচ্ছিলে। আর কিছু না হোক, আকাদেমির মাধ্যমে 'পেট্রন' বা খদ্দের জুটে যাবার একটা সম্ভাবনা ছিল।

—ঘোড়ার ডিম! ওরা ছবি আঁকার কিছুই বোঝে না। ওটা একটা আঁতেলদের আড্ডা!

আর্টিমিসিয়া এ নিয়ে তর্ক করে না। বিষয়টা যে তর্কের অতীত!

'আকাদেমিয়া ডেল আর্টি দেল দিসেগ্নো' হচ্ছে গোটা ইয়োরোপের সর্বপ্রধান শিল্পতীর্থ। ফ্লোরেন্সের গর্ব। মাসাচ্চিও থেকে বত্তিচেল্লি, ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকো দা-ভিঞ্চি এবং মিকেলাঞ্জেলোর চরণরেণু ধন্য। ওই তীর্থেই সকলে সার্থকনামা হয়েছেন। সেই আকাদেমি ওই ব্যর্থশিল্পী বলে কিনা 'আঁতেলদের আড্ডা'? বর্তমানে আকাদেমির সভ্যসংখ্যা মাত্র বেয়াল্লিশ। প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতিবিদ্ অথবা বিজ্ঞানী। এখনো সদস্যদলে আছেন :

করেজো, লুইনি মরেত্তো, মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ার এবং পারমাঙ্গিয়ানোর মতো চিত্রশিল্পী, গ্যালেলিও গ্যালিলির মতো বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী। প্রতি বৎসর সেন্ট 'লুক'-এর জন্মদিনে হয় বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব। দুটি বা তিনটি মহান শিল্পীকে 'সাম্মানিক সদস্য' উপাধি দেওয়া হয়। ফ্লোরেন্সে সেটাই কোনো শিল্পীর সবচেয়ে বড় সম্মান। ওখানকার 'অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ পেতে হলেও জোরালো সুপারিশ প্রয়োজন। তাকে দেখাতে হয় সার্থক শিল্পকর্ম। পেত্রো আন্তোনিও তা পেয়েছিল—অনেকদিন 'অ্যাসোসিয়েট মেম্বার' ছিল ও — এখন নাকি তার নাম কাটা গেছে। সে চাঁদা দেয়নি বলে। কেন চাঁদা দেয়নি? পেত্রোর মতে : ওটা 'আঁতেলদের আড্ডাদি।'

পরদিন সকালে আর্টিমিসিয়া তার সিদ্ধান্তটা পেত্রোকে জানিয়ে দিল :

—আজ আমি ওই আকাদেমিয়ায় যাব। দুপুরে। এখান থেকে হাঁটা পথে গেলে বর্গো পিন্ডির সিস্টার্শিয়ান মনাস্ট্রি হয়ে যাওয়াই তো সব চেয়ে শর্টকার্ট, নয়?

পেত্রো অবাক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বললে, 'চিত্রশালায় তো আজকে তোমাকে ঢুকতে দেবে না। সেটা সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে বছরে মাত্র একমাস : সেন্ট লুকের জন্মদিনের অপরাহ্ণ থেকে।

সেটা জানা ছিল আর্টিমিসিয়ার। সেন্ট লুক হচ্ছেন চিত্রশিল্পী আর ভাস্করদের 'পেট্রন সেন্ট'। তাঁর জন্মতারিখেই সকালের দিকে হয় বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব। দু-চারজন শিল্পীকে 'গ্র্যাজুয়েটশিপ' দেওয়া হয়—অর্থাৎ পূর্ণ সদস্যপদে বরণ করা হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর অপরাহ্ণে সংগ্রহশালার অনবদ্য প্রদর্শনী কক্ষটি — যাতে সযত্নে সুসজ্জিত বত্তিচেল্লি, লেঅনার্দো, রাফেল, তিজিয়ানো বা মিকেলাঞ্জেলোর বিশ্ববিশ্রুত শিল্পসম্ভার —তা জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আর্টিমিসিয়া সেসব কথা জানে। সে বলে, 'না। আমি প্রদর্শনী কক্ষে যাব না। কর্তৃপক্ষকে আমার আঁকা এই তিনখানি ছবি, দেখাব।'

—অ: দেখালে! যদি তাঁদের দেখবার সময় থাকে এবং মর্জি হয়। তারপর? এতটা পথ আবার ফিরে আসবে? ট্যাঙস ট্যাঙস করতে করতে?

আর্টিমিসিয়া বিরক্ত হল। কিছুটা আহতও। ওর নিস্পৃহতায়। বললে, 'হ্যাঁ, পায়ে-হেঁটেই তো আসতে হবে। আমাদের তো কোনো 'ব্রুহাম' বা 'হ্যানসম' নেই।'

পেত্রো একটু দম ধরে বললে, 'আমি তোমার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে চাই না, আর্টিমিসিয়া। কিন্তু তুমি যদি আশা করে থাক যে, ওরা তোমার কোনো ছবি কিনবে অথবা প্রদর্শনীকক্ষে সাজিয়ে রাখবে, তাহলে তোমাকে হতাশ হতেই হবে। মনটা সেইভাবে প্রস্তুত করে নিয়ে যেও।'

—আমি তা জানি। কিন্তু ছবিগুলিতে কী দোষ-ত্রুটি হয়েছে হয়তো তাঁরা তা আমাকে বলে দিতে পারবেন। আমি ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হতে পারব। সেটুকুই আমার লাভ।

—সে তো আমি সেদিন বলেই দিলাম তোমাকে।

—হ্যাঁ, তুমি বলেছ। অস্বীকার করছি না। আমি এবার আঁতেলদের মতামত একটু শুনতে চাই।

—অ! পেত্রো এ বিষয়ে আর কিছু বলল না।

কাল রাত্রের কিছু পাস্তা আর জুকিনি-ঝোল ছিল। পেত্রো কাজে বের হয়ে যাবার পর তাই গরম করে সকাল-সকাল মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিল। তার মধ্যদেশ স্ফীত হলে হয়তো আর সুযোগ হবে না। সে একবার মরণপণ পরীক্ষা করে দেখতে চায়। প্রকৃত শিল্প-সমাজদারেরা ওর এই প্রতিবাদী সৃষ্টিকে কী চোখে দেখেন। কোরাজ্জিওর ভাবধারায় 'চিরাসকিউরো' পদ্ধতিতে আঁকা নারী বিদ্রোহের স্বরূপটা।

ঝোলায় তিনখানি ছবি নিয়ে আর্টিমিসিয়া পথে নামে।

অনেকটা পথ। তা হোক। ও ধীরে ধীরে যাবে। একসময়ে সে এসে উপনীত হল আকাদেমির প্রধান তোরণদ্বারে। দারোয়ান ওকে একটি সাক্ষাৎকক্ষে বসতে অনুরোধ করল। দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি গদি-মোড়া খাড়াপিঠ কেদারা। ক্লান্ত দেহে গার্ভিনী নারীকে অনেক—অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল। এ ঘরের প্রাচীরেও কিছু চিত্র সাজানো, কিছু মিনিয়েচার ভাস্কর্যও। খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। কিন্তু বেচারি মনঃসংযম করতে পারছিল না। তার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছিল জীবনে আজ এই প্রথম প্রকৃত সমজদারের সম্মুখে তার শিল্পসাধনাকে মেলে ধরতে হবে। বাপির সুপারিশ এবার নেই। নিজের বক্তব্য নিজেকেই বুঝিয়ে বলতে হবে। পুরুষশাসিত শিল্পজগতে সে নারীজাতির প্রথম প্রতিবাদী সত্তা। তার সওয়াল, সে নিজেই করবে। আকপটে। স্পষ্টভাষায়।

—ইয়েস, সিনোরিনা?

চমকে ওঠে। চিন্তাজগত থেকে বাস্তবে ফিরে আসে। উঠে দাঁড়ায়। দেখে একজন স্থূলকায় সুসজ্জিত ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন ওর সামনে। আর্টিমিসিয়া সসম্ভ্রম 'বাও' করে বলে, 'আমার নাম : আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি। আমি রোমান। আমার বাবার নাম সিনর ওয়াজিও জেন্টিলেসচি। তিনিও রোমান শিল্পী। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি আপনাদের দু তিনটে তৈলচিত্র দেখাতে চাই।

—আহ্ ইয়েস। সিনোরিনা জেন্টিলেস্চি। আমি সিনর ওরাজিও জেন্টিলেসচির নাম শুনেছি। যদ্দূর মনে পড়ছে, তিনি ছিলেন মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ার আর কারাভাজ্জিওর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি শেষ দিন পর্যন্ত কারাভাজ্জিওর বন্ধু ছিলেন। আমিও তাঁকে জানতাম শেষ দিন পর্যন্ত।

—তাই বুঝি? কিন্তু কারাভাজ্জিওর সেই শেষের দিনটি ছিল ভয়ঙ্কর! আমার যদ্দুর মনে পড়ে কারাভাজ্জিওর অকালমৃত্যু হয়েছিল ছুরিকাঘাতে। একটি দেহব্যবসায়ী রূপোপজীবি নারীদেহের দখলদারীর দ্বন্দ্বে। এক সমাজবিরোধীর ছুরিকাঘাতে। আপনি বলছেন, তাঁকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন?

— আজ্ঞে না, মানে, আমি তো তখন বালিকামাত্র। ঘনিষ্ঠভাবে চিনব কি করে?

আর্টিমিসিয়া তার বান্ডিল বাঁধা ছবিগুলি টেবিলে নামিয়ে রাখে। তাতে কাজ হয়। আলোচনাটা কারাভাজ্জিওর কদর্য মৃত্যু থেকে তৈলচিত্রে প্রত্যাবর্তন করে।

বৃদ্ধটি প্রশ্ন করেন। কিন্তু একটা জিনিস আমি এখনো বুঝে উটতে পারিনি, সিনোরিনা। তোমার বাবা স্বয়ং উপস্থিত না হয়ে কেন কন্যার মাধ্যমে তাঁর আঁকা ছবিগুলি আমাদের দেখতে পাঠিয়েছেন?

—না, সিনর। ছবিগুলি আমার বাবার আঁকা নয়। আমার আঁকা। আমি নিজেও একজন চিত্রকর।

ভদ্রলোক স্পষ্টতই বিস্মিত হলেন। তাঁর ভ্রূযুগলে জাগল কুঞ্চন। আঘাতটা সামলে নিয়ে তিনি তৈলচিত্রগুলি সামনের টেবিলে একে-একে বিছিয়ে দিতে শুরু করেন।

তাঁর হয়তো কিছু ব্যস্ততা ছিল। হাতে সময় কম। একনজর ছবিগুলি দেখে নিয়েই তিনি ঝুঁকে পড়ে যেন আর কিছু দেখতে থাকেন। একটা আতশ কাচের সাহায্যে। কী দেখছেন উনি ছবির প্রান্তে?

তৈলচিত্রগুলি টান-টান করে মেলে ধরার প্রয়োজনে আর্টিমিসিয়া তৈলচিত্রর দু-প্রান্ত দু হাতে ধরে রেখেছিল —যাতে তা গুটিয়ে না যায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছবির কিছু অংশ খুঁটিয়ে দেখার অছিলায় আতশ কাচের সাহায্যে লক্ষ্য করছিলেন ওর আঙুলগুলো। আঙুলগুলির শেষপ্রান্তে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত চিহ্নগুলি।

ভুল! মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। ওর উচিত ছিল দু-হাতে গ্লাভস্ পরে আসা। অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নতুন জীবনে পদক্ষেপের প্রচেষ্টায়।

বৃদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, সিনোরিনা। আমি এখনি ফিরে আসব।'

তাই এলেন। এবার একলা নয়। তাঁর সঙ্গে এলেন আর একজন ক্ষীণকায় বৃদ্ধ। থ্রি-পিস সুট পরনে। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে চশমা। সম্ভ্রান্ত চেহারা। নবাগত এসেই বললেন, 'আমার নাম সিনর বন্দিচেল্লি। আমি এই আকাদেমির 'লুও গোতেনেন্তি (ভারপ্রাপ্ত সচিব)। আমার স্টুয়ার্ট বলল, আপনি নাকি খান কয়েক তেলরঙে -আঁকা ছবি আমাদের দেখাতে এনেছেন। কেন? আমরা দেখলে আপনার কী লাভ? কী চাইছেন আপনি?

আর্টিমিসিয়া দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে 'বাও' করল। বললে, 'আমি আকাদেমির 'অ্যাসোসিয়েট সদস্য' হতে ইচ্ছুক। তাই ছবিগুলি দেখাতে এনেছি।'

—এগুলি আপনার আঁকা? সম্পূর্ণ আপনার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ একখানি ছবিই খুঁটিয়ে দেখলেন। যেটি সবার উপরে ছিল — *জুডিথ ও হলোফার্নেস*।

তারপর খাড়া হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'লুক হিয়ার ইয়াং লেডি! যেসব মহিলা চিত্রকর পেশাগতভাবে প্রতিষ্ঠালাভে ইচ্ছুক তাঁরা অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুরুদের সমকক্ষ বা তাঁদের প্রতিভা অতিক্রমণে প্রয়াসী হন। নতুন কিছু চমক দিয়ে। এভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। চিত্রজগত সাধনার ধন, চমক দিয়ে কোনো লাভ নেই। এভাবে আকাদেমির শিক্ষার্থী-সদস্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। বিশেষত কোনো মহিলা শিল্পীর পক্ষে। আপনার জ্ঞাত্যর্থে জানাই — বর্তমানে আমাদের এই আকাদেমিতে কোনো মহিলা শিক্ষানবিশ নাই। সদস্য

থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েরা ধর্মগ্রন্থে 'ভিগ্‌নেট' আঁকে, রুমালে ফুল-লতা-পাতা সেলাই করে। তারা তৈলচিত্র আঁকে না। বিশেষত বিব্‌লিকাল ধর্মীয় বিষয়ে।'

— কেন সিনর? কোনো আইনগত বাধা আছে কি? শিল্পী হিসেবে এ রাজ্যে কোনো স্ত্রীলোকের প্রবেশ কি আপনাদের সংবিধানে নিষিদ্ধ?

— না, সংবিধানে বাধা নেই। তবে যোগ্যতার বিচারে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে বইকি। বাইবেলের কোনো উপকাহিনি বা ধর্মীয় কোনো বিষয়বস্তুতে একটা সীমারেখা মেনে চলা প্রাথমিক শর্ত। পূর্বাচার্যরা সেগুলি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা লঙ্ঘন করা চলবে না। আধুনিকতার অজু হাতে। অনেকে সেই পূর্বাচার্যদের লক্ষ্মণ গণ্ডী অতিক্রম করেন। একটা চমক দিতে সেটা নিকৃষ্ট আর্ট। ধাষ্টামো! তা আকাদেমি বরদাস্ত করে না।

আর্টিমিসিয়া ওঁকে পুনরায় একটি 'বাও' করে সবিনয়ে বলে, 'আপনি একজন আর্ট কনৌশার! এ নিয়ে আমি তর্ক করব না। শুধু একটি প্রশ্ন সিনর : মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনরত্তি সিনিয়ার যে *Risen Christ* মূর্তটি গড়েছিলেন সেই শিল্পকে আপনারা কী বলেন? তাঁর পূর্বাচার্যরা যীশুর অসংখ্য মূর্তি গড়েছিলেন। মিকেলাঞ্জেলো তাঁদের রীতি মেনে চলেননি। পাশ্চাত্য শিল্পে তিনি প্রথম গড়লেন : ক্রাইস্টের একটি ন্যূড। তাঁকে কী বলেন আপনারা? নিকৃষ্ট শিল্প? না ধাষ্টামো ?

বৃদ্ধ পুরো একটি মিনিট ওই অকালপক্ক অজ্ঞাত মহিলা শিল্পীটির দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন : 'আপনার সঙ্গে শিল্প-আলোচনার সময় আমার নেই, সিনোরিনা। এবার আপনি আসতে পারেন।'

মেয়েটি বহু-আয়াসে মিষ্ট হেসে বললে, 'ধন্যবাদ! আজ তাহলে আসি?'

বৃদ্ধ বললেন, 'আমি আপনাকে হতাশ করছি না। চেষ্টা চালিয়ে যান। হয়তো আবার কোথাও আমাদের দেখা হবে।'

আর্টিমিসিয়া চলতে শুরু করেছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমারও তাই বিশ্বাস! হয়তো এই আকাদেমি চত্বরেই আবার আমাদের দেখা হবে!

বৃদ্ধ ওর এ-কথায় কিছু তির্যক ধৃষ্টতা অনুভব করলেন। তাঁর ভ্রূকুঞ্চন হল।

ছবির বান্ডিল হাতে আবার পথে নামল আর্টিমিসিয়া।

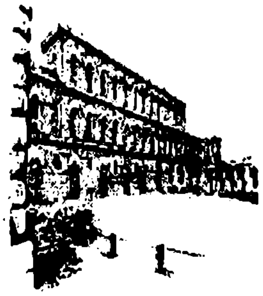

প্রায় দেড় বছর পরের কথা।

ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ গ্যালন জল নাচতে নাচতে বহে গেছে আর্নো দিয়ে। কিন্তু ফ্লোরেন্স-নগরীর জীবনযাত্রা অপরিবর্তিত। ছোট ছোট ছেলেরা তাপ্পিমারা প্যান্ট পরে একই ভাবে পাথর-মোড়া পথে হুটোপুটি করে; বৃদ্ধেরা পড়ন্ত বেলায় লাঠি-ঠুকঠুক সান্ধ্য ভ্রমণে বার হন। দোকানিরা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে, 'আজ কেমন আছেন দাদু? হাঁটুর ব্যথাটা ...., বুড়ো টপহ্যাট মাথা থেকে একটু উঁচু করে প্রত্যভিবাদন করেন। ফেরিওয়ালার দল ফুল-ফল আনাজ-রুটি বেচে। আর তরুণ-তরুণীরা তাদের 'ডেটিং' চালিয়ে যায়।

আর্টিমিসিয়ার জীবনে কিন্তু এসেছে একটা বিরাট পরিবর্তন। পেত্রো এখনও বারমুখি; বরং

আগের চেয়ে বেশি। সারাদিন কোথায়-কোথায় ঘোরে। অজুহাত : ছবি-আঁকা। বাস্তবে কতকগুলো বেকার বাউন্ডুলে বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটানো। কোনোদিন রাতে ফেরে, কোনোদিন তাও ফেরে না। ও বোধহয় বিয়ে করেছিল শুধু 'ডাওরি'টার লোভে। অথবা কে জানে, হয়তো একজন বিনা-মাহিনার পেটচুক্তি মজুরানির প্রয়োজনে। যে মেয়েটা দুবেলা দুমুঠি খাদ্যের লোভে ওর বাড়িতে থাকবে, খাটবে, ঘর দোর পরিষ্কার রাখবে, ব্রাশ ইজেল সাফা করবে। আর রাতে ওর বিছানায় উঠে শোবে। তা পেয়েছিল পেত্রো। কিন্তু তার যে এ ধরনের বাহানা হবে তা পেত্রো বুঝতে পারেনি।

এ জাতীয় দুর্ঘটনা তো হতেই পারে। নেহাৎ তা ঘটে গেলে নানান রকম ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা আছে। ওস্তাদ গুনিন কিছু শিকড়-বাকর দেয়। বেটে খেলেই খালাস! আর্টিমিসিয়া ভারি টেঁটিয়া! এই সহজপথটা তার পছন্দ হল না। ফলে ভুগছে এখন। দিন রাত চ্যাঁ-ভ্যাঁ! পেত্রো তাই পারতপক্ষে বাড়িতে থাকেই না। টো-টো কোম্পানির সদস্য হয়েছে।

আর্টিমিসিয়া ইদানীং রান্না করার সময় পায় না। একা হাতে বাচ্চা সামলাতেই তার দিন কাটে, রাত কাটে। ঠিক একা হাতে অবশ্য নয়। দোতলার গ্র্যানি বাচ্চাটাকে দারুণ ভালোবাসে। বাচ্চাটাকে স্নান করিয়ে দেয়। থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়ায়। বুড়ির নির্বান্ধব জীবনেও অনেক-অনেক দিন পরে এসেছে একটা পরিবর্তনের হাওয়া। ওর স্বামী ছিল সেনাদলে। বহুদিন আগেই সে আশ্রয় নিয়েছে সেন্ট হেলেনা চার্চ-সংলগ্ন সিমেটারিতে। ওর একটিই কন্যাসন্তান ছিল। ছিল কেন? আজও আছে। তবে বড় দূর দেশে। সাগরের ওপারে। নিজের সংসারে। তিনটি সন্তান। তার বড়ছেলেটা বহুদিন ছিল বুড়ি গ্র্যানির কাছে। এখন সেই আঁদ্রেও ডাগর হয়ে গেছে। দাদুর মতো সেনাদলে নাম লিখিয়ে কাঁহা-কাঁহা মুলুকে ঘুরছে। মাঝে-মাঝে সে দিদাকে কিছু পাঠায়। তাতেই বুড়ির সংসারটা চলে। তাছাড়া নীচের দুটি দোকানঘরের ভাড়াও আছে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও তার তিন-কামরার আবাসে ছিল কবরের নিস্তব্ধতা। আর্টিমিসিয়া সেই দুঃখটা এতদিনে দূর করেছে। ওর বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ি নতুন করে বাঁচার উপাদান খুঁজে পেয়েছে।

বাস্তবে দোতলা আর তিন তলার ফ্ল্যাট দুটোর মধ্যে এখন আর কোনো ফারাক নেই। বুড়ির তিনতলায় উঠতে কষ্ট হয়। আর্টিমিসিয়াই নিজের সদরদোরে তালা দিয়ে চৌপর দিন দোতলায় কাটিয়ে যায়। আজকাল সে বুড়ির পাকঘরেই রান্না করে। নিজের আর গ্র্যানির জন্য। পেত্রো যেদিন ঘটনাচক্রে এসে পড়ে সেদিন তিনজনের রান্না করতে হয়। পেত্রোর এতে আপত্তি নেই। কারণটা সহজবোধ্য। বাজারের খরচটা দেয় গ্র্যানি।

'অন্নপ্রাশন' উৎসব বলে ও দেশে কিছু নেই। থাকলে সেটা নির্ভর করত চুনুমুনুটার জন্মদিনের হিসাবে। ওদের যে উৎসবটা হয় তার নাম : ব্যাপটিজম। সেটা বছরের একটা চিহ্নিত তারিখে পঁচিশে মার্চ। ফ্লোরেন্সের পুরাতন ক্যালেন্ডারের হিসাবে সেটা বৎসরের প্রথম দিন। সারা শহরের সদ্যোজাত খোকাখুকুকে নিয়ে হাজির হয় তাদের বাবা-মা — উৎসবসজ্জায় সেজে। বিভিন্ন বয়সের। শুধু বাবা-মার নয়, খোকাখুকুরও। কেউ এগারো মাসের, কেউ এক।

ডুমোর বিপরীতে যে গির্জাটা সেখানেই হয় এই উৎসব। তাই গির্জাটার নামই হয়ে

গেছে 'ব্যাপটিস্ট্রি'। আটকোনা বাড়িটায় সেদিন খোকা-খুকুতে জমজমাট! পেত্রো এদিন কোনো উৎপাত করেনি। আর্টিমিসিয়ার নির্দেশ মতো উৎসবসাজে সেজে তার সন্তান ক্রোড়ে সামিল হয়েছে কিউ-তে। তার বাহুমূল ধরে পাশেই চলেছে আর্টিমিসিয়া। পায়ে পায়ে ওরা এগিয়ে গেল বিশপের দিকে। সাদা পোশাকে তিনি প্রত্যেকটি শিশুকে আশীর্বাদ করে শিশুর নগ্ন শরীরে জর্ডন নদীর জল ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন। অবগাহন স্নানই বিধেয়; কিন্তু 'জর্ডন' নদী ওখান থেকে অনেক দূরে। তাই জলসিঞ্চনই 'স্নানার্থে জর্ডনোদকং'-এর কানুন। ব্যাপটিজম্।

বৃদ্ধ পাদরির পাশে একটি টেবিল-চেয়ার পেতে বসেছিল একজন মাঝবয়সী। ব্যাপটিস্টির নকিব। টেবিলে পাতা আছে প্রকাণ্ড একটা জাবদা খাতা। তাতে পিতা-মাতার নাম লিখে তিনি বললেন, 'স্বাক্ষর করুন। অসুবিধা হলে বাঁ হাতের বুড়ো-আঙুলের টিপছাপও দিতে পারেন।'

ওরা কেউ নিরক্ষর নয়। একে-একে নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর দিল।

—জন্ম তারিখ?

—একুশে আগস্ট, ইয়ার অব দ্য লর্ড সিক্সটিন থার্টিন।

—পুত্র না কন্যা?

নিতান্ত বাহুল্য প্রশ্ন। বাচ্চাটা একটু আগেই নগ্নস্নান করেছে। এখনো চিল্লাচ্ছে। তবে এটাই নাকি কেতা। পিতা-মাতাকে স্বমুখে স্বীকার করতে হয়।

পেত্রো বললে, কন্যাসন্তান। ওর নাম...

নকিব ডান হাত তুলে বাধা দিলেন : না! আপনি নন, পুত্রের ক্ষেত্রে নামোচ্চারণ করবেন পিতা। কন্যার ক্ষেত্রে সে অধিকার মায়ের।

আর্টিমিসিয়া খুশি হল। এক পা এগিয়ে এসে সগর্বে বললে, ওর নাম 'আন্তিগোনে পাল্‌মিরা দ্য আর্টিমিসিয়া-পেত্রো জেন্টিলেসচি।'

পেত্রো বাধা দেয়। সংশোধন করে বলে, উঁহু! 'জেন্টিলেসচি' নয়। 'আন্তোনিয়ো'।

নকিবের ভ্রুকুঞ্চন হল। বলেন, 'এক কথা কতবার বলব? কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে সন্তানের নামোচ্চারণ করবেন তার গর্ভধারিণী।'

পেত্রো থতমত খেয়ে থেমে যায়।

ভিড়ের বাইরে এসে ধর্মপত্নীকে ধমক দেয় 'ওটা কী হল? তুমি জান না ওর উপাধি 'আন্তোনিয়ো?'

আর্টিমিসিয়া একগাল হেসে বললে, 'এক কথা কতবার শুনবে? মেয়ের বেলা তার নামকরণ করে বাচ্চার মা, বাবা নয়।'

পেত্রো আগুনঝরা দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা বটে! সন্তানের পিতার নাম তো মায়েই জানবে! বিশেষ, যার স্বামী সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে।'

আর্টিমিসিয়া মরমে মরে গেল।

তা হোক, তবু আর্টিমিসিয়ার যতগুলি তৈলচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে প্রতিটির তলায় স্বাক্ষর আছে: 'আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি' অথবা সংক্ষেপে 'এ.জি.' কোথাও 'আন্তোনিয়ো' নয়।

বোধকরি ও সারাজীবনে ভুলতে পারেনি যে, তার বিবাহটা ছিল — 'ম্যারেজ অব কন্‌ভিনিয়েন্স', বাধ্যতামূলক 'উদ্বন্ধন'!

বাচ্চাটাকে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়িয়ে গ্র্যানি জানতে চায়, 'হ্যাঁরে আর্তি, হপ্তায় তিনচার দিন দেখি তোর মরদ রাতে বাড়ি ফেরে না। কোন্ চুলোয় রাত কাটায় ও হতভাগা?'

'আর্তি।'

এ-নামে এককালে ওকে ডাকতেন মাদার মার্গারেটা। তারপর কেউ তাকে ও নামে ডাকেনি। গ্র্যানির এই মিষ্টি ডাকটা ও ভারী উপভোগ করে।

—কী রে? তুই যে কিছু জবাব দিলিনে?

—আমি জানি না, দিদা। কী জবাব দেব?

— এ তো বড় আজব কথা! মরদটা কোথায় রাতকাটায় তার পাত্তা রাখে না ঘরওয়ালি? এতটা বাঁধনছাড়া হতে দিচ্ছিস্ কেন?

—তুমি তো জান, দিদা। ও কেন আমাকে বিয়ে করেছে। ওর প্রয়োজন ছিল বিনা মাহিনার একজন পরিচারিকা। যে বাড়ির সব কাজ করবে। রাতে ওর বিছানায় শুতেও যে আপত্তি করবে না।

গ্র্যানির একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। একটু থেমে আবার প্রশ্ন করে, 'সে তো ওর কথা। তুই কেন ওকে 'বে' করলি?'

আর্টিমিসিয়া তার ডানহাতখানা বাড়িয়ে ধরল। ম্লান হেসে বললে, 'এই জন্যে। তুমি এতদিন লক্ষ্য করনি?'

বুড়ি বললে, 'করেছি। ওগুলো কিসের দাগ তা বুঝে উঠতে পারিনি। কোনো দুর্ঘটনা হয়েছিল ধরে নিয়েছি। কিসের দাগ এগুলো?

—সিবিল।

—সিবিল? তার মানে?

ও বুঝিয়ে বলে 'সিবিল' শব্দটার অর্থ। কীভাবে ওর ডানহাতে এই কলঙ্কচিহ্নগুলি এঁকে দেওয়া হয়েছে। কী তার তাৎপর্য।

বুড়ি অবাক হয়ে যায়। বলে, 'হাকিম তোকে দিয়ে কী স্বীকার করিয়ে নিতে চেয়েছিল?'

— সে কথা জানতে চেও না, দিদা। শুধু আমার এই কথাটা বিশ্বাস কর : যে কথাটা আমাকে দিয়ে ওরা স্বীকার করিয়ে নিতে চেয়েছিল সে পাপ আমি করিনি। স্বীকারও করিনি তাই।

বুড়ি আর কিছু জানতে চাইল না।

এবার আর্টিমিসিয়াই প্রশ্ন করে, 'তুমি পেত্রোকে কতদিন ধরে জান?'

—ও যখন এই 'পাল্‌মিরার' মতো ছোট্টটি। ওরমা ওই তিনতলার ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিল। এখানেই পেত্রো জন্মায়। আমার মেয়ে মারিয়ার বয়স তখন পাঁচ। ও আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে।

— ছেলেবেলায় ও কেমন ছিল? এই রকম উড়নচণ্ডি?

— হ্যাঁ, তাই ছিল সে। পড়াশুনায় মন ছিল না। ওর মা যখন মারা যায় তখন ওর বয়স সাত-আট। আমার কাছেই ও বড় হয়েছে মানুষ হয়েছে । না, ওকে মানুষ করতে পারিনি। চিরটাকালই ও উড়নচণ্ডি! ছবি আঁকার বাতিক, পথে পথে ছবি এঁকে বেড়াত। কতকগুলো বাউন্ডুলে বন্ধুও জুটে গেল। মারিয়ার যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন ওর বয়স ষোল-সতেরো। তখন থেকেই ও আমার শাসনের বাইরে।

— তোমাকে ও মাস-মাস কত ভাড়া দেয়?

—ওমা! ভাড়া আবার কে কাকে দেয়? পেত্রোর মা মাস-মাস ভাড়া দিত। কিন্তু অতটুকু বাচ্চার কাছে কি আমি ভাড়া নিতে পারি?

—বাঃ! এখন তো সে আর বাচ্চাটি নেই। এখন কেন দেয় না?

—কীই ওর রোজগার? দৈনিক তিন বালতি জল তুলে দিত। এটাই ওর বাড়িভাড়া। তা সে কাজটাও তো এখন তোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

আর্টিমিসিয়া চুপ করে যায়। কথাটা মিথ্যা নয়। ও এ বাড়িতে আসার পর পেত্রো জল-তুলে দেবার দায়িত্বটাও 'পেটচুক্তি' ঘরওয়ালির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। এখন অবশ্য আর্টিমিসিয়াকে আর সে কাজ করতে হয় না। বাচ্চা পেটে আসার পর থেকে গ্র্যানিই ওকে বাধা দেয়। জলটা এখন বহে নিয়ে আসে রোমানো — একতলার দোকানি পপালিনোর সহকারী। আর্টিমিসিয়ার চেয়ে বছর দু-তিনের ছোটই হবে হয়তো।

গ্র্যানি ঘরের টুকিটাকি কাজ সারতে সারতে আপন মনেই বলে চলে, 'তখনও ও মদের নেশাটা ধরেনি। এক আধ দিন গিলতো, তবে এমন মাতলামি করত না। সেটা শুরু হল ওর বউ মরে যাবার পর।'

—বউ! মানে? কার বউ?

— পেত্রোর। আবার কার? কেন, তুই জানতিস্ না? ও যখন তোকে বে করতে যায় তখন বলেনি যে, ও 'উইডোয়ার'?

আর্টিমিসিয়া রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। কী আশ্চর্য! এতবড় কথাটা পেত্রো এতদিন গোপন রেখেছে! একদিন ও জানতে চেয়েছিল এতদিন পেত্রো কেন বিয়ে করেনি। চট্‌জলদি জবাব দিয়েছিল পেত্রো 'নিজেরই আহার জোটে না, বউ পুষবার সাহস হবে কী করে?' এখন গ্র্যানির কাছে জানতে চায় কতদিন আগে ওর প্রথম স্ত্রী মারা যায়?

—তা বছর পাঁচ-সাত হবে। তখন আদ্রেঁর বয়সই তো বছর ন-দশ!

—ওর প্রথমপক্ষে কোনো সন্তানাদি হয়নি?

বুড়ি জবাব দিল না।

—কী হল দিদা? জবাব দিলে না যে?

বুড়ি দম ধরে শুধু বললে, না!

—কী অসুখে মারা গেল ওর বউ?

গ্র্যানি বড় বিহ্বল হয়ে পড়ল। ইতস্তত করে বললে 'থাক না ওসব কথা। পেত্রোকে তুই যেন কিছু বলিস্ না এসব কথা। তা হলে ও আমাকে একেরে খুন করে ফেলবে।'

আর্টিমিসিয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক দিদা। এসব কথা আমি ওকে কিছুই বলব না। আমার কী দরকার ওর অতীত জীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার? এতদিনে বুঝতে পারলাম — ও কেন আমাকে এমন আড়াল করে রাখে? কেন ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশতে দেয় না। কী বোকা পেত্রোটা! আমি জানলেই বা কী ক্ষতি হত ওর? আমি তো নিরুপায় হয়ে ওর ঘর করতে এসেছি। ও দোজবরে হলেই বা কী। তেজবরে হলেই বা কী?

বুড়ি ওর হাত দুটি ধরে বললে, 'লক্ষ্মী দিদি! পেত্রো যেন না জানতে পারে আমার কাছ থেকেই এ সব কথা তুই জেনেছিস। ওর যা চণ্ডালে রাগ! হয় তো খুনই করে বসবে আমাকে।

—আমি তো আগেই বলেছি, দিদা। এসব কথা ওর সঙ্গে আদৌ আলোচনা করব না। কিন্তু ওর 'চণ্ডালে রাগ' তো আমি কোনোদিন দেখিনি। বার বার ও কথা বলছ কেন?

বুড়ি কী যেন লুকোবার চেষ্টা করছে। বলে, 'না, আমিও তো কিছু নিজের চোখে দেখিনি। ওসব হয়তো মিছে কথা। থাক রে দিদি। পেত্রোর কথা থাক।'

আর্টিমিসিয়া হেসে বলল, 'প্রসঙ্গটা কিন্তু তো তুমিই তুলেছিলে, দিদা। ঠিক আছে। আমরা বরং অন্য কথা বলি। আজ কী রান্না হবে বল?

কদিন পরে ও ডাকে একসঙ্গে দুখানা চিঠি পেল। সে আমলে ইতালির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চিঠি যেতে একমাসের চেয়ে বেশি সময় লাগতো। একটি চিঠি এসেছে জেনোয়া থেকে, একটি রোম থেকে। জেনোয়াতে আর্টিমিসিয়ার পরিচিত কেউ নেই। রোমে আছে ওরাজিও। পাল্‌মির জন্ম সংবাদ দিয়ে বাবাকে একটি চিঠি লিখেছিল। আশা হল এটা তারই জবাব। আগে সেটাই খুলে ফেলে। না, ওরাজিও নয়। লিখেছেন মাদার মার্গারেটা

—আর্তি-মা,

অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি। বড় জানতে ইচ্ছে করে তোমার জীবন কেমন কাটছে। আমি কখনো ফ্লোরেন্সে যাইনি। তাই আরও কৌতূহল হয়। তোমার চোখ দিয়ে ফ্লোরেন্সের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাই। সময়মতো আমাকে সব কিছু জানিও, ওখানকার প্রতিটি গির্জা, প্রতিটি সংগ্রহশালা, প্রতিটি ভাস্কর্য। তুমি কি আমাদের গির্জায় কোনোদিন গিয়েছ — ফ্লোরেন্সের 'সান্তা ত্রিনিতা দেই মন্তি' গির্জায়?

নতুন কী ছবি আঁকলে? যার সঙ্গে ঘর করছ আশা করি সে তোমাকে ঈশ্বরবিচ্যুত করতে পারেনি। ভুলে যেও না — তোমার উপাসনার উপাদান রঙ-তুলি ক্যানভাস। ভুলে যেও না - করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন দুর্লভ অঙ্কন-প্রতিভা। মন যখন বিষণ্ণ হয়ে পড়বে তখন রঙে আর রেখায় মনকে পূত-প্রফুল্ল করে তুলবে।

তোমাকে প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাই। যীসাস্ তোমাকে শক্তি দিন।

ইতি

মারী চরণাশ্রিতা

মাদার মার্গারিটা।

চিঠিখানি পড়তে পড়তে ওর দু-চোখ জলে ভরে এল। মনে পড়ে গেল, গত দেড় বছর সে রঙ-তুলি-ক্যানভাসে হাত দেয়নি। এমনকি ওর স্কেচ বুকেও পড়েনি চারকোলের কোনো

আঁচড়! চিত্রশিল্প থেকে নিজের অজান্তেই সে দূরে সরে গেছে। ওর সমস্ত সত্তায় এখন জড়িয়ে আছে ছোট্ট পাল্‌মিরা। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? এ দুনিয়ায় তার কী ভূমিকা? সে শিল্পী, না মা? কোন্ সত্তার অগ্রাধিকার?

অন্যমনস্কের মতো এবার খুলে ফেলে দ্বিতীয় লেফাফাখানা। যেটা জেনোয়া থেকে এসেছে। কী আশ্চর্য! সেটাই ওরাজিওর চিঠি। বাপি লিখেছে:

—মা-মণি,

তোর চিঠিখানি অনেক-অনেক দিন পরে হাতে এল। ওদের দোষ নেই। তোর চিঠিখানা যখন রোমে এসে পৌঁছায় তার আগেই একটা বায়না পেয়ে আমি আর তাসী বার হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি জেনোয়াতে চলে এসেছি। এখানে একজন ধনকুবেরের প্রমোদভবনে সিলিঙ আঁকছি দুজনে। রোকোকো-শৈলীতে ফুল-লতা-পাতা — বাক্কাস , আফ্রোদিতে, ফন, প্যান—এইসব।

পাল্‌মিরার আগমন সংবাদে দারুণ খুশি হয়েছি। দু-চোখ বুঁজলে তাকে দেখতে পাই। ঠিক তুই যেমনটি ছিলি ওই বয়সে। গাবলু-গুবলু দুটো গাল, ছোট-ছোট হাত-পায়ের আঙুল, মাথায় টাকা-টাকা চুল! দাদুর হয়ে ওকে একটা হামি দিস্।

পেত্রো ছেলেটা ভালোই, কী বলিস? তোর যত্ন-আত্তি করে তো? একটা কথা মা-মণি! মিকেলাঞ্জেলো বুওনোরত্তি জুনিয়ারের চিঠিতে জানতে পারলাম তুই তার সঙ্গে এতদিনেও দেখা করিসনি। কেন রে? তোকে তো বলেছিলাম — কোরোজ্জিও, মিকেলাঞ্জলো আর আমি — আমরা তিনজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। মিকেল হচ্ছে— তুই হয় তো জানিস — মহান শিল্পী মিকেলাঞ্জেলোর ভাই পো।

সে এখন তাঁর উত্তরাধিকারী 'মেৎর'-এর প্রাসাদেই থাকে। পত্রপাঠ তার সঙ্গে দেখা করবি। সে তার প্রাসাদের সবকিছু তোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে — মেৎর মিকেলাঞ্জেলোর অদ্ভুত সব সৃষ্টি। নতুন কী আঁকলি? মনে রাখিস্ তোর জীবনের স্বপ্ন — তোর ব্যর্থ বাপিরও — ওই আকাদেমিয়ায় তোর একখানা ছবি টাঙানো! বাপির উপর রাগ করে রঙ-তুলিকে ত্যাগ করিস্ না, মা! যীসাস্ তোর মঙ্গল করুণ ইতি-

বাপি (ওয়াজিও জেন্টিলেসচি)

'নতুন কী আঁকলি?' —'বাপির উপর রাগ করে রঙতুলিকে ত্যাগ করিস্ না, মা!'

ঝর ঝর করে আবার কেঁদে ফেলে আর্টিমিসিয়া। রঙতুলিকে অনেক অনেক দিন আগেই সে ত্যাগ করে বসে আছে। গত দু-বছরে সে একবারও রঙ-তুলি-ঈজেল নিয়ে বসেনি। 'ঘরণী' হিসাবে সে ব্যর্থ; 'মা' হিসাবে যাতে না হয় এটাই সে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে দু-বছর ধরে। অথচ অনেক-অনেক দূরে বসে আছেন তার শুভানুধ্যায়ীরা। তাঁরা এখনো আশা ত্যাগ করেননি। সবাই জানতে চায় — 'নতুন কী আঁকলি?'

ভেবেছিল—সে প্রত্যাখ্যাতা। শিল্পের জগতে ওরা তাকে প্রবেশ করতে দেবে না। প্রথমত সেনারী - পুরুষ নয়; দ্বিতীয়ত, সে প্রচলিত পথে চলতে অস্বীকার করেছে — সে বিদ্রোহিণী!

পরদিন পেত্রো এল। আর্টিমিসিয়া জানতে চায়, 'মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ার এ শহরে কোথায় থাকেন জানো?'

পেত্রো একইভাবে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রতিপ্রশ্ন করে, 'কেন বলতো? তাঁকে মুরুব্বি পাকড়েআর একবার আকাদেমিয়াতে নাক গলাতে চাও? শোন আর্টিমিসিয়া! ওভাবে হবে না। হয় না!

দাঁতে দাঁত দিয়ে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখল। ঘরের মানুষটাই তাকে কোনো পাত্তা দেয় না। বাইরের মানুষ কী দেবে? বলে,'মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ার আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

— ছিলেন। দশ-পনেরো বছর আগে। এখন তিনি সিনর জেন্টেলেসচিকে চিনতেই পারবেন না। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখাই করতে পারবে না। বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে তাঁর সেক্রেটারি তোমাকে তাঁর প্রাসাদে নাক গলাতেই দেবে না। বুঝেছ?

— বেশ তো, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই যাব। তাঁকে চিঠিতে লিখব তাঁর সাক্ষাৎ পেতে চাই। তিনি যদি না ডেকে পাঠান তো যাব না। তাই তো জানতে চাইছি, তিনি শহরের কোন অঞ্চলে থাকেন।

পেত্রো বিরক্ত বোধ করে। বলে, 'তুমি বড় অবুঝ। তিনি যদি তোমাকে চিনতেই না পারেন তাহলে দেখা করতে দেবেন কেন?'

— চেষ্টা করে দেখতাম। আমি তো এ জাতীয় চিঠি কখনো লিখিনি। তুমি আমাকে একটা ড্রাফ্‌ট্‌ করে দেবে?

—সর্বনাশ! আমার দ্বারা ওসব কাজ হবে না। আঁতেলরা কী ভাষায় চিঠি লেখে তা আমি জানিই না। তাঁদের চিরকাল দূর থেকে নমস্কার করেছি — শতহস্তেন আঁতেলানাম্‌!

আর্টিমিসিয়া ভিন্ন পথ ধরল। নীচেকার দোকানঘরের ওই ছেলেটা, রোমানোকে প্রশ্ন করল। সে বললে, 'বলেন কি সিনোরা? তাঁর বাড়ি চেনে না এমন মানুষ গোটা ফ্লোরেন্স শহরে আপনি খুঁজে পাবেন না। 'বুওনোরত্তি হোম' হচ্ছে ভিয়া ঘিবেলিনা -প্লাজার পাশেই! কেন জানতে চাইছেন, সিনোরা?'

—মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ার আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁকে আমি একখানি চিঠি লিখতে চাই। তুমি সেটা পৌঁছে দেবে?

—এ আর শক্ত কী কাজ? লিখে দিন। ও বাড়ির ভিতর আমি কখনো যাইনি। এবারও যেতে হবে না। গেটের পাশে প্রকাণ্ড একটা ডাকবাক্স আছে; তাতে চিঠিখানা ফেলে দিলেই তিনি পেয়ে যাবেন।

তিনচার বার মুশাবিদা করে ছোট্ট একটি চিঠি লিখে ফেলল। সহজ সরল ভাষায়।

মহিমার্ণবেষু

আমার নাম আর্টিমিসিয়া। আপনি আমাকে চেনেন না। তবে বাবার (ওরাজিও জেন্টেলেসচি) কাছে শুনেছি যে, আপনারা দুজন এককালে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। যখন আপনি রোমে থাকতেন। দশ-পনের বছর আগে। আপনি, আর মিকেলাঞ্জেলো কোরেজ্জিও।

আমি এখন এই শহরে থাকি। আমার স্বামী ফ্লোরেন্সেরই বাসিন্দা। আমি ছবি আঁকি। বাবার কাছে শিখেছি। তাই আমার ইচ্ছা আপনার জগৎবিখ্যাত খুড়ামশায়ের যেসব শিল্পকীর্তি আপনাদের প্রাসাদে আাছে সেগুলি স্বচক্ষে দেখা। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে কি সেই অনুমতি দেবেন?

বিনয়াবনত্র

আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি।

চিঠিখানা পাঠিয়ে দেবার পরই ওর মনে হল, কাজটা ঠিক হয়নি। বড় ছেলেমানুষী হয়ে গেছে। অতবড় মানুষটাকে কি ওই ভাষায় চিঠি লিখতে হয়? যেন খুড়ো - জ্যাঠাকে লিখছে! আচ্ছা, চিঠির কোণায় ওর নিজের বাড়ির ঠিকানাটা লিখেছে তো? না হলে তিনি জবাব দেবেন কোন ঠিকানায়?

ওর সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল পরদিন সকালেই। ওরা দুজন তখন প্রাতরাশে বসেছে। হঠাৎ ডোরবেল বাজল। পেত্রো উঠে গিয়ে সদর খুলে দিয়ে দেখে তক্‌মা-সাঁটা একজন সংবাদবহ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ছেলেটা পেত্রোকে অভিবাদন করে বললে, 'সিনোরা আর্টিমেসিয়া জেন্টিলেসচি কি বাড়িতে আছেন?'

—কেন বলতো হে? তার সঙ্গে তোমার কী দরকার?

—তাঁর একখানা চিঠি আছে। ডেলিভারি দেব।

— ও আচ্ছা। আমাকেই দিতে পার। দাও!

—সরি, স্যার! আমার উপর নির্দেশ আছে চিঠিখানা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেবার। তিনি যদি না থাকেন....

আর্টিমিসিয়া চট করে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। আত্মপরিচয় দিয়ে বলে, 'আমাকে দাও। আমিই আর্টিমিসিয়া জেন্টেলেসচি।'

পুনরায় অভিবাদন করে সংবাদবহ সীল করা চিঠিখানি ওর হাতে দিয়ে তার পিওন বইতে স্বাক্ষর নিল। বললে, 'আমার উপর নির্দেশ আছে, মাদাম আপনি মৌখিকভাবে আমাকে জানিয়ে দেবেন,আপনি কাল আসতে পারবেন কি না।'

পেত্রো আগবাড়িয়ে বলে, 'তোমাকে এত এত নির্দেশ কে দিয়েছেন হে?'

ছেলেটি জবাব দেবার আগেই আর্টিমিসিয়া চিঠিখানা লেফাফা খুলে বার করেছে। পেত্রোকে বললে, 'ও আসছে আঙ্কল মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ারের কাছ থেকে। তুমি টেবিলে গিয়ে বস। আমি দেখছি।'

ছোট্ট দু'লাইনের চিঠি:

'মাই ডিয়ার আর্টিমিসিয়া।'

'কাল সকাল সাড়ে আটটার সময় আমার গাড়ি যাবে। তোমরা দুজন আমার সঙ্গে প্রাতরাশে বসবে। তখন অন্যান্য কথা হবে। তোমার আঁকা কিছু ছবি নিয়ে এস। তোমার স্বামীর নামটা জানা না থাকায় তাকে পৃথক নিমন্ত্রণ পত্র দিতে পারলাম না। তাকেও সঙ্গে নিয়ে এস।

অপেক্ষারত তোমার আঙ্কল

মিকেলাঞ্জেলো, জুনিয়ার।—

আর্টিমিসিয়া সংবাদবহকে অপেক্ষা করতে বলে ফিরে আসে প্রতিরাশ টেবিলে। চিঠিখানা পেত্রোর নাকের ডগায় মেলে ধরে বলে, 'আমি যাব। তুমিও কি আসবে?'

পেত্রোর মুখটা থম্ থম্ করছে। বলে, 'না, সরি। আমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

আর্টিমিসিয়া পেত্রোর অভ্যস্ত ডায়ালগে শুধু বলল : অ।

নির্বিকারভাবে দোরগোড়ায় ফিরে এসে সেই সংবাদবহকে বললে, 'ওঁকে বলে দিও, কাল সকালে আমি একাই যাব। আমার স্বামীর কী একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। যেতে পারবেন না।'

ছেলেটি সসম্ভ্রম অভিবাদন করে চলে গেল।

আর্টিমিসিয়া ফিরে এল টেবিলে। যেন কিছুই হয়নি সেইভাবে জানতে চায়, 'তুমি কি আরো একটু কফি নেবে? এখনো বেশ গরম আছে।'

খালি কাপটা টেবিলে ঠক্ করে নামিয়ে দিয়ে পেত্রো বললে, 'না।'

নিজের কাপে আর একটু কফি ঢালতে ঢালতে আর্টিমিসিয়া বলে, 'আঁতেলদের চিঠির ভাষা কিন্তু বেশ সহজ সরল। তাই না?'

পেত্রো টেবিল ছেড়ে উঠে চলে যায়। জবাব দেয় না।

মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ার বসেছিলেন তাঁর স্টাডিতে। কীসব কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিলেন। অর্ডারলি আর্টিমিসিয়াকে নিয়ে দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতেই ভদ্রলোক একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে এস, এস, এস। এতদিন হল তুমি ফ্লোরেন্সে আছ, আগে যোগাযোগ করনি কেন? আমার ঠিকানা জানতে না?'

আর্টিমিসিয়া একটি সসম্ভ্রম 'বাও' করে সত্যকথাই বলে, 'সাহস হয়নি, য়োর লর্ডশিপ।'

— না, না, ওসব ফর্মালিটি নয় — স্রেফ 'আঙ্কল'। তুমি ওরাজিওর মেয়ে! আমার ভাইঝি। এস, বস ওই চেয়ারটায়। তোমার আঁকা ছবি কিছু সঙ্গে করে এনেছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুটি অয়েল -কালার। অনেক দিন আঁকি না।

— কেন? অসুবিধাটা কোথায়? কই দেখি তোমার ছবি?

আর্টিমিসিয়া সসঙ্কোচে তার গোটানো ছবি দু খানি ঝোলা ব্যাগ থেকে বার করে দিল। মিকেলাঞ্জেলো সোৎসাহে ক্যানভাস দুটি গ্রহণ করে প্রথমখানি তাঁর প্রকাণ্ড টেবিলে বিছিয়ে দিলেন : সুসান্না।

আর্টিমিসিয়া আজ আর ভুল করেনি। গ্লাভস্ পরে এসেছিল। সে চেপে ধরল তৈলচিত্রের দুপ্রান্ত। গৃহস্বামী তাঁর দু-হাতে চেপে ধরলেন অপর প্রান্ত দুটি। খুব নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তিনি দেখতে থাকেন ছবিখানা। কোনো কথা বললেন না। আর্টিমিসিয়ার হৃদপিণ্ডটা যেন বুকের পাঁজরায় ধাক্কা মারতে থাকে। অনেকক্ষণ দেখে তিনি মুখ তুলে বললেন, 'তোমার অঙ্কন পদ্ধতি তো বটেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি।'

আর্টিমিসিয়া কোনও কথা বলতে পারে না

—প্রথম কথা, তুমি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কোনো ন্যুড আঁকনি। সুসন্নার উপকাহিনিতে হোলি বাইবেল যা বলতে চেয়েছেন তুমি সেটাকেই [illegible] দিয়েছ। সুসন্নার প্রতিবাদ! ওর উৎক্ষিপ্ত দুই বাহুতে তার সোচ্চার প্রকাশ। ভাল কথা, তুমি কি একই বিষয়বস্তুতে-আঁকা তিন্তোরেত্তোর অয়েল-পেন্টিংটা দেখেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছি।

—আমি মহান তিন্তোরেত্তোকে খাটো করতে চাই না; কিন্তু তাঁর অনবদ্য ন্যুডটি আমার পছন্দ হয়নি। তোমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির এই প্রভেদটা কেন হয়েছে আন্দাজ করতে পার?

আর্টিমেসিয়া জবাব দিল না। সে শুধু শুনতে চায়। সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ধরে। —যেহেতু দুজন চিত্রকরের একজন পুরুষ অপরজন নারী। তিন্তোরেত্তো বাইবেলকে মূলধন করে একটি 'ন্যুড' আঁকার লোভ সামলাতে পারেননি। কিন্তু 'দ্য হোলি বাইবেলের' উদ্দেশ্যটা সেখানে হারিয়ে গিয়েছিল। সুসন্নার নগ্ন-সৌন্দর্য নয়— এ উপকাহিনির মর্মকথা: সুসন্নার পাতিব্রত্য, তার আদর্শনিষ্ঠা, তার ঈশ্বরনির্ভরতা!

আর্টিমিসিয়া নির্বাক শ্রোতা। যেন তার অন্তরের কথাই উনি বলে চলেছেন!

ও প্রশ্ন করে, এবার কি দ্বিতীয়খানা দেখবেন?

—না। এখানিকে আরও কিছুক্ষণ দেখি। এটি দুর্দান্ত ছবি! তুমি কি এটা বিক্রয় করতে স্বীকৃত? রাজি থাকলে, কী তোমার প্রত্যাশা?

আর্টিমিসিয়া প্রতিপ্রশ্ন করে, বিক্রয় নিশ্চয়ই করতে চাই। কিন্তু ক্রেতা কে, না জানলে আমার প্রত্যাশার কথা কেমন করে বলি, আঙ্কল?

—আমি নিজেই নেব। এবার বল?

আর্টিমিসিয়া তৎক্ষণাৎ বলে, আমি স্বীকৃত। কিন্তু এক শর্তে।

—শর্ত! কী শর্ত?

—আপনি আজ আমাকে যা দিলেন তা আমি সারা জীবনে কখনো পাইনি। আমার শর্তটা এই : আমার এই ছবিখানি আপনাকে আমি উপহার দিতে চাই। আপনি আমার আঙ্কল। আপনাকে কি আমার ছবি বেচতে পারি? আপনি এটা গ্রহণ করলেই আমি ধন্য।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়েন। বলেন, 'মেনে নিলাম তোমার শর্ত। ছবিখানা আমি রাখছি। দাম দেব না— কিন্তু আঙ্কলের কাছ থেকে তুমি কিছু উপহার নিতে নিশ্চয় আপত্তি করবে না। সেটা যথাসময়ে আমি দেব। আপাতত ছবিটা ফ্রেমিং করতে পাঠাই।'

আর্দালির মাধ্যমে তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠালেন! জনান্তিকে তাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে আবার ফিরে এলেন টেবিলে।

আর্টিমিসিয়া বলে, 'এবার তাহলে দ্বিতীয় ছবিটা পেতে দেখাই?'

—না। সেটা প্রাতরাশের পরে। পর পর ছবি দেখলে তাদের কোনো ছাপ মনে স্থায়ী হয় না। তাদের অমর্যাদা করা হয়।

প্রাতরাশের আয়োজন যথেষ্ট কিন্তু অহৈতুকী আড়ম্বর নেই। বোধকরি উচ্চবিত্তের মানুষ এ জাতীয় প্রাতরাশেই অভ্যস্ত। এতক্ষণে ও বুঝে নিয়েছে ওর 'আঙ্কল' এ বিরাট প্রাসাদে একাই থাকেন। কোনো 'খুড়িমা' নেই। উনি চিরকুমার কি বিপত্নীক বুঝে উঠতে পারে না।

জোড়া পোচ, টোস্ট আর বেকন শেষ করে ফলের থালাটা টেনে নিল আর্টিমিসিয়া। একটা আপেল কাটতে কাটতে বলে, আপনি এখন থেকে কী ভাবছেন বলুন তো?

—উঁ? হ্যাঁ, ভাবছি।

—কী? আমার ওই ছবিখানার কথা?

—না। পরবর্তী না-দেখা ছবিটার কথা। সেটা কী হতে পারে? স্টিল-লাইফ, নিসর্গ চিত্র না প্রতিকৃতি?

—তিনটের একটাও নয়। ওটাও 'বিব্লিকাল থীমে'।

—তাই বুঝি? কী ক্যাপশান?

—এখন বলব না, আঙ্কল। খাবার টেবিলে ও আলোচনা থাক। ওটা বীভৎস-রসের চিত্র।

—বীভৎস-রস! অথচ বিব্লিকাল থীম?

— ও প্রসঙ্গ থাক এখন।

—থাক তবে।

প্রাতরাশান্তে দ্বিতীয় ছবিখানাও দেখলেন। অনেকক্ষণ ধরে। তাঁর কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে। আর্টিমিসিয়া ছবির বিষয়বস্তুর কথা বলেনি। উনি নিজে থেকেই প্রশ্ন করেন, 'জার্মান আর্টিস্ট ক্রানাচ-এর আঁকা ছবিটা তুমি দেখেছ?'

— কোন ছবিটা?

— যেটা এঁকেছ তুমি : *জুডিথ কর্তৃক হলোফার্নেস বধ?*

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছি।

—তাহলে কংগ্রাচুলেসন্স্! ক্রানাচ যে ভুল করেছিলেন তুমি তা করনি। ক্রানাচ-এর জুডিথ যেন প্রতিকৃতি আঁকাতে ওঁর স্টুডিওতে এসেছে। তার তরোয়ালে একফোঁটা রক্তের দাগ নেই! সদ্যসমাপ্ত মর্মান্তিক নাটকীয় ঘটনার আভাস মাত্র নেই সে শিল্পকর্মে!

আর্টিমিসিয়া কোনো কথা বলে না। উনি বলেই চলেন, তোমার কম্পোজিশান একটি নাটকীয় ত্রিকোণ — 'পিরামিডাল ট্রায়াঙ্গেল'। দুটি রমণীর মাথা আর মৃতব্যক্তির বাঁ-হাঁটু সেই ত্রিকোণের তিনটি শীর্ষবিন্দু। কোরেজ্জিওর আলোছায়ার বৈপরীত্য — 'চিরাস্‌কিউরো' নিখুঁত। নাটকীয়তা সার্থক হয়ে উঠেছে তোমার শিল্পে — ম্যাগ্‌নিফিক্‌!'

আর্টিমিসিয়া এবারও কিছু বলতে পারে না। আঙ্কল যেন শিল্পের মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। শিল্পী আর সমাজদার যেন একই সমতলে এসে দাঁড়িয়েছেন। কৃতার্থ হয়ে গেল শিল্পী!

—তুমি কি এই ছবিখানিও বিক্রয় করতে ইচ্ছুক?

—নিশ্চই। সব আর্টিস্টই তো তাই চায়।

—আমার পরামর্শ শুনবে?

—বলুন, আঙ্কল?

—এ ছবি তুমি বিক্রয় করো না। কাউকে উপহারও দিও না। এর একটি 'রেপ্লিকা' এঁকে ফেল। সেটা যদি বিক্রয় করতে চাও আমি খদ্দের জোগাড় করে দেব।

আর্টিমিসিয়া একটু দম ধরে কি যেন ভাবল। তারপর বললে, 'হুবহু অনুলিপি করতে বলছেন? কোনো পরিবর্তন কি সাজেস্ট করছেন না?'

—সেটা যে আমার এক্তিয়ার-বহির্ভূত। শিল্পী যদি অনুমতি করেন তবে নিশ্চয় আমি আমার 'সাজেশান' দেব। দর্শক হিসাবে।

—বলুন, আঙ্কল। আমি তো জানতেই চাইছি।

—আমার প্রথম পরামর্শ: আলোর উৎসটা আরও দুই ফুট নিচে হলে ভালো হয়। তাহলে 'জুডিথ' — যে এ দৃশ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার মুখে আর একটু আলো পড়ে। আলোছায়ায় খেলা বজায় রেখেও সেটা করা যায়।

—আর কিছু?

—হলোফার্নেস-এর মুখটা গ্রিক শৈলীর। যেন 'টাইটান' অথবা 'নেপচুন'-এর মুখ— গ্রিক নাক, গ্রিক চিবুক। ওটা আসিরীয় হওয়ার কথা।

—আসিরীয়ান মডেল আমি কোথায় পাব?

—না, মডেল পাবে না। ছবি পাবে। তুমি যদি এই পরিবর্তনে রাজি থাক তাহলে আমিই জোগান দেব।

—দিন। আমি দুটি সাজেশনই মেনে নিলাম।

—থ্যাঙ্কু। এবার অন্য একটা কথা তোমাকে বলি।

গৃহস্বামী এবার জানালেন যে, তাঁর প্রাসাদের একতলায় প্রধান 'হল'-কামরাটাকে উনি ওঁর কাকার একটি সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করতে ইচ্ছুক : 'মিকেলাঞ্জেলো মিউজিয়াম'। ওঁর বিশ্ববিশ্রুত খুল্ল তাতের অনেকগুলি স্মৃতি ও শিল্পকর্ম — স্কেচড্রইং, তৈলচিত্র ও অসমাপ্ত ভাস্কর্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা প্রাসাদে। সেগুলি আইনত ওঁর সম্পত্তি কিন্তু ধর্মত জনসাধারণের। ওঁর ইচ্ছা — সেই সংগ্রহশালায় ইল দিভিনা মিকেলাঞ্জেলো বুওনরত্তির উত্তরসূরীরা — অর্থাৎ সমকালীন শ্রেষ্ঠ ইতালিয়ান শিল্পীদের আঁকা কিছু ছবিও থাকবে। কয়েকজন বিশ্রুতকীর্তি চিত্রকরকে তিনি ইতিমধ্যেই এ কাজে নিযুক্ত করেছেন। দু - একজন আর্ট-কলেকটার তাঁদের সংগ্রহ থেকে কিছু ছবি ওঁকে উপহার দিতেও স্বীকৃত। বিশেষ করে কসিমোদ্যি মেদিজি — অর্থাৎ মিকেলাঞ্জেলোর পৃষ্ঠপোষকের বর্তমান বংশধর। কিছু কিছু তিনি ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছেন এ বাড়িতে।

মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ার প্রাসাদের বিভিন্ন প্রান্তে ওকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখালেন। আবার ফিরে এলেন সেই সংগ্রহশালার বিরাট হল- কামরায়। বললেন, আমার ইচ্ছে দুই দেওয়ালে শিল্প - সম্ভারগুলি সাজানো হবে। একদিকে আমার কাকার, তার বিপরীতে সমকালীন ইতালীয় শিল্পীদের। আর মাঝখানে থাকবে একটি ফুলসাইজ তৈলচিত্র : *Inclinazione!*

—'ইনক্লিনিজিওন' ? মানে ?

—হ্লাদিনী শক্তি! অনুপ্রেরণা! শিল্পীর অন্তলীন প্রেরণা। যা শিল্পী মনকে উদ্বুদ্ধ করে। আমার কল্পনায় তা হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড 'ন্যূড'। বাস্তব ন্যূড, কিন্তু তার আবেদনে যৌনতা থাকবে না। তুমি কী বল ?

—সুন্দর অনুভাবনা। যদিও অত্যন্ত কঠিন কাজ। কে আঁকবেন ?

যে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে উনি বলে চলেন, 'একটি ব্লন্ড, তার পশ্চাদপটে ঘননীল আকাশ; তার হাতে একটি ফুলের গুচ্ছ। পুষ্পনগরীর প্রতীক। সে বাতাসে ভাসছে। মেঘলোকে ভাসমান নারীমূর্তি।'

— মেঘলোকে ভাসমান ন্যূড ? সেটা বাস্তব হবে কী করে ?

— *Inclinazione* তো আধা-বাস্তব আধা-কল্পনার। কেন হবে না ? তুমি কী সাজেস্ট কর ?

—আপনি যা বললেন তাই। তবে মেঘলোকে ভাসমান না করে ওকে বসিয়ে দেওয়া যায় আধখানা ভাঙা চাঁদের উপর। আকাশের রঙ কোবাল্ট-ব্লু। ওর পায়ের নিচে কিউমিউলাস মেঘ—

— না। 'কোবাল্ট - ব্লু' নয়। ডীপ আল্ট্রামেরিন! আর তার মাথার উপর ঘননীল পশ্চাদপটে একটিমাত্র তারকা—'স্টার অব বেথল্‌হেম'।

—ধর্মকে এর মধ্যে টেনে আনছেন কেন, আঙ্কল ?

—শিল্পী মাত্রেই সদ্ধর্মের উপাসক। তাছাড়া ওটাকে দর্শক তার কল্পনামতো 'ভেনাস'ও ভাবতে পারে। ভেনাস অপার্থিব স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতীক।

—আপনি কী চাইছেন ? স্টার অফ 'বেথল্‌হেম' না, ভেনাস ?

—বললাম তো! সেটা নির্ভর করবে দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। শিল্পমাত্রেই একটা 'যোগ'-এর সাধনা। তার অধখানা গড়ে শিল্পী বাকি আধখানা দর্শক। সমঝদার!

আর্টিমিসিয়া জবাব দিল না। মিকেলাঞ্জেলো অনেকক্ষণ তাঁর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, এস, তোমাকে একটি 'বাস-রিলিফ' দেখাই। আমার কাকার গড়া একটি অধোৎকীর্ণ ভাস্কর্য।

ওকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। সেখানে একটি বাস-রিলিফ। শিল্প জগতে তার নাম 'Madonna of the Stairs, 1491' (সোপান পাদমূলে মাদোনা)। বললেন, আপতত ভুলে যাও এটা আমার কাকার গড়া একটি শিল্পকর্ম। নির্দ্বিধায় এর সমালোচনা কর দেখি। দোষ ও গুণ ?

আর্টিমিসিয়া অনেকক্ষণ সেটি খুঁটিয়ে দেখল। তারপর সত্যিই নির্দ্বিধায় শুরু করল তার শিল্পসমালোচনা : 'এটা যে বাস- রিলিফ তা বোঝাই যায় না। মনে হয় সাদা-কালো একখানি পেন্সিলে আঁকা ছবি। শিল্পভূমি থেকে কোনো অংশই আধা ইঞ্চির চেয়ে বেশি বাইরে বেরিয়ে আসেনি। শুধু মাত্র মায়ের দক্ষিণ হস্তের মুঠিখানি ছাড়া।

—সেটুকু তো প্রযুক্তিবিদ্যার কারিগরী। শিল্পের মর্মকথায় এস এবার।

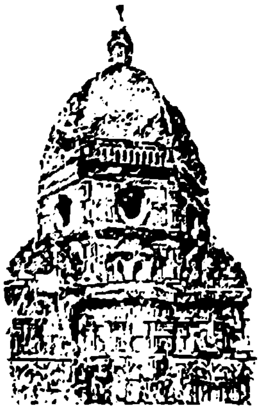

—শিশু যীসাসকে উনি গড়েছেন ব্যাসভিয়ুতে। এটা আমি কখনো আগে দেখিনি —

—কারেক্ট! তুমি হয়তো কয়েকশত শিল্পকর্ম দেখেছ। আমি দেখেছি কয়েক সহস্র। আমিও তা দেখিনি। নেক্সট?

—আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, আঙ্কল — যীসাস-এর ডানহাতের বাইসেপ শিশুসুলভ হয়নি। এটা একটা 'অ্যানাটমিকাল ডিফেক্ট'!

—রাইট। শিল্পী যীসাস-এর অন্তর্লীন দার্ঢ্য বা আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখাতে এই শারীরিক ত্রুটিটি সজ্ঞানে খোদাই করেছিলেন। এই আমার ধারণা। আর কিছু?

—মা-মেরীর মুখে একটা বিষন্নতার ছাপ। 'পিয়েতা'মূর্তিতে মা মেরীর বিষণ্ণতার অর্থ বুঝি, কিন্তু এখানে স্তনদানরত মাতার এ বিষণ্ণতা কেন?

—আমি বলব?

—বলুন আঙ্কল?

—তোমার নজরে পড়েনি সিঁড়ির তিনধাপ উঁচুতে জন-এর দক্ষিণ বাহু আর সিঁড়ির 'ব্যালাসট্রেড' একটা অসমাপ্ত ক্রুশচিহ্ন গড়ে তুলেছে। 'ক্রুশ'টা পুরোপুরি রূপায়িত হয়নি — হবে ত্রিশ বছর পরে। কিন্তু মা যেন তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে তা দেখতে পাচ্ছেন। তাই তাঁর মুখে পড়েছে একটা বিষণ্ণতার ছাপ। মা যেন ডান কনুই দিয়ে 'ক্রুশ'টাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন! অথচ দেখ, বাঁ-হাতের তালুতে আবার সেই ক্রুশটাকেই যেন ধারণ করে রেখেছেন। কেন? কারণ ওই ক্রুশকাষ্ঠটাই তো তাঁর স্তন্যপানরত শিশুকে মানবমাত্রায় রূপান্তরিত করবে! 'গড দ্য ফাদার আর 'গড দ্য স্যান'-এর সেতুবন্ধনই তো ওই নিষ্ঠুর ক্রুশকাষ্ঠ! তাই ওটাকে তো ঠেলে ফেলে দেওয়া চলবে না। এই দ্বৈতভাবনাতেই মায়ের মুখে ফুটে উঠেছে প্রশান্তি আর বিষণ্ণতা! লক্ষ্য করে দেখ, আর্টিমিসিয়া, মায়ের পিছনে যেন একটা 'হ্যালো'র আভাস— —একটা রত্নচ্ছটা। ওটাও পরিপূর্ণ hallow হয়ে উঠবে ত্রিশ বছর পরে।

আর্টিমিসিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল ওঁর শিল্পবিশ্লেষণে।

দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে উনি বললেন, 'তোমার দৃষ্টিতে ওটা সিঁড়ির ব্যালাসট্রেড, আমি দেখছি একটা অসমাপ্ত 'ক্রুশ'! তেমনি আমার পরিকল্পিত Inclinozione -এ কোনো দর্শক দেখবে সৌন্দর্যের দেবী স্বর্গীয় ভেনাসকে, কোনো দর্শক দেখবে সন্মার্গের পথ প্রদর্শক স্টার অব বেথ্‌লথহেম'!

আবার দুজনে ফিরে এসে বসলেন ওঁর স্টাডিতে।

আর্টিমিসিয়া বলে, 'আপনি কিন্তু আমার একটি প্রশ্নের জবাব এখনো দেননি আঙ্কল?'

— কোন প্রশ্নটার?

—এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বটা আপনি সমকালীন কোন্‌ মহান শিল্পীকে দেবার কথা ভাবছেন।

এম. বি. জুনিয়ার জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। ঠিক তখনই দ্বারপ্রান্ত থেকে ওঁর সেক্রেটারি জানতে চায়, ভিতরে আসতে পারি, য়োর লর্ডশিপ?

—হ্যাঁ, এস কী ব্যাপার।

সেক্রেটারি জবাব দিল না। নিঃশব্দে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল একটা মনোগ্রাম করা লেফাফা। আর একটা মেরুন রঙের থলি। তাকে ঠক্ করে একটা শব্দ হল। দুজনকে অভিবাদন করে সেক্রেটারি চলে গেল।

—হ্যাঁ, কী যেন জানতে চাইছিলে তুমি?

প্রশ্ন করতে করতে হাত-বটুয়ার দড়ি খুলে উনি তার ভিতরের স্বর্ণমুদ্রাগুলি টেবিলে ঢালছিলেন। গুনে দেখলেন, তাতে ছিল ত্রিশটি ফ্লোরিন —মোহর। আর্টিমিসিয়া অপেক্ষা করছিল। স্বর্ণমুদ্রাগুলি পুনরায় থলিতে ভরে ফেলে উনি চিঠিখানা লেফাফা থেকে বার করে দেখছিলেন। সেটাকেও খামে ভরে পুনরায় বললেন, 'হ্যাঁ, কী যেন বলতে চাইছিলে?'

— না, মানে আমি জানতে চাইছিলাম, এই মহান শিল্পকর্মের জন্য আপনি কি কোন সমকালীন শিল্পীর কথা ভেবেছেন?

— ভেবেছি। এই তোমার প্রশ্নের জবাব। চিঠিখানি খুলে দেখ। তা দেখে বজ্রাহতা হয়ে গেল আর্টিমিসিয়া!

বলে, এ.... এটা কী করলেন? আমি? অখ্যাত অজ্ঞাত....

—এক্ষনি যে 'বাস-রিলিফ'টা দেখলে আর্টিমিসিয়া, ওটা গড়েছিলেন একজন নিতান্ত অখ্যাত অজ্ঞাত কিশোর শিল্পী। ইয়ার অফ দ্য লর্ড 1491-এ। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম বাস-রিলিফ। তাঁর Inclinazione কে ছিলেন জানো? কন্টেসিন্টা — লিট্‌ল কাউন্টেস! তাঁর নাম শুনেছ?

আর্টিমিসিয়ার বাক্যস্ফূর্তি হল না। দুদিকে মাথা নেড়ে নেতিবাচক ভঙ্গিতে জানালো — সে জানে না।

—'কন্টেসিনা'র বয়স তখন তেরো। তিনি ছিলেন লরেঞ্জো দ্য ম্যাগ্‌নিফিসেন্ট-এর কনিষ্ঠতমা আত্মজা। আমার কাকার সঙ্গে তাঁর একটা 'কাফ্-ল্যভ' হয়েছিল। যদিও দুজনে দুজনের কাছে তা কোনোদিন স্বীকার করেননি, তবু দুজনেই সেকথা জানতেন! রিডল্‌ফির সম্ভ্রান্ত পরিবারে কন্টেসিনার বিবাহ হয়। তিনসন্তানের জননীকে মা-মেরী বুকে টেনে নেন মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। আর আমার কাকা সারাজীবনে বিবাহই করেননি। তুমি কন্টেসিনার নামই শোননি?

এখনো বাকশক্তি ফিরে পায়েনি শ্রোতা। সে আবার মাথা নাড়ে।

—কন্টেসিনার ছোটভাই গুইলিনোর নাম শুনেছ? যার জন্ম ও মৃত্যু কন্টেসিনার ঠিক এক-এক বছর পরে।

—আজ্ঞে না। তিনি কী জন্য বিখ্যাত?

— বিশ্ব ললিতকলাকে তিনি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি চিত্রটি উপহার দিয়েছেন বলে!

—বিশ্বই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি কী তা?

—কী আশ্চর্য! সেটাও তোমাকে বলে দিতে হবে? *মোনালিসা!*

— সেটাতো এঁকেছিলেন লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি।

— কারেক্ট! কিন্তু লেঅনার্দোকে ওই ছবি আঁকার বায়নাটা দিয়েছিলেন গুইলিনো দ্য মেডিচি। মোনালিসার সঙ্গে নাকি গুইলিনোরও হয়েছিল অমনই একটা 'কাফ-ল্যভ'। তাই অর্থমূল্যে লেঅনার্দোকে নিযুক্ত করেছিলেন। 'সিনোরা লীজা গিওকোন্ডার' একটি প্রতিকৃতি আঁকাতে। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি সে ছবিটা ডেলিভারি নেননি। ছবিটা বরাবর ছিল লেঅনার্দোর সংগ্রহে!

আর্টিমিসিয়া এতক্ষণে নিজেকে কোনোক্রমে সামলে নিয়েছে। বলে, সে যা হোক, কিন্তু ওই Inclinizionc -এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ছবিখানা আঁকার গুরুদায়িত্ব আপনি আমার মতো 'নভিস্'-কে দিচ্ছেন কেন?

— তিনটি কারণে। প্রথম কথা : তোমার মধ্যে একটি প্রচণ্ড সম্ভাবনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি — ইল দিভানো লরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট যেমন দেখতে পেয়েছিলেন কিশোর ভাস্করের ওই বাস-রিলিফে *Madonna on the Stairs* -এ। দ্বিতীয় কথা তুমি ব্যতিত সমকালীন চিত্রশিল্পের জগতে আমি কোনো মহিলা শিল্পীকে খুঁজে পাইনি। কোনো পুরুষ চিত্রকর 'ন্যূড' গড়লে কিছুতেই সেটাকে যৌনতাবর্জিত করতে পারবেন না। প্র্যাক্সিটেলেম-এর ন্যূড *পাইরীন* থেকে তিন্তোরেত্তোর *সুসান্নাতে* তা প্রমাণিত। পারলে একমাত্র তুমিই পারবে! যেহেতু তুমি পুরুষ নও।

আর্টিমিসিয়া মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ কী যেন চিন্তা করল। তারপর বলে, 'আপনি তিনটি হেতুর কথা বলেছিলেন, আঙ্কল!'

— সেটা প্র্যাক্টিকাল। আমাদের আকাদেমিয়ায় অনেকগুলি মহিলা আছেন। যাঁরা শিল্পীর মডেল হবার জন্য নাম লিখিয়েছেন। চিত্রকরেরা তাঁদের দৈনিক হারে মডেল হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন; কিন্তু তাদের 'ন্যূড মডেল' করার কানুন নেই। তোমার ক্ষেত্রে সে বাধা থাকবে না। তুমি পছন্দ মতো মডেলকে নিয়োগ করতে পার। আর আইন মেনেই ন্যূড-মডেলের ছবি আঁকতে পারবে।

থলিটা এবার উনি বাড়িয়ে ধরলেন।

—এটা কেন আঙ্কল?

—বায়না। তোমাকে রঙ-তুলি- ক্যানভাস খরিদ করতে হবে। দৈনিক মডেলকে তার প্রাপ্য মেটাতে হবে। এ ছবিটা তোমার 'কমিশন্ড' কাজ। সমস্ত খরচ আমার। পরে হিসাব দিও। এ কী? তুমি কাঁদছ কেন? আর্টিমিসিয়া?

আর্টিমিসিয়া উঠে দাঁড়ায়। বলে, সেটা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। শুধু বলে যাই: আজকের সকালটা আমার এই বাইশ বছরের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা: 'মোনালিজা'!

অ্যাপথেকারির (চিত্রকরদের যাঁরা রঙ তুলি ইত্যাদি বিক্রয় করেন) মালিক চশমা-জোড়া নাকের উপর তুলে আর্টিমিসিয়াকে একনজর দেখে নিয়ে বলেন, 'বলুন সিনোরা, কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি?'

—আমি রঙের কিছু সরঞ্জাম কিনতে এসেছি—রঙ-তুলি-ক্যানভাস এবং স্ট্যান্ড।

—খুব আনন্দের কথা। তাহলে যিনি আঁকবেন তাকেই সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন?

আর্টিমিসিয়া মিষ্টি হেসে বললে, তিনিই এসেছেন। আপনি চিনতে পারছেননা! আমিই আঁকব।

মানে —ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

টেবিলে নানান সরঞ্জাম সাজানো। আর্টিমিসিয়া তা থেকে কিছু অ্যালাবাস্টার সরিয়ে রাখল, পত্রবর্ণের জন্য। স্প্যানিশ সিনেবার, একটা খল-নুড়ি, অকারের ঢেলা, মেঘ-আঁকার জন্য কিছু গ্রে আর 'হোয়াইট লেড'। তারপর বললে, 'ছবিটার পশ্চাদ্‌পট হল ঘননীল আকাশ। কী নেওয়া যায় বলুন তো?'

বৃদ্ধ এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন। সংসারে কত হরেক কিসিমের চিড়িয়া থাকে — পাঁচ-পা-ওয়ালা ষাঁড়, সাদা-রঙের কাক। এটা সে রকম একটা ব্যতিক্রম। কোটের পরিবর্তে পেটিকোটধারী চিত্রকর। ঢোক গিলে বললেন, 'আমার কাছে কিছু 'আজুর ডেল অ্যালা ম্যাগ্‌না *(azzure dell allamagna)* আছে। বেশ আকাশি-নীল রঙ হতে পারে—'

—না, সিনর। আমি 'কোবাল্ট ব্লু' রঙ চাই না। ঘন-নীল আকাশ। নির্ভেজাল ঘন নীল। 'অ্যাল্ট্রামেরিন' নেই।

—আছে।'লাপিস্ লাজুলির' আছে। কিন্তু তার যে আকাশছোঁয়া দাম, সিনোরা! প্রায় সোনার দর।

—দামের প্রশ্ন তো আমি করিনি। — দেখি জিনিসটা।

বুড়ো বিরক্ত হল। উপায় নেই। খদ্দের হচ্ছেন মা লক্ষ্মী!

পিছনের একটা ড্রয়ার থেকে সাবধানে বার করে আনল একটা পুঁটুলি। ট্রের উপর কাগজ পেতে তার উপর ঢেলে দিল ঘন নীল কিছু পাথর। তারপর স্বর্ণকার যে ভঙ্গিতে শহরে-বেড়াতে-আসা গ্রাম্য মহিলার সামনে মেলে ধরে হীরে-পান্না- বসানো জরোয়া সেটা সেই ভাবেই ঠেলে দিল। বললে, 'নিক্তিতে ওজন করতে হবে সিনোরা। কোন টুকরোটা নেবেন পছন্দ করুন।'

আর্টিমিসিয়া বললে, সব কয়টাই।

বৃদ্ধের চোয়ালের নিম্নাংশ ঝুলে পড়ল। আবার আমতা আমতা করে বলেন,'প্রায় দুই ফ্লোরিন দাম পড়ে যাবে, সিনেরা।'

—দামের প্রশ্ন বার-বার উঠেছে কেন? ওজন করুন সবগুলো।

এতক্ষণে বৃদ্ধ বুঝতে পেরেছেন তাঁর মা-লক্ষ্মী তুলি ধরতে জানুন-না-জানুন চাবুক ধরতে জানেন।

আর্টিমিসিয়া যখন নগদে দাম মিটিয়ে দিলে তখন অ্যাপথেকারি বলেন, 'ক্যাশমেমোটা নিয়ে যান মা, আর আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যান। আমার ছেলে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আপনি তো দেখছি বাড়ির ব্রুহামটা আজ নিয়ে বের হননি।'

আর্টিমিসিয়া কোনোক্রমে হাসি সামলে নেয়। থলিভর্তি মোহর দেখে বৃদ্ধ বুঝি ভাবছেন ওর বাড়িতেও 'সবই মোহর?'

বাড়িয়ে ধরে সোনালি-অক্ষরে লেখা আকাদেমির আমন্ত্রণ পত্রটি।

বুড়ি বলে, তুই পড়ে শুনিয়ে দে। এত ছোট হরফ আমি পড়তে পারি না।

আর্টিমিসিয়ার খেয়াল হল : গ্র্যানির অক্ষর-পরিচয় নেই। পড়ে শোনালো চিঠিটা। বুড়ি নিরক্ষর বটে, তবে তিন-কুড়ি পাড়ি দিয়েছে এই পুষ্পনগরীতে। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারে। একগাল হেসে বলে, 'তার মানে ওরা তোর কাজের মর্যাদা বুঝতে পেরেছে এতদিনে?'

—তাই তো মনে হচ্ছে। আমার তো নিমন্ত্রণ হবার কথা নয়।

হঠাৎ কী খেয়াল হয় বুড়ির। জানতে চায়, 'হ্যাঁরে, পেত্রো কী বললে? নেমন্তন্ন রাখতে তোকে নিয়ে যাবে তো?'

—তাকে এখনো চিঠিখানা দেখানো হয়নি। সে বেরিয়ে যাবার পরে এ চিঠিখানা এসেছে। তা তোমার এমন সন্দেহ হল কেন, দিদা? ও নিশ্চয় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। পালমিরাকে আমরা তোমার কাছে রেখে যাব। কেমন?

বুড়ি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

—কী ভাবছ বলাতো? — জানতে চায় এবার ওর বুকের ভিতরটা বর্ষণমুখর মেঘের মতো গুড়গুড় করছে। বুড়ি যে কী ভাবছে তা অবশ্য ও আন্দাজ করেছে। সে আশঙ্কাটা ওর নিজের মনেই ছিল উদীয়মান শিল্পীরা 'সস্ত্রীক' নিমন্ত্রিত হন। সস্ত্রীক উপস্থিতও হন। তাঁদের বুকের মধ্যে একটা আশার অঙ্কুরও মাথা তুলতে চায়। কে জানে — হয়তো তাঁর নামটা লিখিত হয়েছে এ বৎসরের 'সাম্মানিক সদস্য' তালিকায়। সেটা সমাবর্তনের পূর্বে বিজ্ঞপ্ত হয় না। নাটকীয় ভাবে সেটা ঘোষিত হয় আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে। তাই ও জানে না, তার নাম এবছর তালিকাভুক্ত হয়েছে। এখানে চিঠিতে উল্লেখিত হয়েছে 'সস্বামী'— 'উইথ্- স্পাউস'। পেত্রো এটা কীভাবে নেবে জানা নেই।

বুড়ি বললে, 'আমি কী ভাবছি তা তুই ভালমতোই জানিস! গোঁয়াড়-গোবিন্দটা এটা কীভাবে নেবে তার কি কিছু স্থিরতা আছে?'

পেত্রো ফিরে এল সন্ধ্যা নাগাদ। আর্টিমিসিয়া দুরুদুরু বুকে চিঠিখানা ওকে দেখাতে গেল। পেত্রো হাত বাড়িয়ে লেফাফা নিল না। জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে মুখ নিচু করেই বললে, 'আমাকে দেখাতে হবে না। আমি জানি। কাল দুপুরে তোমাকে আঁতেলদের উৎসবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এই তো? সেটা তো আনন্দের কথা। যেও!'

—তুমি কোথায় শুনলে?

—আমিও ফ্লোরেন্সের একজন বাসিন্দা। এসব খবর আমাকে রাখতে হয়। এ শহরের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ।

আর্টিমিসিয়া বললে, আমি কিন্তু এটা আশা করিনি আদৌ।

—করনি? আশ্চর্য! আমি হলে কিন্তু করতাম। অমন জোরালো জাঁদরেল আঙ্কল থাকলে আমারও নিমন্ত্রণ হত।

—তোমার নিমন্ত্রণ তো হয়েছেই।

—জানি। বিখ্যাত শিল্পীর স্বামী হবার গৌরবে।

যা আশঙ্কা করেছিল তাই। কথা ঘোরাতে বললে, 'তুমি কোন স্যুটটা পরে যাবে? এখনি

বল। ইস্ত্রি করে দিই।'

ততক্ষণে ওর জুতো জোড়া বন্ধনমুক্ত হয়েছে। গায়ের কোটটাও ওর গা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হ্যাঙারে উদ্বন্ধন লাভ করেছে। পেত্রো তার ঝোলা থেকে আবসান্থের বোতলটা বার করে টেবিলে রাখল। বললে, 'আমি ওভাবে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে পারি না, আর্টিমিসিয়া। তুমি একাই যেও!'

— সেটা খুব বিসদৃশ দেখাবে না?

—না! কেউ সেটা নজরই করবে না।

—করবে। অন্তত এম. বি. জুনিয়ার রবেন। এই নিয়ে তিন-তিনবার হল তো?

—তিনবার. মানে?

—প্রথমবার ওঁর প্রাতরাশের নিমন্ত্রণে; দ্বিতীয়বার Inclinazione-এর আবরণ উন্মোচনের উৎসবে, কাল তো তৃতীয়বার একই ঘটনা ঘটতে চলেছে।

পেত্রো আবসান্থের বোতলের ছিপিটা খুলে গ্লাসে ঢালতে শুরু করেছে। বললে, 'না, তোমার আঙ্কল ক্ষমাশীল মহানুভব ব্যক্তি। তিনি কিছু মনে করবেন না।'

উৎসবমুখর আকাদেমির সামনের মাঠে বিরাট জনতা। ছোট ছোট জটলায় উচ্চকণ্ঠে তারা আলাপচারি করছে। মহামান্য অতিথিরা তাঁদের গাড়ি থেকে নামছেন। গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ি-রাখার ফাঁকা ময়দানে।

আর্টিমিসিয়াকে দেখেই সিনর বুওনোরত্তি দু-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। ওর হাত দুটি ধরে বললেন, 'এ কী। তুমি একা? ও আসেনি?'

—আজ্ঞে না কী একটা জরুরী কাজে আটকা পড়েছে।

সেই স্থূলকায় স্টুয়ার্ট ভদ্রলোকও এতক্ষণে এগিয়ে এসেছেন।

মিকেলঞ্জেলো তাঁর সঙ্গে আর্টিমিসিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক ওকে 'বাও' করলেন সসম্ভ্রমে। সেটা উপভোগ করল অখ্যাত শিল্পীটি। তার মনে পড়ে গেল —মাস কয়েক আগে ঐ ভদ্রলোক ভেবেছিলেন এ মেয়েটি 'মডেল' হিসাবে নাম লেখাতে এসেছে। আজ সে আমন্ত্রিতা অতিথি.!

আর্টিমিসিয়া নির্লিপ্তভাবে বললে, 'মনে হচ্ছে 'ইতিপূর্বেই আমাদের একবার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই না?'

—বটেই তো! আপনি তো আকাদেমিয়া থেকেই মডেল ভাড়া করেছিলেন, আপনার Inclinazione -এর জন্য।

—আহ্! আপনি ওটা এঁকেছেন? অসাধারণ একটা তৈলচিত্র।

আর্টিমিসিয়া এ পাশ ফিরে বক্তাকে 'বাও' করল। তাঁকে চিনতে পারল না। বোধহয় তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কেওকেটা কেউ।

তাঁর পরিচয় দিল না। বৃদ্ধ লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে ভিতরে ঢুকে গেলেন। প্রবেশদ্বারের কাছে নিখুঁত সাজপোশাকে দাঁড়িয়েছিলেন সিনর ব্রান্ডিনেল্লি — আকাদেমির সচিব। তিনিও সাদরে আর্টিমিসিয়াকে অভ্যর্থনা জানালেন। এটা অপ্রত্যাশিত। আর্টিমিসিয়া তাঁকেও 'বাও' করল একটা। বৃদ্ধ বললেন, 'সমাবর্তন উৎসব শুরু হতে এখনো আধঘণ্টা বাকি। ইতিমধ্যে

নতুন সংযোজিত শিল্পসম্ভারগুলি ঘুরে ঘুরে দেখুন।'

আর্টিমিসিয়া তাঁকে বলল না যে, এই প্রথম সে ভিতরে ঢুকতে পেরেছে। 'নতুন সংযোজন'-এর প্রশ্নই নেই — সে ইতিপূর্বে কিছুই দেখেনি। হল-কামরার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ছিলেন 'ইল গ্র্যাভুচা কসিমো দ্য মেদিচী' — কসিমো পরিবারের বর্তমান বড়কর্তা। বয়স কম — ত্রিশে এখনো পৌঁছাননি। কিন্তু দিব্যকান্তি আদৌ নন। পোশাক-পরিচ্ছদ খুবই জমকালো। মুখাকৃতি মোটেই সুন্দর নয়। তা হোক। তবু তিনি আজও 'ইল গ্র্যাভুচা'- পারিবারিক উপাধি অনুসারে 'মহান।' ফ্লোরেন্সের মেদিচী পরিবার কয়েক শতাব্দি ধরে ছিল গোটা ইয়োরোপের একটি অতি বর্ধিষ্ণু পরিবার শিল্প-সংস্কৃতি এবং সামরিক মর্যাদায়। সে বংশে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির গৌরীশিখরে উপনীত হয়েছিলেন 'ইল দিভানো লরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট'। মিকেলাঞ্জেলো সিনিয়ারের পৃষ্ঠপোষক। কৃষ্ণনগর রাজপরিবারে যেমন ক্ষমতার শীর্ষচূড়ায় উন্নীত হয়েছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের পৃষ্ঠপোষক। এখন ওই পরিবারের প্রতিপত্তি নিম্নগামী। অথচ এই পরিবার থেকেই দুজন হয়েছেন পোপ, একজন ফ্রান্সের রাণি।

আঙ্কল ওর কানে কানে বললেন, 'আমার সঙ্গে এদিকে এস, আর্টিমিসিয়া। কসিমো দ্য মেদিচীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। তোমার ইনক্লিনেজিয়ন-এর খুব প্রশংসা করেছেন উনি।'

ওরা অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টুয়ার্ট ভদ্রলোক তাঁর হস্তধৃত লাঠিটা মার্বেল মেঝেতে ঠুকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে ওঠেন : 'অ্যাটেনশান প্লীজ!'

সবাই তাড়াহুড়ো করে দুই সারিতে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। সভ্য এবং নিমন্ত্রিতের দল। সিনর ব্র্যান্ডিনেল্লি একটা গলা-খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলতে থাকেন, 'ইল গ্র্যাভুচা কসিমো দ্য মেদিচী, আকাদেমিয়া দেল' আর্টি ডেল ডিসেনোর সভ্যবৃন্দ এবং সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! — আজ এই সমাবর্তন উৎসবে, ললিতকলার পৃষ্ঠপোষক দেবতুল্য সেন্ট লুককে স্মরণ করে আমি এখন, আকাদেমির তরফে নবনির্বাচিত সম্মানিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করব। বর্তমান বৎসরে, অর্থাৎ ইয়ার অব দ্য লজ 1615 খ্রিস্টাব্দে আমাদের সভ্য তালিকায় তিনজন উদীয়মান শিল্পীকে সম্মানিত সদস্যপদে উন্নীত করা হচ্ছে। তাঁদের নাম ঘোষিত হবে এখন। বর্তমান বৎসরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য সাফল্যের জন্য। তাঁরা তিনজনই সমাবর্তন-মণ্ডপে উপস্থিত। নাম ঘোষণার পরে তাঁরা অনুগ্রহ করে অগ্রসর হয়ে আসবেন এবং আমাদের সভাপতি মহামান্য ইল গ্র্যাভুচার হাত থেকে সম্মানপদক-তথা শংসাপত্র গ্রহণ করবেন।'

হল-কামরায় উপস্থিত প্রায় শতখানেক মানুষ তখন রুদ্ধশ্বাস।

— ভাস্কর্য বিভাগে : সিনর আন্তোনেল্লো ইগ্‌নাজিও বারদুচ্চি —

অল্পবয়সী একজন ভাস্কর একপদ অগ্রসর হয়ে সভাপতির হাত থেকে সম্মানপত্র গ্রহণ করলেন। ইল গ্র্যাভুচা স্বর্ণখচিত রূপার মেডেলটি গলায় পরিয়ে দিলেন। শতখনেক মানুষ সমবেত কণ্ঠে পুকার দিয়ে ওঠেন : ব্রাভো!

—স্থাপত্যবিভাগে: সিনর অন্তোনিও গুইদো দ্য ফ্লোরেন্তিনো।

পুনরায় সমস্বরে সবাই পুকার দিয়ে ওঠে : ব্রাভো!

—চিত্রশিল্প বিভাগে: সিনোরা আর্টিমিসিয়া দ্য-ওরাজিও জেন্টিলেসচি—

আর্টিমিসিয়া বজ্রাহত।

সমস্ত হল-কামরার প্রাচীরে তার নামটি প্রতিধ্বনিত হল। সে কিন্তু তখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি। তার দুটি পা যেন মেজেতে গাঁথা হয়ে গেছে। মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ার দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক ওর পাশেই। তিনি ওর পিঠে একটি সস্নেহ করস্পর্শ করা মাত্র ও সম্বিত ফিরে পায়। ধীর পদবিক্ষেপে ও এগিয়ে যায় আকাদেমিয়ার সভাপতির সম্মুখে। নতমস্তকে শংসাপত্রটি গ্রহণ করে 'বাও' করে। কসিমো ওর গলায় মেডেলটা পরিয়ে দিলেন। সমবেত সকলে সমস্বরে পুকার দিয়ে ওঠে — না 'ব্রাভো' নয় এবার 'স্ত্রীয়াম্ আপ', — ব্রাভো!

আর্টিমিসিয়ার মনে হল এটা তার জীবনের একটি 'পরম লগন'!

আঙ্কল ওর বাহুমূল গ্রহণ করে বলেন, 'এবার এস, আর্টিমিসিয়া, তোমার সঙ্গে ইল গ্র্যাভুচার পরিচয় করিয়ে দিই।'

এবারও বাধা পড়ল। স্টুয়ার্ট বেমক্কা ঘোষণা করে বসে, 'এবার আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। আকাদেমিয়ার সংরক্ষিত শিল্পশালার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। আমাদের সচিব শিল্প বিশারদ সিনর ব্র্যান্ডিনেল্লি আপনাদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাবেন এবং প্রতিটি শিল্পের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

একদলে সকলের যাওয়া সম্ভবপর নয়। কসিমো এবং ব্র্যান্ডিনেল্লিকে অনুসরণ করে প্রথমদল দর্শনার্থী প্রবেশ করলেন প্রদর্শনী কক্ষে। প্রকাণ্ড চিত্রশালা। বিশ্ববন্দিত শিল্পাচার্যদের বিভিন্ন যুগের সাধনা সারি-সারি সাজানো। শিল্পের সে এক স্বর্গ : বত্তিচেল্লীর প্রিমাভেরা (বসন্তোৎসব), লেঅনার্দোর : লেডি উইথ অ্যান এরমাইন; জর্জনের নিদ্রিতা ভেনাস, পাশাপাশি প্রতীক্ষা করছে সমজদার দর্শকের স্বীকৃতি। এগুলি দীর্ঘকাল উফিজি সংগ্রহশালায় সাজানো! দর্শকেরা সবাই অনেক-অনেকবার দেখেছে। তাই সিনর ব্র্যান্ডিনেল্লি এগুলির ব্যাখ্যা না দিয়ে সরাসরি ওদের নিয়ে গেলেন সম্প্রতি যে চিত্রগুলি উফিজি ক্রয় করেছে সেগুলি দেখাতে।

প্রথমেই তিজিয়ানোর : নোলি মি টাঙ্গেরি।

তিজিয়ানো ভেসিল্লি (1490-1576) ছিলেন ভেনিশিয়ান শিল্পাচার্য বেলিনীর প্রিয় শিষ্য এবং জর্জনের সতীর্থ। আমরা তাঁকে 'টিশিয়ান' নামে চিনি। এই তৈলচিত্রে মাত্র দুটি চরিত্র : যীশু ও মাগ্‌দালেন। হতভাগিনী মাগ্‌দালেন নতজানু ভঙ্গিতে প্রভুর চরণ স্পর্শ করতে উদ্যতা, আর যীশু যেন দূরে সরে গিয়ে বলছেন : 'নোলি মি টাঙ্গেরি' — আমাকে স্পর্শ কর না। কেন? কেন তিনি ওই মন্দভাগিনীকে তাঁর চরণস্পর্শ করতে বারণ করছেন? বাইবেল-এর কোথায় আছে এই ঘটনার বর্ণনা? আর্টিমিসিয়া জানে না। এ ঘটনা কি প্রভুর পুনরুত্থানের পরবর্তীকালে? না হলে প্রভুর পায়ের পাতায় ওই আঘাতের চিহ্নটি কেন? কেন টিশিয়ান ওখানে দিয়েছেন ভার্মিলিয়ান রঙের একটি ক্ষতচিহ্নের বিন্দুস্পর্শ?

কী ক্ষতি হত যদি ওই হতভাগিনী প্রভুর চরণমূলে নামিয়ে রাখার সৌভাগ্যলাভ করত একটি শ্রদ্ধানম্র প্রণাম? কিন্তু সে-কথা ভাববার সময় পেল না। প্রদর্শক এগিয়ে গেলেন পরবর্তী চিত্রের সম্মুখে। এটিও উফিজি সম্প্রতি ক্রয় করেছে:

পারমিজ্ঞানোর আঁকা একটি বিশাল ক্যানভাস — মাদোনা উইথ দ্য লং নেক।

পারমিজ্ঞানো (1503-40) লম্বার্ড-শৈলীর শিল্পী। মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে প্রয়াত হন। কোরোজ্জিওর 'চিরাসকিউরো'র প্রভাব তাঁর শিল্পে জোরালো ভাবে পড়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাফায়েলের পেলবতা। শিল্পবিশারদ ব্র্যান্ডিনেল্লি বললেন, 'আপনারা শুনে সুখী হবে না, আমাদের সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ এই চিত্রটিকে সম্প্রতি ক্রয় করেছেন। এটি একটি বিশ্ববন্দিত শিল্পকর্ম।'

দর্শকদলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ — নিঃসন্দেহে তিনিও একজন শিল্পবিশারদ বলে ওঠেন, 'তা তো বুঝলাম, সিনর, কিন্তু এটি 'বিশ্ববন্দিত' হল কোন সুবাদে?'

ব্র্যান্ডিনেল্লি বিচিত্র হেসে বললেন : 'কেন স্যার? আপনার কি মনে হচ্ছে এ ছবিতে কিছু গণ্ডগোল আছে?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আমরা তো সাধারণ দর্শক, তাই আপনার মতো কনৌসারের কাছে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইছি।

—বলুন? কী আপত্তি নজরে পড়ছে আপনার?

—প্রথম কথা : চিত্রের ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি, মা মেরীর দক্ষিণে চারটি ফিগর ভিড় করেছে, বাঁ দিক বেমালুম ফাঁকা।

—কারেক্ট! আর কিছু?

—মা দাঁড়িয়ে আছেন না বসে, তা বোঝাই যাচ্ছে না। যেন ভাসছেন। তাছাড়া শিশু যীশুর দেহ অন্যান্য ফিগারের তুলনায় কিছু বেশি দীর্ঘ। আর সবচেয়ে বড় অ্যানাটমিক্যাল ডিফেক্ট মায়ের গ্রীবায়।

ব্র্যান্ডিনেল্লী মৃদু হেসে বললেন, সেই ত্রুটিটা তো শিল্পী শুধরে নিয়েছেন নামকরণের মাধ্যমে — 'মরালগ্রীব মাদোনা। আমাদের কর্মপরিষদের ক্রয়-বিভাগ এটি বহু অর্থের বিনিময়ে কিনেছেন, এটাই এর সম্বন্ধে শেষ কথা! আসুন, আমরা এগিয়ে যাই—'

গোটা দলটা তাঁর অনুসরণ করে। আর্টিমিসিয়া সে গড্ডলিকা প্রবাহে সামিল হতে পারল না। সে একদৃষ্টে ওই ছবিখানাই দেখতে থাকে। রীতিমতো অবাক হয়ে যায় সে। পারমিজ্ঞানো একজন অতি শক্তিশালী চিত্রকর। কেন তিনি সজ্ঞানে এইসব বিচ্যুতি ঘটতে দিলেন?— চিত্রের প্রতিসাম্য কেন ব্যাহত করলেন? আর মায়ের গ্রীবা...?

একদৃষ্টে সে তাকিয়েই থাকে ওই অনবদ্য শিল্পের দিকে।

—কী হল? বুঝতে পারলে না কিছু?

চমকে পিছনে ফেরে। দেখে একজন বৃদ্ধ ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছেন। কালোরঙের গলাবন্ধ কোট, হাতে লাঠি, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। বললে, 'আমাকে বলছেন?'

—আর কেউ তো ধারে কাছে নেই, মা? তোমার কাছেই তাই জানতে চাইছি; কিছু ঢুকল মাথায়?

আর্টিমিসিয়া হেসে ফেলে। বলে, আজ্ঞে না। আপনি বুঝছেন?

—কী ত্রুটি তোমার নজরে পড়ছে, আগে শুনি?

— ওই উনি যা বললেন — শিশু যীশুর দেহাকৃতি কেন অস্বাভাবিক দীর্ঘ তা অবশ্য বুঝেছি।

—খুব আনন্দের কথা। সেটা কেন, তাই প্রথমে আমাকে বুঝিয়ে বল দিকিন?

—আপনি, স্যার সিনিয়র মিকেলাঞ্জেলোর 'মাদোনো অ্যাট দ্য স্টেয়ার্স' বাস-রিলিফটা দেখেছেন? সেখানে যীশুর 'বাইসেপ' মাংসপেশী...

—ব্যস,ব্যস, আর বলতে হবে না। বরং যেটা বোঝনি তার কথা বল?

—শিল্পী কেন ছবির ভারসাম্যরক্ষার চেষ্টা করেননি? মায়ের ডানদিকে চারটি ফিগর, বাঁ-দিক একদম ফাঁকা!

—সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? বাচ্চারা তো মায়ের কাছে ভিড় করেই এসে দাঁড়ায়। প্রকৃতিতেও তাই। গাছের এক ডালে একগুচ্ছ ফুল, অন্য দিক ফাঁকা! দেখনি?

— কিন্তু শিল্পী তো শিল্পের রীতি মেনে চলবেন? চলবেন না?

বৃদ্ধ বললেন, 'শিল্পী বাঁ-দিকে একটা সাদা ডোরিক স্তম্ভ এঁকেছেন। তাতে কি ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি?'

আর্টিমিসিয়া আবার ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। শেষে বলে, 'কিন্তু ওই 'অ্যানাটমিকাল ডিফেক্ট'টা? মায়ের গলা...?'

—শোন মা, 'ম্যানারিজম্' কাকে বলে জান?

—'ম্যানারিজম্'! আজ্ঞে না। শব্দটা এর আগে কখনো শুনিনি।

— তা না জেনেই তুমি তোমার ওই Inclinazione -এ ম্যানারিজম্-এর প্রয়োগ করেছ?

আর্টিমিসিয়া উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে। বলে, 'আপনি সেটা দেখেছেন? বলুন, আপনার কেমন লেগেছে?'

—উ হুঁ হুঁ! স্টেপ বাই স্টেপ! না হলে অঙ্ক মিলবে না। আগে প্রথম অঙ্কটার সমাধান হোক, তারপর সে-সব কথা। এস আমার সঙ্গে।

বৃদ্ধ ওকে নিয়ে গেলেন হল-কামরার বাইরে খোলা অলিন্দে। সেখানে ইতস্তত কিছু চেয়ার-টেবিল সাজানো। উনি বসলেন, ছাত্রীকেও বসালেন একটা চেয়ারে। যে সব খিদ্‌মদ্‌গার পানীয় সরবরাহ করছিল তাদের ডেকে দুটি পানীয় সংগ্রহ করলেন। নিজে নিলেন 'ভদ্‌কা উইথ লাইম,' আর ছাত্রীর জন্য একপাত্র রেড-ওয়াইন। তারপর অঙ্কের মাস্টারমশাই শুরু করলেন তাঁর ক্লাস : 'Mannerism' কাকে বলে।

এইখানে লেখক হিসাবে আমাকে একটি অপরাধের স্বীকৃতি দিতে হবে। Mannerism শব্দটা সাম্প্রতিককালের। বর্ণিত কালে বক্তার নিশ্চয় শব্দটা জানা ছিল না। তত্ত্ব ও তথ্যটা অবশ্য জানা ছিল।

'ম্যানারিজম্' চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির একটি স্বীকৃত শৈলী। এর সূচনা 1520 নাগাদ। বস্তুত রাফায়েলের প্রয়াণকাল থেকে। সমাপ্তি ষোড়শ শতাব্দির অন্তিমলগ্নে। রেনেসাঁ যুগের সাফল্যচূড়ায় উপনীত হয়ে ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের প্রবাহ যেন হঠাৎ গতিরুদ্ধ হয়ে গেল। সে যুগের শিল্পাচার্যরা যে চরম সাফল্যের গৌরীশৃঙ্গে উপনীত হলেন, তারপর আর কোথায় যাওয়া যায়? দিশেহারা শিল্পীর দল নতুন পথের সন্ধানে আরোপ করতে চাইলেন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ। যা প্রচলিত রীতিকে স্বীকার করেও শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার অনবদ্যতা তুলে ধরতে চাইল। প্রয়োজনে বাস্তবতাকে অস্বীকার করেও। মিকেলাঞ্জেলোর স্ত্রী মূর্তিগুলি

রাফায়েলের পেলবতাকে অগ্রাহ্য করে আমেজনিয় বলিষ্ঠতায় ভাস্বর। জ্যাকোপো-পন্টোর্মো (1494-1556) এবং বিশেষ করে ফ্রাঁসেস্‌কো পারমিজ্ঞানো (1503-40) এই শৈলীতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। "The result was a disturbing, often violent and highly emotional style, by deliberately defying and distorting natural proporations" তাঁর 'মরালগ্রীব মাদোনা' তার একটি ক্লাসিকাল উদাহরণ।

আর্টিমিসিয়া জানতে চায়, 'আপনি কি চিত্রশিল্পী না ভাস্কর?'

—না রে বাপু। দুটোর একটাও নই। আমি অঙ্কের মাস্টার। তবে ওই পাগলগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করে শিল্পের কিছু কিছু বুঝতে পারি।

—এবার তাহলে বলুন, সিনর, আমার ইনক্লিনিজিয়ন আপনার কেমন লেগেছে।

—ভালো, খুব ভালো হয়েছে। তুমি মেয়েটির মাথার উপর একটা জ্যোতিষ্ক এঁকেছ। সেটা কী? একদল দর্শক বললেন 'ওটা ভেনাস', আর একদল বললেন, 'না, ওটা 'স্টার অব্ বেথেলহেম।'

—আপনার কী মনে হয়েছে?

—আমার কথা থাক। তুমি কী এঁকেছ? ওটা 'স্টার' না 'প্ল্যানেট'?

আর্টিমিসিয়া একটু ঘাবড়ে গেল। ঢোঁক গিলে বললে, ও দুটো শব্দও আমার অচেনা, সিনর। একটু বুঝিয়ে বলবেন?

বৃদ্ধ ঠক্ করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলেন, 'বুঝেছি! তোমার সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করতে হলে আমাকে শুরু করতে হবে একেবারে সেই 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে' থেকে। সেটা থাক। তুমি জান, 'স্টার অব্ বেথেলহেম' বলতে কী বোঝায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা জানি। যীশু যখন জেরুসালেমে জন্মগ্রহণ করেন তখন 'বেথেলহেম'-এর আকাশে হঠাৎ একটা তারা দেখা দিয়েছিল। তারই নির্দেশে পূর্বদেশ থেকে 'মাজাই'রা প্রভুদর্শনে আসেন। এ একটা অলৌকিক ঘটনা।

বৃদ্ধ ভদকার অবশিষ্টটুকু কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে বলেন, 'শোন বাছা! এ বিশ্ব প্রপঞ্চে কোনোদিন কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি, ঘটবে না, ঘটতে পারে না।'

—কিন্তু বাইবেল কি বলেননি যে, ওই তারকাটা আকাশে আর কখনো দেখা যায়নি? যাবে না।

—বাইবেল যা বলেছেন, তাই অন্ধের মতো মেনে চলতে হবে? জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও?

আর্টিমিসিয়া স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, 'আপনি তা মানেন না?'

বৃদ্ধ একটু কী ভেবে নিয়ে বলেন, 'তোমার এ কথার জবাব আমি দেব না। সক্রেটিসকে হেমলক পান করতে হয়েছিল, ব্রুনোকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছিল। আমি সে ভুল করব না। তবে শোন, আর্টিমিসিয়া, অলৌকিক বলে কোনো কিছু নেই। এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আগেও বারে বারে ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। তবে হ্যাঁ, বহু বছর পরে কারণ 'কমেট' সূর্যের কাছাকাছি আসে বহু বহু বছর পরে পরে। তখন আমরা তাকে দেখতে পাই। যীশুর জন্মের সময় এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা অলৌকিক নয়।'

আর্টিমিসিয়া ভয়ে ভয়ে বলে, 'কমেট' কাকে বলে, সিনর?

বৃদ্ধ হঠাৎ কাকে দেখতে পেয়ে ডেকে ওঠেন : হেই বান্টি! ইদিকে শোন তো একবার।

একটি সুদর্শন যুবক এগিয়ে আসে। মিলিটারি পোশাক। তার জুতোর নালে নালে ঠক্ করে শব্দ হয়। স্যালুট করে বলে, ইয়েস, সিনর?

—এই মেয়েটিকে চেন?

এবার ও আর্টিমিসিয়াকে একটা স্যালুট করে বলে, 'চিনি, স্যার। সিনোরা আর্টিমিসিয়া জেন্টেলেসচি!'

—গুড! ও এখানে এসেছে ট্যাঙস্-ট্যাঙস্ করতে করতে। তখন ও মাননীয়া সদস্যা ছিল না। কিন্তু ফেরার পথে যদি গাড়ি চড়ে না যায় তবে সেটা আমাদের আকাদেমিয়ার বদনাম! কিছু বুঝলে?

—ইয়েস সিনর। আর কিছু?

—নো থ্যাঙ্কস্।

—এবার তাহলে আমি একটা প্রশ্ন করি আপনাকে?

—কর?

—আমি গত সাত বছর এই সমাবর্তন-উৎসবে আসছি। আপনি আসছেন না হোক বিশ বছর। আমি কখনো শুনিনি, তাই আপনার কাছে জানতে চাইছি: সমাবর্তন উৎসবে ওই উচ্ছ্বাসটা এর আগে কখনো শুনেছেন? — 'ব্রাভা'?

বৃদ্ধের ভ্রূকুঞ্চন হল। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'নাঃ! এই প্রথম! এই বোকা মেয়েটা 'স্টার' আর 'প্ল্যানেট'-এর তফাৎ জানে না বটে, তবে ও এক হিম্মৎওয়ালি! আমি মানছি!

মধ্যাহ্নভোজ শেষ হলে সেই ছেলেটি এসে জানতে চাইল, 'আপনি যখন বাড়ি যেতে চাইবেন আমাকে জানাবেন, সিনোরা। আপনার ফিরে যাবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা আছে।'

—কিন্তু আপনাকে কোথায় পাব? আপনার পরিচয়টা তো জানি না আমি। শুনেছি শুধু : আপনার নাম বান্টি!

ছেলেটি হাসে। বলে, 'না ম্যাডাম, আমাকে সিনর আদর করে ওই নামে ডাকেন। আমার নাম ক্যাপ্টেন ব্রামান্টি। আমি আছি হিজ লর্ডশিপের ইন্টেলিজেন্স বিভাগে।'

আর্টিমিসিয়া সুযোগ বুঝে জানতে চায় : উনি কে বলুন তো?

ব্রামান্টি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর মুখোমুখি বসে। বলে, 'সে কী সিনোরা! সারাটা দুপুর ওঁর সঙ্গে বসে গল্প করলেন, অথচ ওঁকে চেনেন না? উনি এই আকাদেমিয়ার একজন প্রবীণ সদস্য। বস্তুত একমাত্র সদস্য যিনি ছবিও আঁকেন না, মূর্তিও গড়েন না।'

—তবে কী করেন উনি?

—আকাশ দেখেন।

—আকাশ দেখেন! তার মানে? আকাশে দেখার কী আছে?

— তা উনিই বলতে পারবেন। যে রাত্রে আকাশে চাঁদ থাকে না, আর আকাশটা মেঘে ঢেকে যায় না সে রাত্রে ওঁকে নিশ্চিত খুঁজে পাবেন ওঁর বাড়ির ছাদে। উনি তারাদের প্রেমে একেবারে 'হেডওভার হীল্স!'

—আশ্চর্য মানুষ তো!

— তা বলতে পারেন। ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে নামকরা পাগল। ওঁর নাম গ্যালেলিও গ্যালিলি!

আর্টিমিসিয়ার উপর এ নামটায় কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। এ নাম সে কখনো শোনেনি। ও জানতো না — লেঅনার্দো আর মিকেলাঞ্জেলোর পর এই বিশ্ববরেণ্য ফ্লোরেন্টাইনের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁকে বিশ্ব-সংস্কৃতি কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

আর্টিমিসিয়া বললে, 'আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তা হলে ব্যবস্থা করে দিন, আমি এখনি বাড়ি ফিরতে চাই। আমার বাচ্চাটাকে রেখে এসেছি তো?'

—বুঝলাম। সিনর পেত্রো অন্তোনিয়োর হেপাজতে?

—কী আশ্চর্য! আপনি আমার স্বামীর নামও জানেন?

ছেলেটি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, 'জানি, সিনোরা। আমি এ শহরের অনেক কিছুরই খবর রাখি। আগেই বলেছি, আমি আছি কসিমো পরিবারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগে। তাই শুধু ফ্লোরেন্স নয়, মিলান, পাদুয়া, রোম এমন কি অস্ট্রিয়া-ফ্রান্সের অনেক খবর আমাকে রাখতে হয়। আপনার স্বামীকে আমি দীর্ঘ দিন ধরে চিনি, যদিও তিনি আমাকে চিনতে পারবেন না।'

আর্টিমিসিয়া রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। পেত্রো ফ্লোরেন্সের একজন নামকরা বাসিন্দা নয়। তাহলে ও লোকটা তাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে কোন সূত্রে? কিন্তু এত স্বল্প পরিচয়ে সে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। তাই বলল, 'চলুন তাহলে। আমার ফেরার ব্যবস্থা করে দিন।'

ব্রামান্টি কিন্তু উঠে দাঁড়ালো না। মুখ নিচু করে সে কী যেন ভাবছে।

—কী হল? যাবেন না।

—যাব তো বটেই। আমি ভাবছি, কথাটা আপনাকে বলা ঠিক হবে কি না।

— কোন কথাটা?

—যে কথাটা আপনি জিগ্যেস করলেন না — আমি কোনসূত্রে আপনার স্বামীকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি।

—বেশ তো। বলুন না সে কথা।

— না। আজ নয়। এত অল্প পরিচয়ে সে সব প্রসঙ্গ আলোচনা করায় সৌজন্যের বাধা আছে। তাছাড়া 'প্রফেশনাল এথিক্সে' বারণ।

আর্টিমিসিয়া একটু অভিমান করে বলে, 'তাহলে সে প্রসঙ্গ তুললেন কেন?'

— সেসব কথা আলোচনা না করলেও এখনি আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখা বোধহয় উচিত হবে, আমার। বর্তমানে আপনি কিন্তু বেশ কিছুটা 'ভাল্‌নারেব্‌ল্‌'!

—'ভালনারেব্‌ল্‌'! তার মানে? আমার বিপদের আশঙ্কাটা কেন?

— যেহেতু আজ সকাল থেকে আপনি অনেকের ঈর্ষ্যার টার্গেট হয়ে গেছেন। অনেক-অনেক শিল্পী প্রত্যাশা করেছিলেন যে, এ বছর তাঁদের নাম ওই 'সম্মানীয় সদস্য তালিকায়' থাকবে। তা থাকেনি। পরিবর্তে একজন মহিলা তাঁদের টপ্‌কে সেই পদকটা পেয়ে গেলেন।

আর্টিমিসিয়া নতনয়নে বলল, 'বুঝেছি। আপনি কী বলতে চান। কিন্তু এতে তো আমার কোনো হাত ছিল না।'

—অনেকে ভাবছেন, আপনার প্রতিপত্তিশালী 'আঙ্কল'-এর প্রভাবেই আপনি একখানিমাত্র

তৈলচিত্র এঁকে এই সম্মানটা পেয়ে গেলেন।

—আমি নাচার। প্রথমত উনি আমার 'আঙ্কল' নন, পিতৃবন্ধু। দ্বিতীয়ত তিনি সুপারিশ করেছেন কি না, আর সেজন্যই আমার এ সম্মানলাভ হয়েছে কি না, তাও আমি জানি না। তৃতীয়ত আপনারা জানেন না। ব্র্যান্ডিনেল্লি অন্তত জানেন, আমি তিনচারচারখানা ছবি এঁকেছি। একখানা নয়।

ব্রামান্টি বলে, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, মাদাম। আমি ও কথা বলিনি। বলেছি, 'অনেকে ভাবছেন'। সে যাই হোক। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। বাড়িতে একা-একা থাকেন তো। তাই বল্‌ছি।

— একা-একা থাকব কেন? আমি বিবাহিতা। আমার স্বামীও আমার সঙ্গে থাকেন।

ব্রামান্টি ম্লান হেসে বলল, 'আপনি আমার আগের কথাটা ভুলে গেছেন। এ শহরের অনেক বাসিন্দার অনেক খবর আমি রাখি। যেহেতু আমি এই শহরের চীফ-ইন্টেলিজেন্স অফিসার। কিন্তু ওসব কথা থাক। চলুন, আমরা যাই এবার।'

ওরা দুজনে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। তখন আকাদেমিয়ায় চাপ ভিড়। সকালের সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিতরা ফিরে যাচ্ছেন। আবার অপরাহ্ণের সাধারণ দর্শকের দল ধীরে ধীরে জমাট বাঁধছে। আকাদেমিয়ার সামনে মার্বেলের গ্র্যান্ড-স্টেয়ার্স দিয়ে ওরা দুজন নেমে এল। ব্রামান্টির হাতে একটি বড় হাতব্যাগ। তাতে আর্টিমিসিয়ার সম্মানপত্র, ফুলের ব্যুকে এবং তার অনুপস্থিত 'স্পাউস'-এর জন্য এক প্যাকেট খাবার। ব্রামান্টি বলল, 'এইখানে আপনি অনুগ্রহ করে একটু দাঁড়ান। আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি।'

অশ্বশকটগুলি সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে সামনের ফাঁকা ময়দানে। ব্রামান্টি সে দিকে অগ্রসর হবার ঠিক পরেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি মহিলা এগিয়ে এসে বললেন, 'একটা কথা, মাদাম! আপনি আমার মাথায় একরাশ ঝাঁটার কাঠি এঁকেছেন কেন?'

আর্টিমিসিয়া চোখ তুলে তাকায়। চিনতে পারে বক্তাকে : ভীনা। প্রশ্নটা সে একাই করেছে বটে কিন্তু একদল এন্‌লিস্টেড মডেল তাকে ঘিরে আছে। এবং তাদের ঘিরে একরাশ ঊর্ধ্বগ্রীব উদীয়মান শিল্পী।

আর্টিমিসিয়া শান্তকণ্ঠে বলে, 'তুমি ভুল করছ ভীনা — আমি তোমার প্রতিকৃতি আঁকিনি। তোমাকে মডেল করে ওই মেয়েটিকে এঁকেছিলাম।'

—সরি ম্যাডাম! আপনি 'প্রফেশানাল এথিক্স'কে ধূলায় লুটিয়েছেন। আমাকে মডেল করে আপনি একটি অন্ধ ভিখারিকে আঁকতে পারেন না।'

— কেন পারব না? তুমি বারবার ভুল করছ! তোমার প্রাপ্য আমি মিটিয়ে দিয়েছি। তোমাকে মডেল করে আমি আমার বিষয়বস্তুকেই আঁকতে পারি। অনেকবার বলেছি — ওটা তোমার পোর্ট্রেট নয়!

ওর পাশ থেকে আর একটি মেয়ে বলে ওঠে, 'না। তা আপনি পারেন না। তাতে মডেলকে অপমান করা হয়। ছবিটা দেখে কেউ ভীনাকে চিনতেই পারছে না। আপনার এ স্বেচ্ছাচারিতা আমরা বরদাস্ত করব না। আমাদের একটি ইউনিয়ান আছে। আমরা তার তরফে প্রতিবাদ জানাব। আপনাকে খেসারাদ দিতে হবে।'

আর্টিমিসিয়া জবাব দিতে পারল না। কারণ তার আগেই ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এল ব্রামান্টি। বললে, 'রাস্তার মধ্যে আপনারা এভাবে একজন ভদ্রমহিলাকে আক্রমণ করতে পারেন না। সরে যান সবাই।'

ভীনা রুখে ওঠে, 'আপনি কে মশাই? মেয়েদের বচসার মধ্যে নাক গলাতে এসেছেন। আপনিই সরে পড়ুন, সিনর হরিদাস পাল!'

সবাই অট্টহাস্য করে ওঠে।

ব্রামান্টি কঠিনস্বরে বলে, 'লুক হিয়ার সিনোরিটা! আপনাকে একবার সাবধান করেছি, দ্বিতীয়বার কিন্তু করব না। রাস্তার মধ্যে এমন অসভ্যতা করলে আপনাকে অ্যারেস্টকরতে বাধ্য হব আমি!'

একটু থমকে গেল ভীনা। হঠাৎ তার চোখ দুটি জ্বলে উঠল। বললে, 'আপনার স্পর্ধা তো কম নয়! অ্যারেস্ট করবেন? আমাকে চেনেন? আমি লোকটা কে?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি সিনোরিটা ভীনা। খুব ভালোভাবেই চিনি। আপনি বরং আমাকে চেনেন না। আপনি আর একটি কথা বললে আমি আপনার হাতে হাতকড়া পরাতে বাধ্য হব কিন্তু।

পার্শ্ববর্তিনী ভীনার কানে কানে কী যেন বলে। বোধকরি ব্রামান্টির পরিচয়। সে মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে। বলে, 'অল রাইট! আপনি এঁকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিন। কিন্তু আপনি মনে রাখবেন সিনোরা, আমরা কিন্তু আপনার কাছ থেকে যথারীতি খেসারতআদায় করব। আপনি সহজে ছাড়া পাবেন না।'

ব্রামান্টি এদিকে ফেরে। আর্টিমিসিয়াকে অনুরোধ করে গাড়িতে উঠে বসতে। গাড়িটা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে আকাদেমিয়ার দোরগোড়ায়।

আর্টিমিসিয়া কথা বাড়ায় না। নীরবে উঠে বসে ব্রুহাম গাড়িটায়। বান্টির মুখোমুখি। গাড়িটা চলতে শুরু করতেই মেয়ের দল সমস্বরে শেয়ালের ডাক ডেকে ওঠে।

আর্টিমিসিয়া প্রশ্ন করে, 'কী হল বলুন তো ক্যাপ্টেন ব্রামান্টি? ওরা এভাবে আমাকে সদলবলে আক্রমণ করল কেন?'

ব্রামান্টি বললে, 'সে-কথা তো আমি আগেই বলেছি, ম্যাডাম! আপনি এখন অনেকের ঈর্ষ্যার পাত্র! আপনি: ভালনারেব্‌ল্!'

সে রাত্রে পেত্রো বাড়িই ফিরল না। কোথায় রাত-কাটালো লর্ড যীসাস্ জানেন। পালমিরাকে নিয়ে ও নেমে এল দ্বিতলে।

গ্র্যানিকে সবিস্তারে সব কথা খুলে বলল। তার আশাতীত সম্মানের কথা আর আশঙ্কাতীত অপমানের কথা। পেত্রোর খাবারের প্যাকেটটা নষ্ট করে লাভ নেই। কাল সকালে পচে উঠবে। ওরা — দিদা-নাতবউ সেটা ভাগ করে শেষ করল। নিমন্ত্রণ পত্রটা পেয়ে আর্টিমিসিয়া আনন্দে নৃত্য করেছিল; কিন্তু এতবড় সম্মানটা পেয়ে সে আনন্দ করতে পারল না। তার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রামান্টির সাবধানবাণী : য়ু আর ভালনারেব্‌ল্।

বুড়ি বললে, তোর অবস্থাটা বুঝতে পারি, নাতবউ! তুই এতবড় সম্মানটা পেলি, অথচ তা সেলিব্রেট করতে পারছিস না।

—কিন্তু কেন বল তো দিদা? পেত্রো তো আমার স্বামী। আমার সম্মানে সেও তো

সম্মানিত। তাহলে সে এত মর্মাহত হবে কেন?

—এর তো সহজ জবাব রে। সে শুধু তোর মরদ নয়। সে তোর প্রতিদ্বন্দ্বী! তার ছবি বিক্রি হয় না, আর তুই হয়ে গেলি আকাদেমিয়ার 'সম্মানিত সদস্য'! ও সেটা সহ্য করতে পারছে না। এই আর কি?

—কিন্তু আমার অপরাধটা কোথায়?

—প্রতিভাবান হওয়া। ঘরওয়ালী যদি ঘরকে আর বরকে ডিঙিয়ে যায় তখন তার এমন দশাই হয়। এ তো স্বাভাবিক!

আর্টিমিসিয়া বলে, 'একটা কথা, দিদা! সেদিন কথাটা তুমি বলতে গিয়েও বলনি — আমিও জানতে চাইনি। আজ জানতে চাইছি। বলবে?'

—কী কথা?

— পেত্রোর সম্বন্ধে তুমি কী একটা কথা জান, আমাকে বলতে পারনি। সেটা কী? এটা আমার মেয়েলি কৌতূহল নয়, দিদা! আমাকে লড়াই করে বাঁচতে হবে। এ আমার ভবিতব্য। এ আমার সাফল্যের মূল্য! সেদিন তুমি কোনো কথা আমার কাছ থেকে লুকাতে চেয়েছিলে?

বুড়ি দম ধরে কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বললে, ঠিক আছে। বলব। শোন! তবে ঘটনাটা এমন কিছু নয়। কিন্তু তা থেকেই পেত্রো আর আঁদ্রের মধ্যে একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

—কিন্তু কারণটা কী?

—বলি শোন......

অনেকদিন আগেকার কথা। আঁদ্রের বয়স তখন বছর আট-নয়। বুড়ি তাকে নিয়ে দোতলায় থাকে, আর পেত্রো তার বউকে নিয়ে তিনতলায়। পেত্রোর বিয়ে হয়েছে মাত্র বছর-খানেক আগে।

ভোররাত নাগাদ হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বুড়ির। তখনো আকাশে ভুক্কো তারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। গাছ-গাছালিতে তখনো পাখ পাখালির কলতান শুরু হয়নি। হঠাৎ বুড়ির মনে হল: তিনতলা থেকে কী-এক ধরনের অস্বাভাবিক শব্দ ভেসে আসছে! বুড়ি ডেকে তুলল তার নাতিকে। প্রথমটা সে উঠতেই চায় না! শীতের রাতে কম্বল ছেড়ে। তারপর ঘুম-চোখে উঠে বসে।

দিদা বললে, 'তুই একবার তিনতলায় গিয়ে দেখে আয় — ব্যাপারটা কী। পেত্রোটার যদি কোনো বিপদ হয়ে থাকে—'

আঁদ্রে চোখ কচলাতে কচলাতে বলে, 'তাহলে আন্টি নেমে এসে তো আমাদের খবর দেবে—'

—আর যদি তোর আন্টিরই কিছু হয়ে থাকে?

— তা হলে পেত্রো কাকু নেমে এসে আমাদের জানাতো।

—কিন্তু দুজনেরই যদি একসঙ্গে বিপদটা হয়ে থাকে? দুজনেই যদি এমন গোঁ-গোঁ করতে থাকে?

আঁদ্রে ধমক দেয়, 'তা কখনো হয়? একসঙ্গে দুজনেরই?'

—হয় রে, হয়। শীতের রাতে ফায়ার-প্লেসে আগুন নেবাতে ভুলে গেলে এমন দমবন্ধ হয়ে মানুষে মরেও যায়। যদি সব দরজা-জানলা বন্ধ রেখে ওরা শুয়ে থাকে।

— তোমার যত সব উদ্ভুটে কল্পনা!

— হোক উদ্ভুটে! তুই একবার দেখে আয় বাবা। লক্ষ্মী সোনা।

আঁদ্রে রুখে উঠেছিল, কিন্তু কেমন করে দেখব? ওরা তো সিঁড়ির সদর দোর বন্ধ করে শুয়েছে!

—তুই ধাক্কা দিলে কেউ না কেউ এসে খুলে দেবে। হয় পেত্রো, নয় তোর আন্টি! যদি কেউ না খোলে তাহলে সিঁড়ির ল্যান্ডিঙের উপরে যে স্কাই-লাইটটা আছে—

—জানি,জানি। সে আর আমাকে বলতে হবে না।

সেই বিকল্প পথে ও অনেকবার ছাদ থেকে বেওয়ারিশ কাটা-ঘুড়ি উদ্ধার করে এনেছে। আঁদ্রে জানে, ছাদের দিকপানে ওদের শোবার ঘরে একটা কাচের জানলা আছে। পর্দাটানা না থাকলে সেই কাচের জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরটাও দেখা যায়। যদি দেখে ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাতাসের অভাবে গোঁ-গোঁ করছে, তাহলে শক্ত কিছু দিয়ে জানলার একটা কাচ ভেঙে দেবে। বললে, 'ঠিক আছে। আমার ওভারকোটটা দাও! বড় ঠাণ্ডা!'

হঠাৎ এখানেই গল্পটা থামিয়ে দিল বুড়ি।

আর্টিমিসিয়া বলে, তারপর?

—তারপর কী হল তা তো আমি জানি না, নাতবৌ!

—মানে? আঁদ্রে গিয়ে কী দেখেছিল? কে অমন গোঁ-গোঁ করছিল? ফিরে এসে ও কী বলল?

— কিছুই বলেনি। আমি অনেকবার জানতে চেয়েছি। কিন্তু সে কিচ্ছুটি বলেনি!

—তা কেমন করে হয়? শব্দটা কীসের?

—বললাম তো! আঁদ্রে আমাকে কিছু বলেনি। ফিরে এসে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। পরদিনও সে কিছুই বলেনি। কিন্তু তারপর থেকে আঁদ্রে আর কোনোদিন পেত্রোর সঙ্গে কথা বলেনি!

আর্টিমিসিয়া রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। ব্যাপারটা কী হতে পারে?

অনেকক্ষণ দম ধরে বসে থাকল বুড়ি। আর্টিমিসিয়া আবার তাগাদা দেয়, 'তুমি কিছু আন্দাজ করতেও পারনি?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ি বলেছিল, 'একেবারে যে পারিনি তা নয়।'

— সেটা কী বল তো?

—আমার মনে হয়, আঁদ্রে দরজায় ধাক্কাই দেয়নি। ও নিশ্চয় স্কাইলাইট দিয়ে ছাদে গেছিল। ওই জানলার ভিতর দিয়ে পেত্রোদের শোবার ঘরে কিছু একটা অশোভন দৃশ্য দেখেছিল। কী দেখেছিল তা লজ্জায় আমার কাছে স্বীকার করেনি। ও তো তখন নেহাৎ ছোট— স্বামী স্ত্রীর জীবন সম্বন্ধে ওর তখন কোনো ধারণাই হয় তো ছিল না। কাকুর এ জাতীয় অশালীন ব্যবহারে ও এতই আঘাত পেয়েছিল যে পেত্রোর সঙ্গে কথাবার্তাই বন্ধ করে দিয়েছিল। আজও সে পেত্রোর সঙ্গে কথা বলে না।

আজব ঘটনাচক্র। আর্টিমিসিয়ার ঠিক বিশ্বাস হয় না। গ্র্যানি যা বলছে তা হতে পারে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির পরেও আঁদ্রে কেন পেত্রোকে ক্ষমা করতে পারল না? তখন তো সে নরনারীর জীবনের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে জেনেছে? তাহলে কী হতে পারে?

মেরী ডি গ্যারার্ডের (Mary D. carrard) গবেষণা গ্রন্থ অবলম্বনে কারি বয়েড ম্যাক্‌ব্রাইড (Kari Boyd Mac Bride) আর্টিমিসিয়ার যে সংক্ষিপ্ত প্রামাণিক জীবনী রচনা করেছেন তাতে দেখছি, এই অসামান্য শিল্পীর উনষাট (1593-1652) বৎসরের জীবনকালের ভিতর মাত্র আটটি বৎসর অতিবাহিত করে যান ফ্লোরেন্সে (1613-1621)। ওই একুশ সালেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ হয় তাঁর একখানি তৈলচিত্র উফিজি সংগ্রহশালা ক্রয় করে সেখানে প্রদর্শনের আয়োজন করেন। ছবিটি মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ারের ফরমায়েস মতো *জুডিথ কর্তৃক হলোফার্নেস বধ*। যে রঙিন ছবির একটি অনুলিপি এই গ্রন্থের সামনের দিকে দেওয়া হয়েছে; এবং যার একটি বর্ধিত অংশও সংযুক্ত করা গেছে। এ গ্রন্থের অধম গ্রন্থকার 1972 সালে উফিজি সংগ্রহশালায় হয়তো সেই অনবদ্য চিত্রটি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিল।'হয়তো' লিখছি এ জন্য যে, সে সময় আমি আর্টিমিসিয়ার নামটাও জানতাম না। তাই সেই হীরে-মানিক-মুক্তোর ভিড়ে এ ছবি দেখেছি কি না আদৌ স্মরণ করতে পারি না। ম্যাকব্রাইড এই অসামান্য মহিলা চিত্রকরের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে লিখেছেন:

During her years in Florence, the grand Duke Cosimo II of the powerful Medici family commissioned quite a few paintings from her and Gentilesci left Florence to return to Rome upon his death in 1621. From there she probably moved to Genoa ...... and met Anthony Van Dyck, a very successful painter of the era..... Evidently she and her husband had separated and she eventually lost touch with him altogether.–

কী কারণে বিচ্ছেদ ঘটল আর কেনই বা বাকি জীবনে তাঁরা পরস্পরের খবর রাখেননি তা গবেষক বলেননি।

আপনারা অনুমতি করলে এইটুকু তথ্যের উপর জীবনী -উপন্যাসের বাকি অংশটা রচনা করতে পারি।

আর্টিমিসিয়াকে আকাদেমির সম্মানিত সদস্য রূপে ঘোষণা করার পর পেত্রোর আনাগোনা আরও কমে যায়। সে সপ্তাহান্তে হাজিরা দিতে আসত তার ডেরায়। কোথায় সে থাকে জানা নেই, জানবার কৌতূহলও ছিল না আর্টিমিসিয়ার। প্রথমত পালমিরাকে সামাল দিতেই সে গলদঘর্ম, তার উপর একের-পর এক কমিশন আসতে থাকে। দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হয় আর্টিমিসিয়াকে।

এই সময়ে সে যে ছবিগুলি আঁকে তার অনেকগুলিই অন্যান্য শিল্পীর আঁকা বলে শিল্প ইতিহাসে চিহ্নিত। যেগুলি গবেষকরা আর্টিমিসিয়ার আঁকা বলে নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত করেছেন তার ভিতর একটির নাম লুক্রেশিয়া (Lucretia 1621)। একটি ক্লিওপেট্রা (Cleopatra 1620-1622)। জুডিথ ও তার সঙ্গিনীর (Judith and her Maidservant) ছবিটি সম্ভবত কিছু আগে আঁকা।

মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ার তাঁর কাজের চাপে রোমে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। গ্যালেলিওর জীবনও ক্রমে দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে তিনি বৃহস্পতি গ্রহের চার-চারটি উপগ্রহকে তাঁর দূরবীনের মাধ্যমে শনাক্ত করে ফেলেছেন। একটি থিসিস-এ তিনি পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বপ্রপঞ্চের ধারণাকে অস্বীকার করে কোপারনিকাস-কৃত সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের থিয়োরিকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন। এ তথ্য বাইবেল বিরুদ্ধ বলে রোম থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হল পোপের অনুশাসন গ্রহণ করতে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি ও সূর্যের চারিপাশে তার আবর্তন ছন্দকে অস্বীকার করতে স্বয়ং পোপ তাঁকে আদেশ করলেন। মর্মাহত গ্যালিলি প্রাণের ভয়ে সে কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। আর্টিমিসিয়ার সঙ্গে পত্রযোগে তাঁর দীর্ঘ দিন ঘনিষ্ঠতা ছিল।

আর্টিমিসিয়ার প্রতিভাকে যাঁরা চিনতে পেরেছিলেন এ ভাবেই তাঁরা একে-একে ওর জীবন থেকে দূরে সরে গেলেন। এতদিন অর্থাভাব ছিল না। এবার তা শুরু হল।

পেত্রো আসা-যাওয়া আরও কমিয়ে দিয়েছে। আগে সপ্তাহান্তে আসত, এখন মাসান্তে আসে-কি-আসে না। পালমিরা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। এখন সে সমবয়সীদের সঙ্গে 'এক্কা-দোক্কা' খেলে, স্কিপিং করে। পড়াশুনার হাঙ্গামা নেই। সেযুগে মেয়েদের কোনো স্কুল ছিল না। আর্টিমিসিয়া তবু ওকে মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় পড়াতে বসায়। পালমিয়া ক্রমশ রপ্ত করে ফেলে আল্‌ফা, বিটা, গামা, ডেলটা। কিন্তু পড়াশুনায় তার মন নেই। বরং মায়ের চারকোল নিয়ে মেজেতে, দেওয়ালে ছবি আঁকতে ভালোবাসে।

অনেকদিন কোনো কমিশন পায়নি। আর্টিমিসিয়া সেদিন সকালে তার বাক্স হাতড়ে দেখল নগদ অর্থ সামান্যই অবশিষ্ট। সপ্তাহ-খানেক চলতে পারে। এতদিন ব্যাঙ্কে সে শুধু অর্থ জমিয়েই গেছে। সংসার চালিয়েছে খদ্দেরদের দেওয়া নগদ-অর্থে।

সেদিন ব্যাঙ্কের চেকবই আর পাস-বইটা নিয়ে তাকে যেতে হল মেদিচী-ব্যাঙ্কে কত 'ডুকাট' তুলবে স্থির করার আগে ও জানতে চাইল ওর অ্যাকাউন্টের পুঁজিটা কত।

মেদিচী ব্যাঙ্ক ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যও। ইল দিভিনো কসিমো দ্য ম্যাগ্‌নিফিশেন্ট প্রতিষ্ঠিত। গোটা ইয়োরোপে তার সুনাম।

ব্যাঙ্কের করনিক-ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করে 'আমাদের অ্যাকাউন্টে কত আছে একটু দেখে বলবেন?'

করনিক ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে পাসবুকটা নিলেন। দেখে বললেন, 'এ কী? আপনি তো দেখছি চার-পাঁচ বছর এটাকে আপটুডেট করাননি। চার বছর আগে ছিল প্রায় তিন হাজার ডুকাট।'

—বর্তমান ব্যালেন্সটা কত একটু দেখে বলবেন?

—বলব। নিশ্চয় বলব। কিন্তু আপনি কি গত পাঁচবছরের ভেতর এই অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো অর্থ তোলেননি বা জমা দেননি?

—না তুলিনি। শুধু জমাই দিয়ে গেছি।

—অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি হিসাবের খাতা দেখে এসে বলছি।

ভদ্রলোকের ফিরতে বেশ একটু দেরিই হল। ফিরে এসে বললেন, 'সিনোরা! আপনি

দয়া করে একবার আমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করুন। ওই যে ওই ঘরে।'

আর্টিমিসিয়া অবাক হল। এ আবার কি বখেড়া? সে তো কোনো অনুগ্রহ চাইতে আসেনি! নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে নিজের জমানো ডুকাট তুলতে এসেছে। ম্যানেজারের অনুমতি লাগবে কেন? তবু কথা-কাটাকাটি না করে সে এগিয়ে গেল ম্যানেজারের ঘরের দিকে।

ম্যানেজার সসম্ভ্রমে ওকে বসতে বললেন, 'সুপ্রভাত সিনোরা।'

আর্টিমিসিয়ার আশঙ্কা হচ্ছিল প্রভাতটা নিরঙ্কুশ 'সু'-প্রযুক্ত নয়। কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তবু বললে, 'সুপ্রভাত! আপনি কি আমার খোঁজ করছিলেন?'

ম্যানেজার বলেন, 'আপনি তো দেখেছি অনেকদিন আসেন না ব্যাঙ্কে?'

—না, সময় পাই না। কিন্তু অ্যাকাউন্টটা তো চালু আছে। জমাও দেওয়া হচ্ছে, উইথড্রয়ালও হয়। তাই না?

—নিশ্চয়! নিশ্চয়। সে জন্য নয়।

—তবে কী জন্য সিনর? আমি তো কোনো 'ফেবার' চাইছি না। আমার জমানো অর্থ আমি নিজেই তুলতে এসেছি।

—বটেই তো, বটেই তো। সে-কথা একশোবার। কিন্তু সিনোরা। আমি জানতে চাইছিলাম: সিনর পেত্রো আন্তোনিয়ো এখন কোথায়?

এতক্ষণে ওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। বলে, 'লুক হিয়ার, স্যার। আমার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে নির্দেশ আছে 'আইদার অর সার্ভাইভার'। আমরা যে-কেউ জানতে চাইতে পারি যে, অ্যাকাউন্টে কত 'ব্যালান্স' আছে। যে-কেউ একাই চেকে সই দিয়ে নগদে অর্থ তুলতে পারি —

ম্যানেজার মাঝপথেই বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'একশোবার! তা কেন পারবেন না? সেজন্য ও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করিনি।'

—তবে ব্যালেন্সটা জানাচ্ছেন না কেন? এর সঙ্গে আমার স্বামী কোথায় আছেন, কেমন আছেন, জানতে চাইছেন কেন?

—আপনি অহেতুক রাগ করছেন, সিনোরা! আমি সেজন্য ও কথা জানতে চাইনি। আমি শুধু বলছি যে, আপনি ওই অ্যাকাউন্ট থেকে এই মুহূর্তে কিছু তুলতে পারবেন না!

—কিন্তু কারণটা কী?

— যেহেতু ওই অ্যাকাউন্টে বর্তমান ব্যালেন্স মাত্র এক ফ্লোরিন। সেটাই হচ্ছে ব্যাঙ্কের আইন-অনুসারে 'মিনিমাম ব্যালেন্স'!

রীতিমতো চমকে ওঠে আর্টিমিসিয়া। বলে, 'তা কেমন করে হয়?'

—কারণটা তো আপনিই বললেন, সিনোরা। আপনাদের ওই জয়েন্ট-অ্যাকাউন্টটায় নির্দেশ আছে 'আইদার অর সার্ভাইভার'। যে কোনো অংশীদার একাই সই করে টাকা তুলতে পারেন।

সর্বনাশটা যে কী নিদারুণ এতক্ষণে আন্দাজ করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে অমানুষিক পরিশ্রমে সে যে অর্থ ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কে জমিয়ে গেছে তা সম্পূর্ণ ছিন্তাই হয়ে গেছে। হেতু ওর মূর্খামি। ওর বিশ্বাসপ্রবণতা : 'অ্যাকাউন্টটা' ছিল 'আইদার অর সার্ভাইভার'।

ম্যানেজার জানালেন, 'মাস তিনেক আগে সিনর পেত্রো আন্তেনিয়ো নিম্নতম আমানতটুকু অবশিষ্ট রেখে বাকি আমানতের সবটা তুলে নিয়ে গেছেন।

মাথার মধ্যে টলে উঠল ওর। ও আজ কপর্দকহীনা। ও একা নয়, সঙ্গে আছে ওর নাবালিকা কন্যা যে ছাদের কার্নিশে রবিনপাখি দেখলে হাততালি দিয়ে আজকাল গুনতে পারে 'ওয়ান ফর জয়! দু ফর সরো...'

হ্যাঁ, 'টু ফর সরো'!

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়।

ম্যানেজার বলেন, 'আপনি কি কিছু 'ওভার-ড্রাফট' নিতে চান, সিনোরা?'

—ওভার-ড্রাফট? ঋণ? হ্যাঁ, অর্থের প্রয়োজন আমার আছে। কিন্তু আমানত তো কিছু নেই। কী জমা রেখে ঋণ নেব?

—আপনার প্রতিভা, সিনোরা। আপনাকে আমি চিনি। গোটা ফ্লোরেন্স আপনাকে চেনে! আমার কাছে সঙ্কোচ করবেন না। আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে ব্যাঙ্ক আপনাকে বিনা-আমানতেই দু-চারশো' ফ্লোরিন ঋণ দিতে স্বীকৃত। পরের তৈলচিত্রটা বিক্রয় হলে আপনি ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারেন।

—থ্যাঙ্কু, সিনর। আমি একটু ভেবে দেখি।

—দেখুন। তবে আমার পরামর্শ : আপনার এই অ্যাকাউন্টে কোনো অর্থ জমা দেবার আগে অনুগ্রহ করে ওই শর্তটা প্রত্যাহার করে নেবেন: 'আইদার অর সার্ভাইভার'!

আর্টিমিসিয়া চোখ তুলে তাকালো ম্যানেজারের দিকে।

—আয়াম সরি, ম্যাডাম। রিয়ালি সরি। আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো মনে করবেন। আমি জানি, ওই অ্যাকাউন্টে আছেন দুজন অংশীদার। একজন ক্রমাগত অর্থ বিনিয়োগ করে যান আর অন্য একজন ক্রমাগত সেটা তুলে নিয়ে যান!

আর্টিমিসিয়া দাঁতে দাঁত দিয়ে অশ্রুসংবরণ করল। অস্ফুটে বললে, থ্যাঙ্কু!

'বুক দিলে যে, মুখ দিলে যে, ভুখ দিতে সে ভুলল না...'

ঈশ্বর যাকে এমন নিদারুণ অঙ্কন-প্রতিভা দিলেন তাকেও অন্নচিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারলেন না। শুধু নিজের নয়, তার চুনুমুনু পাল্‌মেরার! ওকে যারা চিনতে পেরেছিল—যাঁদের কাছে হয়তো ও সসঙ্কোচে কিন্তু সসম্মানে কিছু ঋণ প্রার্থনা করতে পারত — তাঁরা কেউ এখন ফ্লোরেন্সে নেই। ওর 'আঙ্কল' গেছেন রোম-এ; কসিমো অসুস্থ, আর গ্যালেলিও পোপের কাঠগড়ায় আসামী। আর্টিমিসিয়া বাড়ি ফিরে এল। তার হাতবটুয়াটা — সেই যেটা মোহর ভর্তি করে 'আঙ্কল' ওকে Inclinazione-এর বায়না দিয়েছিলেন — সেটা উবুড় করে ঢেলে ফেলে টেবিলে। সকালেই একবার গুনতি করেছে। এখন আবার একবার করল। দিন সাত-দশ চালানো যাবে। তারপর ঘন অন্ধকার! এত অল্প সময়ে সে কোনো ছবি শেষ করে উঠতে পারবে না। পারলেও এত কম সময়ে তা বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহের কোনো সম্ভাবনা নেই। শখের জিনিস এতদিন কিছু কেনেনি — যা বন্ধক দেওয়া যায়। আছে শুধু কিছু উপহার। ওর মা তাঁর মৃত্যুশয্যায় যা দিয়ে গিয়েছিলেন ওর বাবাকে — যে গহনাগুলি নিদারুণ অর্থাভাবেও ওরাজিও কখনো বন্ধক রাখেনি।

পালমিরা শিশু। কিন্তু মায়ের মুখ দেখে শিশুরাও কিছু-কিছু বুঝতে পারে। আর্টিমিসিয়ার গাউনটা টেনে ধরে পালমিরা জানতে চায়, কী হয়েছে মাম্মি? তুমি এত কী ভাবছ?

মিছে কথা ও বলতে পারে না। শিশুর কাছেও নয়। বললে, আমাদের একটা বিপদ হয়েছে, মা। ব্যাঙ্কে আমার যে অর্থ ছিল তা হঠাৎ খোয়া গেছে.....

—'খোয়া গেছে'? মানে? চুরি গেছে? কে চুরি করল, মাম্মি?

—হ্যাঁ, চুরি ছাড়া আর কী বলব একে? তুমি ভেব না মা-মণি। আমি তো আছি।

—বাপি কোথায়? তাকে একটা খবর দাও না, মা!

হঠাৎ হু-হু- করে কেঁদে ফেলল আর্টিমিসিয়া। সত্যিকথা বলার গুমরটা আর রক্ষা করা গেল না। বলতে পারল না, 'তোর বাপিই যে চুরি করেছে মা-মণি! তার কাছে কেমন করে হাত পাতব?'

গ্র্যানিকেও এই নিষ্ঠুর সত্যকথাটা বলতে পারল না। বলতে তাকে হবেই। বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে যাবার আগে। তবে নিজের মনটাকে আগে সামলে নিতে হবে।

একতলার দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে আনল। পালমিরাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। নিজে খেল না। সারাদিন এঘর-ওঘর পায়চারি করতে থাকে। দুশ্চিন্তায় পাগল হবার জোগাড়!

উপায় নেই। ওরাজিও যা করেনি, ওকে তাই করতে হবে। মায়ের উপহার দেওয়া গহনার একটিকে 'পন-শপে' বন্ধক দিয়ে মাসদুয়েকের আহারের সঙ্গতি ওকে জোগাড় করতে হবে। দু-মাসের মধ্যে নিশ্চয় আর একখানা ক্যানভাস ও নামিয়ে ফেলবে। শুধু আঁকলেই তো হবে না, বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। তখন সুদ-সমেত ঋণটা পরিশোধ করে মায়ের উপহারটা ফিরিয়ে আনবে।

এই তো জীবন! কখনো উত্থান; কখনো পতন! ওঠা আর নামা! আত্মবিশ্বাস অটুট আছে ওর। জীবনে আঘাত তো বড় কম পায়নি। এ তেমনি একটা আঘাত মাত্র!

পরদিন সকালেই একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

ডোর বেল বাজতে উঠে এসে সদর দরজা খুলেই দেখে এক অপ্রত্যাশিত দর্শনার্থী।

—আপনি! এমন হঠাৎ? বাড়ি চিনলেন কী করে?

—অনিমন্ত্রিত কি আসতে নেই? আর আপনি ভুলে গেছেন, আকাদেমিয়ার এক সম্মানীয়া সদস্যাকে বছর-কয়েক আগে আমি গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলাম।

—আসুন, ভিতরে এসে বসুন। এটি আমার মেয়ে পালমিরা।

ডোরবেলের আওয়াজ শুনে পালমিরাও গুটি গুটি এগিয়ে এসেছে। মায়ের দেহের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখছে আগন্তুককে।

ক্যাপ্টেন ব্রামান্টিকে নিয়ে এসে বসলো ওর স্টুডিও-কাম ড্রইং-রুমে, বললে, 'সরি ক্যাপ্টেন, গৃহস্বামী আজ অনুপস্থিত—'

—আই নো মাদাম। শুধু আজ নয়, আজ তিন মাস।

হেসে ওঠে আর্টিমিসিয়া। বলে, 'সরি! আমি ভুলে গেছিলাম যে, গোটা ফ্লোরেন্সের যাবতীয় খবর আপনার নখদর্পণে। ইল গ্রান্ডুচা কসিমো এখন কেমন আছেন?'

—খুব ভালো নেই। তবে সজ্ঞানে আছেন। চিকিৎসা চলছে।

—আপনি কী খাবেন বলুন?

—আমি ব্রেকফাস্ট সেরেই এসেছি। তবে এক কাপ কফি চলতে পারে।

পালমিরা একটু পরে নেমে গেল দোতলায়।

ব্রামান্টিকাকু ওকে একটা চকলেট-বার দিয়েছে। ও যথারীতি 'থ্যাঙ্কু-বাও' করে সেটা গ্রহণ করেছে। এখন দোতলায় গিয়ে গ্র্যান্ড-গ্র্যানির সঙ্গে ভাগ করে সেটার রসাস্বাদন করবে।

এ-কথা সে-কথার পর আর্টিমিসিয়া প্রশ্নটা না করে পারে না, 'আপনি সবসময়েই আমাদের বাড়িতে স্বাগত। কিন্তু হঠাৎ এতদিন পরে আমার খোঁজ-খবর নেবার কি কোনো বিশেষ হেতু আছে, ক্যাপ্টেন?'

—তা আছে, সিনোরা। আপনি তো জানেন, আমি কসিমো পরিবারের তরফে 'চীফ অব ইন্টেলিজেন্স'। সব খবর আমাকে রাখতে হয়। কাল আপনি আমাদের ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন কিছু অর্থ তুলতে। বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় আপনি তা পারেননি। প্রতিবন্ধকতাটা কী জাতীয় তা ব্যাঙ্কম্যানেজার কিছুটা আন্দাজ করেছেন। আমি সেটা নিশ্চিতভাবে জানি—

এই পর্যন্ত বলে ক্যাপ্টেন ব্রামান্টি নীরব হল।

আর্টিমিসিয়া বলে, 'তাই কি আপনি আমাকে অযাচিত সাহায্য করতে এসেছেন?'

—হ্যাঁ এবং না। আমার এ-কথাটা আপনি অন্যভাবে নেবেন না প্লিজ। আমি সব কিছু খোলাখুলি বলছি। আপনি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হলে আমি ফিরে যাব; কিন্তু এ প্রস্তাবে আপনি আহত বোধ করলে আমি মর্মাহত হব।

—বলুন। কী বলবেন?

মেদিচী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ইল দিভিনো কসিমো দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট তাঁর নিজের ব্যাঙ্কে একটা আনামত জমা রেখেছিলেন। ফ্লোরেন্টাইন শিল্পীদলের উপচিকীর্ষার্থে। তিনি ছিলেন শিল্পের মহান পৃষ্ঠপোষক। তাই এই ট্রাস্টটি গঠন করেছিলেন শিল্পীদের স্বার্থে — চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতিবিদ, এমন কি সঙ্গীতজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক। অনেক শিল্পী বৃদ্ধ বয়সে আর উপার্জনক্ষম থাকেন না, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হন। সে সব ক্ষেত্রে ট্রাস্টের যাঁরা পরিচালক তাঁরা সেইসব দুস্থ প্রাক্তন শিল্পীদের একটি মাসিক পেনশন প্রদান করতে পারেন। সেটা অনুদান। তেমনি কোনো শিল্পী যদি কোনো কারণে সাময়িকভাবে অর্থকষ্টে পড়েন তাহলে সেই আমানত থেকে স্বল্প সুদে বা বিনাসুদে তাঁকে ঋণ দেওয়া হয়। শিল্পী তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হলে ধীরে ধীরে ঋণ পরিশোধ করেন। এমনকি যদি তিনি পরিশোধ করতে অশক্ত হন, তাহলেও অ-পরিশোধিত ঋণের বোঝা তাঁর ওয়ারিশদের উপর বর্তায় না।

তথ্যটা বিবৃত করে ক্যাপ্টেন ব্রামান্টি বলে, 'আপনি হয় তো এসব তথ্য জানেন না। তাই আপনাকে জানাতে এসেছি। আপনাকে কোনো আবেদনও করতে হবে না। ট্রাস্টের তরফে আপনার বর্তমান প্রয়োজন মতো একটি ঋণ দেওয়া হতে পারে। আপনি স্বীকৃত হলে যাবতীয় ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

আর্টিমিসিয়ার দু-চোখে জল ভরে এল। বললে, 'আপনার এই অযাচিত সাহায্যের কথা আমি জীবনে.....'

বাধা দিয়ে ব্রামান্টি বলে, 'সরি, মাদাম। আমি নিমিত্ত মাত্র। হুকুম তামিল করে যাচ্ছি। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার তথ্যটি আমার মালিককে জানিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে এই প্রস্তাব আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি দূত মাত্র।'

—দূত নয়, দেবদূত। অ্যাঞ্জেল।

কথা ঘোরাবার জন্য ক্যাপ্টেন বলে, 'পালমিরা কোথায় গেল?'

আর্টিমিসিয়া বলে, 'পালমিরা কোথায় আছে আমি জানি। এখনি ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু আর একজনের খবর কি আপনি জানেন? যিনি তিন মাস অনুপস্থিত?'

ক্যাপ্টেন মুখটা নিচু করে বললে, 'জানি। কিন্তু সে-কথা তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারব না। 'প্রফেশনাল এথিক্সে' বারণ!'

—ও আয়াম সরি।

—তবু কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। আপনার মনে আছে নিশ্চয় — আমি সেই প্রথম দিনেই বলেছিলাম : আপনি 'ভালনারেব!

আর্টিমিসিয়া ম্লান হেসে বলে, 'না, সে-কথা ভুলিনি। সতর্ক আমি ছিলাম, আছি, কিন্তু ঘরের মধ্যেই যে এমন....'

—আপনি অনেক আঘাত পেয়েছেন, আপনার সহ্য ক্ষমতাও অপরিসীম। তাই আরও দুঃখজনক দুঃসংবাদটা আপনাকে দিতে চাইনি।

—কী বলুন তো? আরও বড় দুঃসংবাদটা কী?

ব্রামান্টি একটু ইতস্তত করল। তারপর বলেই ফেলে, 'পালমিরার বাবা এখন কোথায় আছেন সে-কথা বলতে পারিনি; কিন্তু সে এখন কার সঙ্গে থাকে সেটা বোধহয় আপনার জানা থাকা উচিত!'

আর্টিমিসিয়া জবাব দেয় না। একজোড়া প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়েই থাকে।

—আপনার সেই মডেলের সঙ্গে। যে বলেছিল প্রতিশোধ সে নেবেই!

—ভীনা?

—হ্যাঁ! ভীনাই। ওরা তিন-চারজনে একটা অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছিল। দেহব্যবসায়ের। পুলিশ রেইড করে। ঘটনাচক্রে ভীনাকে ধর্মাবতার বেকসুর খালাস দেন। কিন্তু আকাদেমিয়ার 'এনলিস্টমেন্ট' টা তার খোয়া যায়। এখন সে থাকে পেত্রো আন্তোনিয়োর সঙ্গে।

আর্টিমিসিয়া জবাব দেয় না। চুপ করে বসেই থাকে। ভীনা প্রতিশোধ নিয়েছে।

—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, সিনোরা। আপনাকে শুধু দুঃসংবাদ দিতে আসিনি আমি। একটা সুসংবাদও দিতে এসেছি। নিন ধরুন এটা। একখানা চিঠি —

—চিঠি! কার?

—আপনার 'আঙ্কল'-এর। তিনি জেনোয়া থেকে পাঠিয়েছেন। সেখানকার একজন ধনকুবের আপনাকে একটা 'কমিশন' দিতে চান। বুঝতেই পারছেন, আপনার আঙ্কেল-এর সুপারিশেই ব্যবস্থাটা হয়েছে। আশা করি আপনি রাজি হবেন,আজ আমি উঠি, কাল আবার আসব। আপনি কী স্থির করলেন জেনে যাব। ঋণের বিষয়ে এবং এই কমিশনের বিষয়ে।

মিকেলাঞ্জেলো জুনিয়ারের পত্রের সঙ্গে জেনোয়ার এক শিল্পপতির একখানা চিঠি

সংযোজিত। তিনি জেনোয়াতে তাঁর একটি প্রমোদভবন সুশোভিত করতে চান। আর্টিমিসিয়াকে তাই একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। আর্টিমিসিয়ার যাতায়াতের গাড়িভাড়া তিনি একটি হুন্ডির মাধ্যমে মেদিচী ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন। দু-বছরের কন্ট্রাক্ট। ওর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ধনকুবের কবরেন এবং মাসোয়ারা যা দিতে স্বীকৃত তা আশাতীত। আর্টিমিসিয়া হাতে স্বর্গ' পেল।

পরদিনই ব্রামান্টি এসে ওর স্বাক্ষরিত কন্ট্রাক্ট নিয়ে গেল।

দিন সাতেক পরের কথা।

ইতিমধ্যে ও ব্যাঙ্ক-ঋণের যাবতীয় দেনা পরিশোধ করেছে। গ্র্যানিকেও ভাড়াবাবদ কিছু দিয়েছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে একে একে। নিজের আর পালমিরার জামাকাপড়। আর ওর রঙ-তুলি-ক্যানভাস ইত্যাদি।

পালমিরা মাম্মির হাতে-হাতে সাহায্য করে চলেছে। নিজের পুতলা-পুতলি, স্কিপিং-রোপ, আঁকার খাতা মায়ের ব্যাগে ভরে দিয়েছে। জানতে চায়, 'জেনোয়া কত দূরে, মাম্মি?

—অনেক দূর মা-মণি। আমরা একদিনে সবটা পথ যেতে পারব না। মাঝে এক রাত কোনো পান্থশালায় বাস করতে হবে।

—তুমি যে বলেছিলে ব্যাঙ্ক থেকে তোমার সব কিছু ছিনতাই হয়ে গেছে! তাহলে আমরা গাড়ি ভাড়া দেব কেমন করে?

—তুমি সে সব চিন্তা কর না, মা-মণি! আমি জেনোয়াতে একটা ছবি-আঁকার বায়না পেয়েছি। যিনি আমাকে দিয়ে ছবিটা আঁকাবেন তিনিই গাড়ি ভাড়া আগাম মিটিয়ে দিয়েছেন।

পালমিরা একটা রঙিন ফিতে আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'বাপি যাবে না? তাকে খবর দাওনি?'

—তোমার বাপির ঠিকানা তো আমি জানি না। তবে আমি আমার জেনোয়ার ঠিকানাটা গ্র্যানির কাছে রেখে যাব। সে যখনই এ বাড়িতে আসবে, খবর পেয়ে যাবে। ইচ্ছা হলে সে জেনোয়াতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতেও পারে।

পালমিরা আর কিছু প্রশ্ন করে না।

ওদের যাত্রা করার নির্দিষ্ট সময়ের দুদিন আগে সন্ধ্যাবেলায় ওর বাড়িতে এসে হাজির হল আর এক অপ্রত্যাশিত আগন্তুক। অপ্রত্যাশিত কেন হবে? এটা তো তারই বাড়ি। পালমিরা তখন তার গ্র্যান্ড-গ্র্যানির ডেরায়।

ডোর বেলের শব্দ শুনে সদর দরজা খুলে দিয়েই অবাক হয়ে গেল আর্টিমিসিয়া।

—তুমি! কী ব্যাপার?

—'কী ব্যাপার' মানে? এটা তো আমারই বাড়ি, না কি?

দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় আর্টিমিসিয়া। বলে, 'ও হ্যাঁ, প্রথম দিনই তুমি বলেছিলে বটে - 'এটা আমার বাড়ি'। এস ভিতরে এস।'

পেত্রো ড্রইংরুমে এসে বসে। কাঁধ থেকে ঝোলা ব্যাগটা নামায়। বলে, 'তুমি নাকি জেনোয়া চলে যাচ্ছ?'

আর্টিমিসিয়া সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, 'আমি একটু কফি পান করি এখন। কফির পাত্রটা স্টোভে বসাতে যাচ্ছিলাম। তুমিও এক-পেয়ালা পান করবে কি?'

—না। ধন্যবাদ। সন্ধ্যাবেলা আমি কফি পান করি না।

—ও হ্যাঁ, সেটাও ভুলে গেছি এতদিনে। আবসান্থের বোতলটা কি আছে তোমার ব্যাগে? বার করে এনে দেব?

এবার ওর সে-কথার জবাব না দিয়ে পেত্রো বলে, 'আমার প্রশ্নটার উত্তর দাওনি তুমি। শুনলাম তুমি জেনোয়ায় চলে যাচ্ছ? সত্যি?'

—হ্যাঁ। একটা ভালো কমিশন পেয়েছি। দু বছরের কন্ট্রাক্ট।

—কিন্তু নিজের ইচ্ছায় তুমি এভাবে আমাকে ত্যাগ করে যেতে পার না।

—ওমা! তোমাকে ত্যাগ করে যাব কেন? ছবি আঁকার বায়না পেয়ে তুমিই তো আমাকে ত্যাগ করে গিয়েছিলে পেত্রো! আমি তো তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি মাত্র!

—না! তুমি তা পার না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার স্ত্রী এমন সংসার ছেড়ে চলে যেতে পারে না। দিস্ ইজ রোমান ল।

—তা হতে পারে, কিন্তু এটা তো রোম নয়। ফ্লোরেন্স। এখানে ইল গ্রান্ডুচা কসিমো দ্য সেকেন্ড হচ্ছেন সর্বেসর্বা। তিনিই আমার এই কমিশনের ব্যবস্থা করেছেন। বাধা দিলে তুমি ফ্লোরেন্সবাসীর কাছে হাস্যাস্পদ হবে মাত্র! আমাকে আটকাতে পারবে না।

—বেশ। মামলা মোকদ্দমা আমি করব না। কিন্তু তোমাকে এ জন্য খেসারতদিয়ে যেতে হবে।

—দেব। আমাদের ব্যাঙ্কের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে যত হাজার ডুকাট আছে সব তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছা মতো তুলে নিও। মনে আছে নিশ্চয় — জয়েন্ট-অ্যাকাউন্টটা ছিল 'আইদার অর সার্ভাইভার'!

জ্বলন্ত দু-চোখের দৃষ্টি মেলে পেত্রো নিশ্চুপ বসে থাকে।

—তুমি একটু বস। আমি কফির জলটা বসিয়ে দিয়ে আসি। ভালো কথা। রাতে কি তুমি খাবে? থাকবে?

— সে জন্য কি তোমার অনুমতি নিতে হবে নাকি?

—নিশ্চয় নয়। এটা তো 'তোমার বাড়ি'। আমাদের থাকতে দিয়েছ মাত্র; তাই আমরা আছি। তবে পালমিরার মুখোমুখি তুমি হতে ইচ্ছুক কি না সেটা তোমার বিবেচ্য।

—পালমিরা কোথায়?

—দোতলায়। ডেকে দেব? সে কিন্তু জানে, আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখন কেন জমা আছে মাত্র এক ফ্লোরিন। নিম্নতম আমানত। যদিও তাকে বলিনি যে, তুমি এখন ভীনার সঙ্গে থাক। বাপি যে চোর এটুকুই সে জানে — সে ব্যভিচারী তা বোকাটা জানে না। ডেকে দেব তাকে?

পেত্রো চট করে উঠে দাঁড়ায়। ব্যাগটা কাঁধে তুলে নেয়। বিদ্যুৎবেগে বার হয়ে যায় ঘর ছেড়ে। শুধু যাবার সময় বলে যায়, এর শোধ আমি কিন্তু নেব।

আর্টিমিসিয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে!

ঐতিহাসিক এবং গবেষকদলের সংকলিত তথ্যে জানতে পারি যে, আর্টিমিসিয়া তাঁর কন্যাকে নিয়ে রোমে ফিরে আসেন 1621 খ্রিস্টাব্দে এবং অনতিবিলম্বে দীর্ঘ দুই বছরের

জন্য কাজ শুরু করেন জেনোয়তে এসে। আন্দাজ করি রোমে ফিরে এসেই তিনি জানতে পারেন যে, ইতিমধ্যে মাদার মার্গারিটা প্রয়াত হয়েছেন। তিনি শুয়ে আছেন তাঁদের চার্চ-সংলগ্ন সিমেটারিতে। তারপূর্বেই দেহ রেখেছেন ফাদার সিবেস্টিয়ান।

দু বছর পর আবার ফিরে আসেন রোমে। এই সময়ে একজন ফরাসি চিত্রকর Piere Dumonstier le Neveu আর্টিমিসিয়ার তুলি ধরা হাতের একটি ছবি আঁকেন। তাঁর সংকলনে এই চিত্রটি মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপনের বিড়ম্বনা এড়িয়েছে। ফরাসি চিত্রকর তাঁর শিল্পসৃষ্টির তলায় লিখে গিয়েছিলেন 'এই ছবিটি একজন মহান শিল্পীর হাতের ছবি' "The hand of the excellent and wise noble woman of Rome Artemisia". জীবনীকার এই প্রসঙ্গে লিখছেন "Her fame is also evident in a commemorative medal bearing the portrait made sometime between 1625 and 1630 that calls her **Pictrix celebris** or celebrated woman painter. Also at this time Jerome David painted her portriat with the inscription calling her "the famous Roman painter."

ষোলশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দের পরে জেনোয়া থেকে তিনি আবার রোমে ফিরে আসেন। সম্ভবত প্রথমে তাঁর পৈত্রিক আবাসেই। এখানেই তিনি নিজ প্রতিকৃতিটি আঁকেন। তারপর তাঁর আরও তিনখানি তৈলচিত্র রোমে বসেই আঁকেন Annunciation (1630) এবং আবার একখানি **লুক্রেবিয়া** এবং আবার একখানি **ক্লিওপেট্রা**। 1637 খ্রিস্টাব্দে তাঁর কন্যা পাল্‌মিরার সঙ্গে একজন অ্যাম্বাসাডারের ভাগিনেয়র বিবাহ দেন।

ততদিনে শিল্পী সাফল্যের গৌরীশৃঙ্গে উঠে গেছেন। অথচ একদল সমালোচক ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধ-সমালোচনা করে চলেছেন। তার প্রধান হেতু তিনি পুরুষ নন, নারী। এটা সমকালীন ওই সমালোচকেরা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাছাড়া তাঁর চিত্রে একটি 'নারী বিদ্রোহ' বা 'নারী স্বাধীনতার' বার্তা প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হতো — যেটা ওই সংস্কারাচ্ছন্ন সমালোচকেরা সহ্য করতে পারতেন না।

তবু তিনি আমন্ত্রণ লাভ করলেন ইংলন্ডেশ্বর কিং চার্লস দ্য ফার্স্ট-এর কাছ থেকে। তাঁর আহ্বানে আর্টিমিসিয়া ইংলন্ডে চলে যান। সেখানে গ্রীনউইচ শহরে ইংলন্ডেশ্বরীর একটি বিশাল অতিথিশালা নির্মিত হচ্ছিল। আকাশপথে তখন ইংলন্ডে যাওয়া যেত না। সেই দ্বীপের সিংহদ্বার ডোভার বন্দর। গ্রীনউইচ তার কাছেই। ওই অতিথিশালায় এতদিন সিলিং আঁকছিলেন আর্টিমিসিয়ার পিতৃদেব : ওরাজিও। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পরে পিতাপুত্রীর মিলন হল। বৃদ্ধ পিতার অসমাপ্ত কাজে হাত দিলেন আর্টিমিসিয়া। কিন্তু সে কাজটি শেষ হবার আগেই ইংলন্ডে শুরু হয়ে যায় রাষ্ট্রবিপ্লব। ওরাজিও প্রয়াত হন সেই অতিথিশালাতেই —রঙ-তুলির মাঝখানে। শিল্পীর কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু। বস্তুত কন্যার বাহুবন্ধনে।

সুধীজন মাত্রেই জানেন, কিং চার্লস দ্য ফার্স্ট এই অন্তর্বিপ্লবে নিহত হন।

তার পূর্বে বাধ্য হয়ে আর্টিমিসিয়া প্রত্যাবর্তন করেন রোমে।

শেষ জীবনে তিনি আরও কয়েকটি তৈলচিত্র এঁকেছেন।

সমাকালীন সমালোচকেরা তাঁর প্রশংসা ও নিন্দায় মুখর; কিন্তু কেউ তাঁকে উপেক্ষা করে নীরব থাকতে পারেননি। তবু সেই পুরুষ শাসিত সমাজে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষরাই প্রাধান্য

পেয়েছিল। 'যেন তেন প্রকারেণ' আর্টিমিসিয়াকে অবজ্ঞা করেছে, নিন্দা করেছে, অশ্রদ্ধা জানিয়েছে।

গবেষক আরও বলেছেন অজ্ঞাত হেতুতে আর্টিমিসিয়ার সঙ্গে তাঁর স্বামীর বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং তারপর একে অপরের খবর আর কোনোদিন পাননি। তাঁদের আর কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। আমরা তা মানতে রাজি নই। আমাদের ধারণা মহাকাল নাট্যকার হিসাবে এত বেরসিক নন! চারচক্ষুর মিলন আবার নিশ্চিত হয়েছিল। অল্পক্ষণের জন্য হলেও। এতে ইতিহাস অসমাপ্তভাবে শেষ হতে পারে কাহিনির 'তামাম সুধু' হয় না।

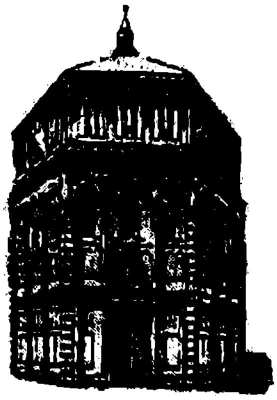

আপনারা কথাসাহিত্যিককে অনুমতি দিলে সেই উপাখ্যানটা শোনাতে পারিঃ

স্থান-কাল-পাত্র:

স্থান : রোমনগরীর পশ্চিমপ্রান্ত

কাল: বসন্তকাল

পাত্র : না। পাত্র নয় — পাত্রী। এই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু : আর্টিমিসিয়া জেন্টিলেসচি।

এখন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ। প্রৌঢ়ত্বের আক্রমণ হয়নি, তবে কিছু স্থূলকায়া হয়ে পড়েছেন। কেশগুচ্ছে দু-একটি চাইনিজ-হোয়াইটের আঁচড় পড়তে শুরু করেছে। এক শ্রেণির কঠোর সমালোচকবর্গের ক্রমাগত আক্রমণ সত্ত্বেও তিনি তখন খ্যাতির শীর্ষবিন্দুতে। একটার পর একটা তৈলচিত্রের কমিশন পাচ্ছেন। অভিজাত-সমাজে তিনি একজন বরেণ্য চিত্রশিল্পী। দাভিদ ততদিনে তাঁর তৈলচিত্রটি এঁকেছেন। শিল্পীর কমামোরেশন মেডেলও তৈরী হয়ে গেছে।

পাল্‌মিরা এখন প্রায় বিংশতিবর্ষীয়া। চিত্রশিল্পের দিকে তার আর আকর্ষণ নেই। ছবি আঁকে না। তবে ললিতকলার অন্য এক শাখায় সে খ্যাতি লাভ করেছে : নৃত্যশিল্পে। পাল্‌মিরা এখন একজন প্রসিদ্ধ ব্যালেডান্সার। হয়তো এটাকেই সে জীবিকা হিসাবে বেছে নেবে। এখানে ওখানে নানা উৎসবে ওদের ট্রুপের ডাক পড়ে। পাল্‌মিরা নৃত্যে অংশ নেয়। প্রচুর করতালি ও পুষ্পগুচ্ছে সম্বর্ধিত হয়।

সেই রকম এক ব্যালে-ডান্সের আসরে পাল্‌মিরার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে একজন অভিজাত তরুণ — রোবিনোভিচ্। রোমের রাজদরবারে রাশিয়ান অ্যাম্বাসাডারের ভাগিনেয়।

রোমান্টিক কাহিনির বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। দুজনই দুজনের প্রেমে পড়েছে। শুরু হয় যৌথ ভ্রমণ, আউটিং, ডেটিং। যেমন হয়ে থাকে।

মাসখানেকের ভিতরেই রোবিনোভিচ 'প্রপোজ' করে সুন্দরী পাল্‌মিরার কাছে। আর সে সলজ্জে স্বীকৃতা হয়ে যায়।

আর্টিমিসিয়া বুঝতে পেরেছিল — পাল্‌মিরা চিত্রশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হবে না। নৃত্যশিল্পী হিসাবেই সে ললিতকলার অপর এক প্রাঙ্গণের দিকে ঝুঁকেছে। রোবিনোভিচ অভিজাত পরিবারের সন্তান। পাত্র হিসাবে খুবই বাঞ্ছনীয়। অ্যাম্বাসাডার-সাহেবও ভাগিনেয়র পছন্দকে

তারিফ করলেন। ফলে বিবাহের কোনো অন্তরায় রইল না।

স্থির হল, ঈস্টারের আগের সপ্তাহে রোমে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে, যাতে ঈস্টারের ছুটিতে ওরা দুজনে সুইৎজারল্যান্ডে মধুচন্দ্রিমা যাপনে যেতে পারে। পাত্র ও পাত্রীপক্ষর দু-বাড়িতেই পড়ে গেল সাজ-সাজ রব। আর্টিমিসিয়া তার রঙ-তুলি-ক্যানভাস সাময়িকভাবে গুদামজাত করে ফেলেছে। এখন তার কত-কত কাজ! মঙ্গলবার অপরাহ্নে রোমের একটি গির্জায় বিবাহ উদ্‌যাপিত হবে। রাত্রে একটি খানদানি হোটেলের 'ব্যাঙ্কোয়ে-হল'-এ বসবে নাচের আসর। তারপর ডিনার পার্টি। নিমন্ত্রিতের তালিকা প্রস্তুত করা, সেগুলি বিলি করার কাজ আছে। পাল্‌মিরা নিজেই গ্রহণ করেছে 'ওয়েডিং গাউন' বানাতে দেবার দায়িত্ব, ওয়েডিং-রিঙ পছন্দ করার দায়ভার। আর মাত্র পাঁচদিন বাকি। এমন একসময় ওদের শান্ত-নিরুপদ্রব মা-মেয়ের সংসারে অন্তরীক্ষ থেকে নেমে এল এক অপ্রত্যাশিত বজ্র।

অপরাহ্ন-কাল। আর্টিমিসিয়া বসেছে তার মেয়েকে নিয়ে — নিমন্ত্রিতের লিস্টটা আর একবার চেক করতে। কোনো বিশিষ্ট অতিথির নাম বাদ গেল কি না, শেষবারের মতো পরখ করতে। ওর মেডসার্ভেন্ট— হ্যাঁ, এখন তার একজন পরিচারিকা আছে — এসে খবর দিল একজন অপরিচিত আগন্তুক ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে ড্রইংরুমে বসিয়ে এসেছে। আগে না জানিয়ে এমন এক আগন্তুকের আগমন সংবাদ শুনে বিরক্ত বোধ করে। প্রশ্ন করে, 'কে তিনি? কী চান?'

— নাম বলেননি। আর প্রয়োজনের কথাটাও শুধু আপনাকেই জানাবেন বললেন। আর্টিমিসিয়া পাল্‌মিরাকে বললে, 'দেখ্ তো মা, কে এসেছে, কী চায়?'

পাল্‌মিরা ইতস্তত করে। সে একটা হাউস-কোট গায়ে জড়িয়ে ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ এভাবে অপরিচিত মানুষের সামনে উপস্থিত হতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে। হাজার হোক, সে বিয়ের কনে! মা বুঝল মেয়ের সঙ্কোচের কথা। তাই আবার বলে, 'ঠিক আছে। তোকে যেতে হবে না। আমিই দেখছি।'

গায়ের উপর একটা লেডিজ-শাল জড়িয়ে এগিয়ে গেল ড্রইংরুমের দিকে। সেটাই ওর ড্রইং-কাম-স্টুডিও রুম। ঘরের দেওয়ালে নানান তৈলচিত্র। কিছু ওর আঁকা, কিছু ক্লাসিকাল চিত্রের অনুলিপি। ভিতরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে আগন্তুক ওর দিকে পিছন ফিরে ওর আঁকা একটি তৈলচিত্রকে তন্ময় হয়ে দেখছেন। ছবিটি সদ্যসমাপ্ত : **অনুশোচনায়-আচ্ছন্ন ম্যাগদানেল।**

পিছন থেকে মনে হল আগন্তুক প্রৌঢ় নন, বৃদ্ধই। বেশবাস অপরিচ্ছন্ন। প্যান্ট তাপ্পিমারা। তাঁর একহাতে একটি ছড়ি; অপর হাতে চুরুট। পদশব্দে বৃদ্ধের তন্ময়তা ভঙ্গ হল। পিছন ফিরে মুখোমুখি হলেন আর্টিমিসিয়ার। সসম্ভ্রম 'বাও' করে বলেন, 'গুড-আফটারনুন, সিনোরা। আপনার কর্মব্যস্ততার মধ্যে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু কথাটা নিতান্ত জরুরী। তাই বাধ্য হয়ে আসতে হল। আমাকে চিনতে পারছেন তো?'

আর্টিমিসিয়া জবাব দিতে পারল না। হাত বাড়িয়ে চেয়ারটাকে ধরে। তার মাথার মধ্যে টলে উঠেছে। ধীরে-ধীরে চেয়ারে বসে পড়ে। অস্ফুটে বললে, 'তুমি.... তুমি - এতদিন কোথায় ছিলে? আর কেনই বা এসেছে এখন?'

—আহ্! সিনোরা তাহলে চিনতে পেরেছেন! বলব, বলব আমার কথা। একটু বসুন। আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। গোপন কথা তো — পাঁচকান হওয়া ঠিক নয়। তাতে আপনার অসুবিধা।

আর্টিমিসিয়া — গৃহস্বামিনী কিন্তু এখনো সে নির্বাক। আগন্তুক লাঠিগাছটা টেবিলে রাখে। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বসে পড়ে ওর দর্শনার্থীর কেদারায়। চুরুটটা শেষ হয়েছিল। অ্যাশট্রেতে থেঁৎলে ঘষে ঘষে সেটার দাহন নিঃশেষ করে দেয়। এবার সে চোখে-চোখে তাকায়। বলে, এটা তো আর 'আমার বাড়ি' নয়। তোমার! তোমার একার। কিন্তু মেয়েটা তো তোমার একার নয়, আর্টিমিসিয়া। আইনত সে আমারও! নয়?

অপ্রত্যাশিত আঘাত সে চিরকালেই বুক পেতে গ্রহণ করেছে।

আজও তার ব্যতিক্রম হল না। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল, 'আমি আজ খুব ব্যস্ত আছি পেত্রো। কী জন্যে এসেছ সংক্ষেপে বল?'

—তাই কি পারি, সিনোরা? বিশ বছর পরে দেখা? কত-কত কথা বলার আছে, শোনার আছে। প্রথম কথা : তোমার বেটির 'বে'-র নেমন্তন্ন লিস্টিতে তার বাপের নামটা আছে তো? ন্যায্য বাবা হোক না হোক, আইন-মোতাবেক-বাপ? পত্তরটা আমাকে এনে দাও। আমি আসব, নিশ্চিত আসব। তোমার মেয়ের ক্যান-ক্যান নাচ দেখব, ভর পেট খেয়েও যাব। খুশি?

দাঁতে-দাঁত দিয়ে আর্টিমিসিয়া বলে, 'তুমি কি ওর বিয়েটা ভেঙে দিতে এসেছ?'

—ও মা! কী অলুক্ষুণে কতা গো! আঁতেল ঘরের মেয়ে আঁতেল-ঘরে যাবে, তাতে আমি কোন শুয়োরের বাচ্চা যে বাধা দেব?

আর্টিমিসিয়া মর্মাহতা হয়। বোঝে, ইতর শ্রেণির ইয়ার-দোস্তের ভাষাটা ওর মজ্জাগত হয়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে এতক্ষণে। বলে, 'আমার সময় কম! কত দিতে হবে তাই বল। যাতে তুমি চুপিসাড়ে ফিরে যেতে পার নিজের জগতে? মানে, তোমার পরিচয়টা জানাজানি হয়ে যাবার আগেই!'

—আহ্! পরিচয়। আইডেন্টিটি! শোন সিনোরা। ও শালীর ন্যায্য বাপ কোন শুয়োরের বাচ্চা তা আমি জানি না। তখন আমি পথে পথে ছবি এঁকে বেড়াতুম। সে-কালে তোমার কত কত নাগর ছিল, তা কি আমার মনে আছে? তবে একটা কথা ভুলিনি। ব্যাপটিজম্-এর সময় তুমি নিজে মুখে বলেছিলে, ওর পদবি 'আন্তোনিয়ো' নয়। বলেছিলে! মনে আছে নিশ্চয়!

আর্টিমিসিয়া এবার ধমক দিয়ে ওঠে, 'অহেতুক কেন কথা বাড়াচ্ছ পেত্রো? তুমি এসেছ 'ব্ল্যাকমেইল' করতে। সোজাসুজি বল, কত চাও!'

—'ব্ল্যাকমেইল'! আই অবজেক্ট! না! আমি এসেছি আমার ন্যায্য দাবি নিয়ে।

ঝোলার ভিতর থেকে যে আবসাম্বের একটা বোতল বার করে।

—না, এখানে নয়। এটা তোমার বাড়ি নয়। আমার বাড়ি! এখানে তোমাকে মদ্যপান করতে দেওয়া হবে না। বোতলটা ব্যাগে ভর। আর কত ডুকাট চাও সরাসরি বলে দাও।

পেত্রো বোতলটা ব্যাগে ভরে ফেলে। আগুনঝরা চোখে তাকায় আর স্ত্রীর দিকে। বলে,

'সরি। 'ডুকাট' নয়, ম্যাডাম, 'ফ্লোরিন'! আমার সম্মান-মর্যাদা মিটিয়ে দিয়ে তুমি তোমার বেজন্মা-মেয়ের 'বে' দিতে পার: হাজার ফ্লোরিন! নট আ লিরা লেস, নট আ-লিরা মোর!

—হাজার ফ্লোরিন! কী বলছ পেত্রো! আমি পাঁচ বছরেও তা রোজগার করতে পারব না যে!

—সরি কনের-মা! দরাদরি আমি করি না। 'বল'টা এখন তোমার কোর্টে। আমার ন্যায্য প্রাপ্যটা তুমি দিতেও পার। আবার আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতেও পার। সে ক্ষেত্রে আমাকে যেতে হবে রবিনোভিচের মামার কাছে। 'বল'টা তখন চলে যাবে তাঁর কোর্টে! তিনি বেশ্যা মাগীর বেজন্মা বেটির সঙ্গে তাঁর বোনপোর 'বে' দিতেও পারেন। নাও পারেন। সেটা আমার বরাত!

আর্টিমিসিয়া আগুনঝরা চোখে তাকিয়ে থাকে তার স্বামীর দিকে। যে-লোকটা সব জেনে শুনে তাকে ঘরে নিয়েছিল। যার সন্তানকে সে গর্ভে ধারণ করেছে। একা-হাতে মানুষ করে তুলেছে।

—যদি ব্যাপারটা চাপা দিতে চাও, তাহলে শনিবার বেলা একটার সময় নোটের বান্ডিলটা নিয়ে সেই পোপালিনো বীচের রেস্তোরাঁটায় এস। ঠিক বেলা একটায়। আমি দশ মিনিট অপেক্ষা করব। তারপর সিধে চলে যাব রাশিয়ান এম্বাসিতে। ও.কে?

আর্টিমিসিয়া নির্বাক নিস্পন্দ।

—আরও একটা কথা বলে যাই, সিনোরা। তুমি এখন আঁতেল। তোমার অনেক অর্থ! তুমি অনায়াসে একটা প্রফেশনাল মার্ডারারকে নিযুক্ত করতে পার। তাতে তোমার কোনো ফয়দা হবে না। আমার এক ইয়ার দোস্তকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে এক কপি কোর্টের অর্ডার দিয়ে এসেছি। আমি ফৌত হলে সে যথাকর্তব্য করবে! আজ আমি চলি তাহলে? শনিবার, বেলা একটা। পোপালিনো বীচ-এর সেই রেস্তোরাটা মনে আছে তো? যেখানে তোমার আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল গো? দোতলার ছাদে? কী মনে পড়ে?

—প্লিজ ক্লিয়ার আউট! বেরিয়ে যাও!

—তা তো বলতেই পার। যেহেতু বাড়িটা আমার নয়। তোমার!

লাঠিটা তুলে নিয়ে বৃদ্ধ ঠুক্ ঠুক্ করে এগিয়ে গেল নির্গমন দ্বারের দিকে। দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'বেস্ট অব ল্যাক! থাউজেন্ড ফ্লোরিন ইন স্মল ডিনোমিনেশন। গুড নাইট!'

পরমুহূর্তেই নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ওর জীবনের সেই অসহ্য অভিশাপ!

হাজার ফ্লোরিন!

'ফ্লোরিন' একটি স্বর্ণমদ্রা। 'টুলিপ ফ্লাওয়ারের' ছাপ মারা। তাই ওর নাম ফ্লোরিন।

সাদা বাঙলায় : 'মোহর'!

পায়ে-পায়ে আর্টিমিসিয়া বাড়ির সামনের 'প্যাটিও'-তে বার হয়ে আসে। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটা এলিয়ে দেয় একটা বেতের আরাম কেদারায়। অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেছে সন্ধ্যায়। পশ্চিমাকাশের সোনালী রোদ কখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল নজরে পড়েনি। এখন নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার। প্যাটিও ঘিরে যে মরশুমি ফুলের কেয়ারি তা আঁধারে

অদৃশ্য। তবু গাছ-গাছালির একটা মিষ্টি বুনো গন্ধ ভেসে আসছে।

দেড়-দিনের মধ্যে হাজার ফ্লোরিন জোগাড় করা একটা অবাস্তব প্রস্তাব। ওর যা কিছু পুঁজি ছিল তা মা-মণির বিয়েতে খরচ করতে বসেছে। ভেবেছিল — সঞ্চয়ের কী দরকার? মেয়ের জীবন সুখের হলেই ওর পরম তৃপ্তি। তারপর সংসারে খরচ কমিয়ে আনবে। একা-মানুষের আর কতটুকু প্রয়োজন? এমন সময় যেন কবরের মাঝখান থেকে উঠে এল এক প্রেতাত্মা। সব কিছু তছনছ হয়ে গেল।

হঠাৎ কে যেন ওর কাঁধে আস্তে করে একটা হাত রাখে। চমকে পিছন ফিরে দেখে - পালমিরা।

—তুমি অন্ধকারের মধ্যে এমন করে বসে আছ কেন মা? কী ভাবছ?

— না, কিছু না। চল্ ভিতরে যাই।

—যাব। একটু বস। দু-একটা কথা আছে। প্রথমে বলত, ওই বুড়োটা কে? কী বলে গেল তোমাকে?

আর্টিমিসিয়া বলে, 'ও আমার একজন পরিচিত লোক। অনেক দিন পরে হঠাৎ এসেছিল বলে প্রথমটা চিনতে পারিনি।'

—আমি ওকে আগে দেখেছি? আমার চেনা কেউ?

আর্টিমিসিয়া বলে, ওর কথা থাক মা-মণি। চল্ ভিতরে যাই।

—যাব, যাব। কিন্তু কথাটা যে আমার শেষ হয়নি।

—কী কথা?

—ও একজন 'ব্ল্যাকমেলার'—তাই নয়? তোমার কাছে হাজার ফ্লোরিন চাইল কেন? ও আমাদের সম্বন্ধে কী জানে?

তিনটে প্রশ্নের একটারও জবাব দিল না আর্টিমিসিয়া। প্রতিপ্রশ্ন করে, 'তুই কেমন করে জানলি?'

—আমি দরজার এ পাশ থেকে আড়ি পেতেছিলাম। সব কথা বুঝতে পারিনি, শুনতেও পাইনি অনেক কথা। কিন্তু লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি, মা!

আর্টিমিসিয়া জবাব দেয় না। নিশ্চুপ বসে থাকে। তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। পালমিরা বলতে থাকে, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, বাপির সামনে এসে জিজ্ঞেস করব, কেন তুমি এতদিন আমাদের কোনো খোঁজ খবর নাওনি? কিন্তু ও এমন সব বিশ্রি কথা বলতে শুরু করল.....'

আর্টিমিসিয়া চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। পালমিরা কতটা শুনেছে, কতটা বুঝতে পেরেছে আন্দাজ করতে পারে না। তারপর স্বীকার করে, 'তুই কতটা শুনেছিস, কতটা বুঝেছিস আমি জানি না। কিন্তু এটুকু বিশ্বাস করিস মা-মণি— ও আমার বিরুদ্ধে যা- কিছু বলেছে —তা মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা!

—তাহলে তুমি এত ভেঙে পড়েছ কেন? কেন ওই লোকটা হাজার ফ্লোরিন ব্ল্যাকমানি চাইবার সাহস পায়?

—কথাটা মিথ্যা। কিন্তু ওর কাছে এমন একটা দলিল আছে, এমন কিছু ডকুমেন্ট ও নিয়ে এসেছে যা প্রকাশ হয়ে পড়লে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। অভিযোগটা মিথ্যা, কিন্তু ওর কাছে যে প্রমাণটা আছে তা মিথ্যা নয়। ফলে ওই হাজার ফ্লোরিন আমাকে দিতেই হবে, শনিবার।

—আছে তোমার কাছে অত ফ্লোরিন?

—না নেই। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেব। কাল সকালেই যাব ব্যাঙ্কে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, তাতে সমস্যাটা মিটবে না।

—কেন? ও তো বলল ব্ল্যাকমেলিং-এর সবটা পেলে ও আর কোনো হাঙ্গামা করবে না।

ম্লান হাসল আর্টিমিসিয়া। বলে, এটাই তো ব্ল্যাকমেলিং-এর সবচেয়ে মারাত্মক বীভৎসতা। হাজার ফ্লোরিন ও ছয় মাসের মধ্যেই উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবে। ঘোড়দৌড়ের মাঠে, মদে বা আরও পাঁচ রকম ব্যভিচারে। তারপর আবার ফিরেএসে নতুন করে হাত পাতবে। নিরুপায় হয়ে আবার আমাকে সেটা দিতে হবে।

—ব্ল্যাকমেলার-এর হাত থেকে বাঁচার কি কোনো পথ নেই?

—আছে। মা-মণি। বিনিময়ে বাকি জীবনটা ওর হাতে তুলে দিয়ে। আমি বাকি জীবনে যা উপার্জন করব তা বছরে-বছরে ওর ব্যভিচারের রসদ হিসাবে জোগান দিয়ে যেতে হবে। 'ব্ল্যাকমেলিং' এমন একটা ব্যাধি যার কোনো ওষুধ নেই। তা মৃত্যুর মতো অমোঘ। জীবন দিয়ে তা শোধ করতে হয়।

সে রাতটা মা-মেয়ে ঘুমোতে পারল না। পালমিরার নিজস্ব শয়নকক্ষ আছে। কিন্তু ওই রাতটা কি-জানি-কী ভেবে মায়ের ডবলবেড পালঙ্কে এসে শুয়ে পড়ল। আর্টিমিসিয়া জানতে চাইল না—'কেন'। পাশাপাশি নিশ্চুপ ঘুমাবার ভান করে দুজনেই বিনিদ্র রাতটা কাটিয়ে দিল।

পরদিন সকালে সব কাজ ফেলে আর্টিমিসিয়া তৈরী হয়ে নিল ব্যাঙ্কে যাবে বলে। বাড়ির দলিলটা সঙ্গে নিল। সেটাই আমানত হিসাবে জমা রাখতে হবে হাজার ফ্লোরিন ঋণ প্রার্থনা করে।

কিন্তু আবার এক বাধা।

আবার এসে উপস্থিত এক অপ্রত্যাশিত আগন্তুক। এবারও কোনো খবর না দিয়ে। এবার কিন্তু চিনতে অসুবিধা হল না আর্টিমিসিয়ার।

—তুমি! হঠাৎ কোথা থেকে? উঃ কতদিন পরে!

—তা প্রায় দুই দশক! আমাকে চিনতে পেরেছ তো আর্তি?

—বাঃ! তোমাকে চিনব না? জেনোয়ায় এসেছিলে কেন হঠাৎ?

—পালমিরার বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে! তুমি আমার খবর রাখ না, কিন্তু আমি তোমাদের সব খবর রাখি। পালমিরা কোথায়?

—সে একটু বেরিয়েছে। আমাকেও এক্ষুনি বের হতে হবে। তুমি কোথায় উঠেছ আঁদ্রে? হোটেলে? এ বাড়িতে চলে আসতে পার না?

আঁদ্রে বলে, পালমিরা বাড়িতে নেই, তাতে সুবিধাই হল। আমি এসেছি একটা বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে। কথাটা অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত গোপন। ইন ফ্যাক্ট — আমাকে পাঠিয়েছেন আমার 'বস্'। তিনি স্বয়ং আসতে পারলেন না। অসুবিধা আছে।

—তোমার 'বস্'? কে তিনি?

—কর্নেল ব্রামান্টি। তাঁর আদেশ মতোই আমি জিগ্যেস করছি। তুমি অসঙ্কোচে সব

কথা আমাকে খুলে বল —

— কী কথা, আঁদ্রে?

—কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার সঙ্গে এক বৃদ্ধ এসে দেখা করেছিলেন। আমরা জানি। তিনি কেন এসেছিলেন তাও জানি। কিন্তু তিনি কত ফ্লোরিন ব্যাকমেলিং-এর দাবি পেশ করেছেন তা জানি না। সেটা বলবে?

স্তম্ভিত হয়ে গেল আর্টিমিসিয়া : 'এ-সব কী বলছ আঁদ্রে?'

— প্লীজ! প্লীজ! সময় আমাদের খুব কম। এখনি পালমিরা ফিরে আসতে পারে। তার আগে বল : কতটা তার দাবি? কখন সে নিতে আসবে সেটা?

আর্টিমিসিয়া বুঝতে পারে এর পর আর গোপন করার কোনো মানে হয় না। জানায় অর্থের পরিমাণটা এবং কখন, কোথায় সেটা হস্তান্তরিত করার নির্দেশ আছে।

আঁদ্রে বলে, শোন আর্তি! আজ সন্ধ্যাবেলাতেই আমি তোমাকে দিয়ে যাব একটা পোর্টম্যান্টো ব্যাগ। তাতে থাকবে গোনাগুনতি এক হাজার ফ্লোরিন। তুমি ইতস্তত কর না। এটা কোনো দান নয়, ঋণ নয়। কর্নেল ব্রামন্টির আদেশ। আমি দূত মাত্র। শনিবার সকালে আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসব। ছদ্মবেশে। মানে কোচম্যান -হিসাবে। ঠিক বেলা সাড়ে এগারোটায়। এখান থেকে পোপালিনো বীচ যেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে। একটু সময় হাতে থাকা ভালো। কারণ একটা দশের পর পেত্রো আর তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না — তুমিই তা বললে।

—ওই হাজার ফ্লোরিন আমাকে শোধ দিতে হবে না? এটা কী বলছ?

—না! কারণ তুমি ব্যাগটা ওর হাতে তুলে দেবে। কিন্তু ও সেটা গ্রহণ করতে পারবে না। তোমাকেই ফেরত দেবে।

—কী বলছ এসব? আমি তোমার কোনো কথা বুঝতে পারছি না।

আঁদ্রে জবাব দিতে পারল না।

খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে ওঠে, হ্যালো। হ্যালো, হ্যালো! কী পালমিরা? আমাকে চিনতে পার?

খোলা সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পালমিরা আর রবিনোভিচ। পালমিরা একটু থতমত খেয়ে যায়। আঁদ্রেকে সে চিনতে পারেনি। না পারারই কথা। প্রায় বিশ বছর আগে যখন সে শেষবার আঁদ্রেকে দেখে তখন সে শিশুমাত্র। কাকুর কাঁধে চেপে ফ্লোরেন্সের পথে-পথে বেরু-বেরু করতে যেত। আঁদ্রে রবিনোবিচের দিকে ফিরে বলে, 'তুমি আমাকে চেন না সিনর রবিনোভিচ্। আর্টিমিসিয়া ফ্লোরেন্সে যে বাড়িতে থাকত আমিও সে বাড়িতেই থাকতাম। পালমিরা তখন নেহাৎ বাচ্চা।'

রবিনোভিচ্ এগিয়ে এসে আঁদ্রের সঙ্গে করমর্দন করে।

গাড়োয়ানকে কোনো নির্দেশ দিতে হল না। ঘোড়ার গাড়িটা পোপালিনো বীচের একটা খানদানি রেস্তোরাঁর সামনে এসে থেমে গেল। কোচম্যান নেমে এসে দরজাটা খুলে দিয়ে গ্রাম্য লব্জে বললে, 'আস্যে পড়ছেন, মা-ঠাইরান! আপনি ভিতরে যান গিয়া। আমি হেই ময়দানে গাড়িটা রাখুম।'

ভারি পোর্টম্যান্টো ব্যাগটা নিয়ে আর্টিমিসিয়া নেমে এল। একবার চোখ তুলে গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে দেখল। কে বলবে—ওই লোকটা ফ্লোরেন্স সেনাদলের একজন পদস্থ অফিসার।

বিশ বছরে এলাকাটার বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন বাড়িও উঠেছে সমুদ্রের ধার বরাবর। কিন্তু পান্থশালাটার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। যেমন হয়নি আড্রিয়াটিক সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের, অথবা গগনচারী সীগালগুলোর আর্ত শীতকার।

ব্যাগটা হাত বুলিয়ে ও এগিয়ে গেল রেস্তোরাঁটার দিকে। দ্বারপাল অভিবাদন করে ঝকঝকে পিতলের হাতল ধরে দরজাটা খুলে দিল। ভিতরটা আলো-আঁধারী। কিন্তু ও প্রবেশ মাত্র একজন বৃদ্ধ কোণ থেকে এগিয়ে এলেন। অ্যাট্রিমিসিয়াকে এমন একটি খানদানি 'বাও' করলেন যাতে মনে হল কোনো ম্যাজিশিয়ান স্টেজে উঠে এবার খেলা দেখাচ্ছেন, অথবা স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে কুইনকে অভিবাদন করছেন।

—আসাঁতে সিনোরা! আপনি খুব পাঙ্কুয়াল দেখছি। আসুন আমরা দোতলায় যাই।

—তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? আপনি এই ব্যাগটা আমার বাড়িতে ভুলে ফেলে রেখে এসেছিলেন, তাই পৌঁছে দিতে এসেছি। আপনি এটা নিলেই আমার ছুটি।

—তাই কি হয়? আমাদের দু-জনের যে আজ এখানে লাঞ্চ খাবার কথা। আসুন, দোতলায় যাই।

আর্টিমিসিয়ার লক্ষ্য হল পেত্রো কিন্তু এখন তার ইয়ারদোস্তদের চাষাড়ে ভাষায় কথা বলছে না। তার মানে কাল সন্ধ্যায় কি সে ইচ্ছে করে ওই অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলছিল? কেন? ওকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে? আর্টিমিসিয়া ওর কথা মেনে নিল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ছাদে যেতে শুরু করল। বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন, 'ব্যাগটা বহে নিয়ে যেতে আপনার অসুবিধা হবে। আমাকে দিন। আমি বইব।'

— না থাক। আমি এতটাই যদি বা সইতে পারি, তবে ওটুকুও পারব।

—তাই কি হয়? মহিলা মোট বইবেন, আর পুরুষ মানুষ খালি হাতে যাবে?

আর্টিমিসিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, যীসাস্ বলেছেন, বধ্যভূমিতে যাবার সময় প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ক্রুশকাঠখানা বয়ে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধ বলেন, 'তাই বলেছেন বুঝি! আমি আবার ও কেতাবখানা পড়িনি।'

ওরা দুজনে উঠে এল দ্বিতলের খোলাছাদে। আশ্চর্য! এটারও কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিছু দূরে দূরে ওক্-কাঠের মেজ। সেগুলি ঘিরে চারখানি করে চেয়ার। উপরে রোদ-আড়াল করা গোল রঙিন ছাতা।

পেত্রো বিশেষ একটি টেবিল বেছে নিল। যেখানে ওরা বসেছিল প্রথমবার। সেই টেবিলের অপর দুটি চেয়ার সরিয়ে দিল। ছাদে আরও কয়েকটি দল মধ্যাহ্ন-ভোজনে সমবেত হয়েছেন। বসেছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। হোটেলের বেয়ারা এসে দাঁড়ালো, নোটবই হাতে। পেত্রো তাকে

বললে, প্রথমে কিছু অ্যাপিটাইজার নিয়ে এস। লাঞ্চের অর্ডার একটু পরে দেব। আমার জন্য এক বোতল আবসান্থ, আর ওঁর জন্য রেড-ওয়াইন। আর এক প্লেট বেকন উইথ ফ্রায়েড প্রন।

লোকটা নিরুক্থায় অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

আর্টিমিসিয়া ব্যাগটা হস্তান্তরিত করার উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে ধরে। বলে, এটা ধর।

— ওটা তো নেবই। ওটা নিতেই তো আসা। কিন্তু এমন প্রকাশ্যস্থানে গুন্‌তি তো করা যাবে না, মানে...

— কেন? গুন্‌তি করা যাবে না কেন? তুমি তো কিছু ব্ল্যাকমেলিং-এর পেমেন্ট নিচ্ছ না। এ তো তোমার ন্যায্য পাওনা। এতদিন স্ত্রীকন্যাকে ভরণপোষণ করেছ, এ তো তারই প্রতিদান!

পেত্রো হা-হা করে হাসল। আর্টিমিসিয়ার নজর হল, ওর সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে। আজ কিন্তু লোকটা তাপ্পিমারা প্যান্ট পরে আসেনি। তার সাজ পোশাক খানদানি না হলেও মানানসই। সে জিজ্ঞাসা করে হাজার ফ্লোরিন কি ব্যাঙ্ক থেকে তুললে?'

— সে খবরটায় তোমার কী প্রয়োজন পেত্রো? যা চেয়েছ পেয়ে গেলে। ব্যস!

— একটা কথা আর্টিমিসিয়া। খোলাখুলি বলে রাখি। পরে গুন্‌তি করে যদি দেখি তুমি প্রতিশ্রুতিমতো হাজার ফ্লোরিন দাওনি; তাহলে আমার তরফেও কথার খেলাপ হতে পারে।

— সেটুকু আন্দাজ করতে পারি।

পেত্রো একটা চুরুট ধরালো। খিদ্‌মৎগার ওদের অ্যাপিটাইজার দিয়ে গেল। পেত্রো বলে, তোমার খবর মোটামুটি আমার জানা। তুমি কি আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও?

— হ্যাঁ চাই। ভীনা কোথায় আছে? কেমন আছে?

সোজা হয়ে বসল পেত্রো। বলে, 'ভীনা? ভীনা কে?'

— তুমি তাকে আজ সত্যিই চিনতে পারছ না? ভীনা ছিল আমার প্রথম মডেল — আমি যখন Inclinazione ছবিটা আঁকছিলাম...

— ও হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। সে তো অনেক দিনের কথা। সে অনেকদিন আগেই আমাকে ছেড়ে গেছে। বেঁচে আছে, না ফৌত হয়েছে তাও জানি না। আর কোনো প্রশ্ন?

— হ্যাঁ, অনেক কথাই তো জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি অসোয়াস্তি বোধ করতে পার বলে জানতে চাইছি না।

— আরে না, না। তুমি কি অ্যাদ্দিনেও বুঝতে পারনি যে, আমি লোকটা একেরে দুকানকাটা?

— তাহলে আমাকে বুঝিয়ে বল তো পেত্রো — কাল সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে অমন খিস্তি-খেউড় মেশানো ভাষায় কথা বলছিলে কেন? আমাকে ভয় দেখাতে?

আবার অট্টহাস্য করে ওঠে পেত্রো। বলে, 'তুমি দারুণ বুদ্ধিমতী। সব নিজে-নিজেই

বুঝে নিতে পার!'

— না পেত্রো! সবটা পারি না। যেমন ধর এই আংটিটা—

আঙুল থেকে ও ওয়েডিং-রিংটা বার করে টেবিলে রাখে। বলে, আমি আজও জানি না, এটা কি আমাকে বিয়ে করার আগে তুমি নগদমূল্যে বাজার থেকে কিনেছিলে?

— না তো কী? চোরাইমাল? চুরি করেছিলাম?

— না! কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, তোমার প্রথমপক্ষের বউকে কফিনে শুইয়ে দেবার আগে এটা তার হাত থেকে খুলে নিয়েছিলে। পারে না?

এবার আর অট্টহাস্য করতে পারল না। বললে, 'প্রথম পক্ষের বউ! তার মানে? এসব কী বলছ?'

— আমি সেটা জানতাম পেত্রো! কথাটা তোমার সঙ্গে কখনো আলোচনা করিনি — তুমি লজ্জা পাবে বলে। কারণ সে-কথাটা তুমি নিজ মুখে আমাকে বলনি কোনোদিন।'

পেত্রো গম্ভীর হয়ে গেল। জানতে চায়, 'এ-কথা তোমাকে কে বলেছিল? গ্র্যানি? না তার সেই হাড়হাবাতে নাতিটা?'

আর্টিমিসিয়া বললে, 'হাড়হাবাতে নাতিটার কথাই যখন উঠে পড়ল,তখন আরও একটা প্রশ্ন করি। তাকে তুমি বরাবর এড়িয়ে চলতে। তার সঙ্গে কখনো কথা বলতে না। সেটা কেন?'

পেত্রো আরও গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, 'ছেলেটা ছিল ভারী পাজি। কাচের জানলা দিয়ে আমাদের বেডরুমে উঁকিঝুঁকি মারত।'

—তাহলে ও কথাটা সত্যি? তুমি আমাকে বিয়ে করার আগে আর একজনকে বিয়ে করেছিলে। তাই না?

পেত্রো রুখে ওঠে, 'সেটা আইনত কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু তাই বলে ও ছোকরা ভোররাতে আমাদের শোবার ঘরে গিয়ে উঁকি মারবে?'

—তাই মারত বুঝি?

—আমি একদিন স্বচক্ষে তাকে দেখেছি। শীতের দিনে শেষরাত্রে ছাদের পাঁচিল টপ্‌কে কাচের শার্সি জানলা দিয়ে উঁকি দিতে!

আর্টিমিসিয়া বলে, 'এটা খুবই অন্যায়। তুমি তাকে ডেকে ধমক দাওনি?'

— ও তো তখন বাচ্চা ছেলে। ন-দশ বছর বয়স। সে-সব কথা থাক। রোবিনোভিচ্‌কে কত 'ডাওরি' দিতে হল, বল?

আর্টিমিসিয়া জবাব দেবার আগেই ও পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক টেবিল ছেড়ে উঠে এলেন ওদের কাছে। পেত্রোকে বলেন, 'কিছু মনে করবেন না সিনর। আপনাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় আপনাকে দেখেছি—বলুন তো?'

পেত্রো বিরক্ত বোধ করে। বলে, 'সরি সিনর। আমি রোমে থাকি না। ফ্লোরেন্স থেকে

এসেছি দুদিন আগে। আপনি কিছু ভুল করছেন।'

—তাই বলুন মশাই। আপনি ফ্লোরেন্টাইন! ফ্লোরেন্সেই তাহলে আপনাকে দেখেছি।

পেত্রো রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'লুক হিয়ার স্যার। আপনি হয়তো আমাকে কোথাও দেখেছেন — কিন্তু সেসব খেজুরে আলাপ করার সময় এবং ইচ্ছা আমার নেই। আমি এখানে এসেছি সস্ত্রীক মধ্যাহ্নভোজনে। আপনার বক্‌বকানি শুনতে নয়।'

ভদ্রলোক এবার একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েন। সবিস্ময়ে বলেন, দিও মি সালভি, কী বলছেন মশাই! সস্ত্রীক! ইনি আপনার স্ত্রী? ইনি তো বিখ্যাতা রোমান পেইন্টার মাদাম আর্টিমিসিয়া জেন্টেলেসচি! আমরা তো এতদিন জানতাম সিনোরিটা পালমিরা জেন্টিলেসচির বাবা ...

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। হোটেল-বয় এসে দাঁড়ায়।

পেত্রো বলে, প্লীজ স্যার! এবার আপনি ফিরে যান নিজের টেবিলে। আমরা এবার খাবারের অর্ডার দেব। খাব।

ভদ্রলোক হোটেল বয়কে সরাসরি বলেন, 'তুমি একটু ঘুরে এস। ইনি একটু পরে অর্ডার দেবেন। আমাদের কিছু কথা বাকি আছে।'

—ইয়েস্ স্যার। — হোটেল বেয়ারা তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করল।

পেত্রো একেবারে অগ্নিশর্মা। জোর গলায় ধম্‌কে ওঠে, 'আপনি কে মশাই? হরিদাস পাল? আমি কখন খাবারের অর্ডার দেব তা আপনি বলার কে?'

ভদ্রলোক তাঁর কোটের পকেট থেকে একটি কার্ড বার করে দেখান। শান্তস্বরে বলেন, 'না, হরিদাস পাল আমি নই। আমি রোমের একজন কাস্টম্‌স্ অফিসার। আমাদের কাছে খবর আছে কিছু 'কন্ট্রাব্যান্ড-গুডস্' আজ দুপুরবেলা এখানে হাতবদল হবে। অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন কি — আপনার এই পোর্টম্যান্টো ব্যাগে কী আছে?'

পেত্রো আগুনঝরা চোখে আর্টিমিসিয়ার দিকে তাকায়। বলে। 'ও! তুমি এই চাল দিয়েছ? সামলাতে পারবে নিজেকে? রঙের টেক্কাখানা কিন্তু আমার পকেটে!'

—আমি কিন্তু আপনার জবাবের প্রতীক্ষায় আছি মিস্টার ফ্লোরেন্টাইন। আপনার এই ব্যাগে কী আছে?

পেত্রো মুহূর্তমধ্যে জবাব দেয়, ব্যাগটা আমার নয়। ওনার — ওঁকে জিগ্যেস করুন।

— সে কী! আপনি তো এইমাত্র বলছেন উনি আপনার স্ত্রী? ওঁর হলে সেটা আপনারও। নয়?

পেত্রো জবাব দিল না।

কাস্টমস্ অফিসার এবার আর্টিমিসিয়ার দিকে ফিরে বলেন, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি ম্যাডাম। আমাকে মার্জনা করবেন। ব্যাগটি কি আপনার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কী আছে ওতে?

—আফিঙ গাঁজা বা 'কন্ট্রাব্যান্ডস্' কিছু নেই। কিছু অর্থ আছে।

—অর্থ! কতটা? কত ফ্লোরিন?

—আমি আপনার এ প্রশ্নের জবাব দেব না। রোমান কারেন্সি কোনো নিষিদ্ধ বস্তু নয় যে, কোনো মহিলা তা নিয়ে পথে বার হতে পারবেন না।

—আমি দুঃখিত ম্যাডাম। আর একটি প্রশ্ন: এটা ব্ল্যাকমেলিং-এর কোনো লেনদেন নয় তো?

আর্টিমিসিয়া একবার পেত্রোর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললে, 'আমি তো পুলিশকে কিছু জানাইনি। বলিনি যে, আমাকে কেউ 'ব্ল্যাকমেইল' করছে। আপনি আমাকে এসব প্রশ্ন করতে পারেন না। আবার বলছি, কারেন্সি নোটস্ কন্ট্র্যাব্যান্ড নয়!'

—আমি দুঃখিত সিনোরা। এবার আমার শেষ প্রশ্ন : এ ভদ্রলোক কি আপনার স্বামী? সিনর পেত্রো আন্তেনিয়ো?

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর্টিমিসিয়া স্বীকার করে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না, সিনর — আপনি কিন্তু অহেতুক আমাদের বিরক্ত করছেন। এ ব্যাগটা আমার - তা আমি আগেই বলেছি- আমাদের কাছে নিষিদ্ধ বস্তু কিছু নেই। আপনি তল্লাশ করে দেখতে পারেন। যদি না করেন, তবে অনুগ্রহ করে নিজের টেবিলে ফিরে যান। আমাদের বিরক্ত করবেন না। কাইন্ডলি।

ভদ্রলোক ওকে 'বাও' করে বললেন, 'আমি আপনাদের মধ্যাহ্ন ভোজনে বিরক্ত করায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ — কারণ আপনি ওই ভদ্রলোককে চূড়ান্তভাবে শনাক্ত করে দিয়েছেন।

ধীর পায়ে নিজের টেবিলে ফিরে গিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে একজনকে বললেন, ইয়েস্ কর্নেল! সিনোরা চূড়ান্তভাবে ওঁকে শনাক্ত করেছেন। তোমার অনুমানই সত্য।

তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রোতা। এগিয়ে এলেন ওদের টেবিলের কাছে। পেত্রোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন, 'আমাকে চিনতে পারেন, সিনর আন্তোনিয়ো?'

পেত্রো উঠে দাঁড়ায়। রুখে ওঠে, 'এসব কী শুরু করেছেন আপনারা? একের-পর-একদল এসে এভাবে আমাদের বিরক্ত করছেন কেন? পুলিশ বলে? অসীম ক্ষমতা আছে বলে?'

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন, বলেন, 'বুঝেছি! আপনি আমাকে ঠিক চিনতে পারেননি।'

— না, পারিনি। চিনতে চাইও না। এটুকু আন্দাজ করছি যে, আপনিও রোমান সরকারের একজন আবগারি দারোগা। ধরাকে সরা জ্ঞান করেন!

— আজ্ঞে না। আমি কর্নেল ব্রামান্টি। ফ্লোরেন্স সরকারের 'চীফ অব্ ইন্টেলিজেন্স'।

একটু থমকে গেল পেত্রো। কিন্তু সামলে নিতে তার দেরি হল না। একটা ছদ্ম 'বাও' করে বললে, 'কী সৌভাগ্য আমার। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কৃতার্থ হলাম!'

তারপর আর্টিমিসিয়ার দিকে ফিরে বলে, 'উঠে এস, আর্টিমিসিয়া। এঁরা সবাই সামরিক অফিসার অথবা পুলিশ। আমাদের ওঁরা শান্তিতে লাঞ্চ করতে দেবেন না। তোমার ব্যাগটা তুলে নাও।'

যন্ত্রচালিতের মতো আর্টিমিসিয়া উঠে দাঁড়ায়। ব্যাগটা তুলে নেয় হাতে। কর্নেল ব্রামান্টিকে সে চিনেছে। কিন্তু পেত্রোর সম্মুখে সে-কথা স্বীকার করতে সাহস পায় না। ও জানে, কর্নেল ব্রামান্টি — যাকে ও বিশবছর আগে চিনত উপকারী বন্ধু ক্যাপ্টেন ব্রামান্টি-পরিচয়ে — এখানে অসহায়। পেত্রোর আস্তিনের তলায় লুকানো আছে রঙের টেক্কাখানা — যা 'একাঘ্নি' অস্ত্রের মতো অব্যর্থ। ব্রামান্টি হয় তো ওকে কোনো অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে পারে — কিন্তু ধরা দেবার আগে ওই শয়তানটা মেলে ধরবে রোম-আদালতের একটি পাক্কা দলিল : আর্টিমিসিয়া ছিল একজন বেশ্যা। পালমিরা বেজন্মা!!

উঠে দাঁড়ালো ব্রামান্টি। বললে : 'সিনর আন্তোনিয়ো! ফ্লোরেন্সের অধিপতি ইল গ্র্যান্ডুচা গুইলিনো দ্য মেদিচীর আদেশে আমি এই মুহূর্তে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি!'

পেত্রোও উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'বাঃ! একটু- 'আগেই শুনলেন না যে, ব্যাগটা আমার স্ত্রীর! এখানে ব্ল্যাকমেলিং-এর কোন কেসই নেই!'

কর্নেল ব্রামান্টি কাকে যেন ইঙ্গিত করল। পেত্রো লক্ষ্য করেনি যে, ঠিক তার পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছে একজন। মুহূর্তমধ্যে সে পেত্রোর হাতখানা টেনে নিয়ে হ্যান্ডকাফ্ পরিয়ে দিল।

— এসব কী হচ্ছে! গর্জে ওঠে পেত্রো! বলে, 'এটা রোম! ফ্লোরেন্স নয়। এখানে লর্ড মেদিচীর অর্ডার কার্যকরী নয়।'

— আপনি একবার গ্রেপ্তারি-পরোয়ানখানা নজর করে দেখুন, স্যার। রোমের লকুমেন্টেনান্টি গ্রেপ্তারি- পরোয়ানায় অনুমোদন দিয়েছেন!

পেত্রো সেটা দেখে না। বলে, 'আপনার চার্জটা কী? ব্ল্যাকমেলিং?'

— নো স্যার! ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার!

থমকে যায় পেত্রো: 'মার্ডার! মার্ডার? মার্ডার কেসে একটা ' কর্পাসডেলিক্টি'র প্রয়োজন হয় — এটুকু অন্তত আপনার জানা উচিত!

— বাঃ! আইন সম্বন্ধে আপনার তো বেশ টনটনে জ্ঞান আছে দেখছি! আসামীকে যখন কাঠগড়ায় তোলা হবে, তখন সবই পাবেন — মৃতদেহের অকাট্য উপস্থিতি, প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী! আমি আইনত আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি সিনর আন্তোনিয়ো! এখন এ বিষয়ে আপনি একটি কথাও বলবেন না — মানে যতক্ষণ না আপনার সলিসিটর এসে উপস্থিত হচ্ছেন।

— জানি মশাই, জানি। কিন্তু খুনটা কে হয়েছে, কোথায় হল? কবে হল? সেটুকু অন্তত

জানবার অধিকার কি আমার আছে?

— নিশ্চয়! খুন হয়েছিলেন আপনার প্রথমা পত্নী, সিনোরা এলিজাবেথ আন্তোনিয়ো আপনার শয়নকক্ষে, সাতই এপ্রিল, ইয়ার অর দ্য লর্ড সিক্সটিন থার্টিন!

— লিজা তো মারা যায় অক্সিজেনের অভাবে — আমরা ভুল করে সব জানলা বন্ধ করে ফায়ার-প্লেস জ্বালানোতে!

— সেটা অর্ধসত্য! অক্সিজেনের অভাবেই। তবে আপনি তার গলা টিপে ধরায়!..... না, না, কোনো কথা বলবেন না।

ততক্ষণে ছাদে বেশ ভিড় হয়ে গেছে। একতলা থেকে এই নাটকীয় দৃশ্যটি দেখতে অনেকেই উপরে উঠে এসেছেন। তার ভিতর একজন সুবেশ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে কর্নেলকে বলেন, 'এক্সকিউজ মি স্যার! আপনি এভাবে আমার হোটেল থেকে কোনো খদ্দেরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না। আমি এ রেস্তোরাঁর মালিক। আমার বৈধ লাইসেন্স আছে!'

কর্নেল ব্রামান্টি তার দিকে ফিরে বললেন, 'লুক হিয়ার সিনর প্রোপ্রাইটার। এটা একটা খুনের মামলা! আপনি সরকারি কাজে বাধা দিলে আপনাকেও আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব!'

মালিক নিক্কথায় এক পা পিছিয়ে এলেন!

— য়ু কান্ট প্রুভ ইট! কোনো প্রমাণ নেই, কোনো সাক্ষী নেই! —গর্জে ওঠে পেত্রো।

— নো! নো! নো! আপনি আর একটি কথাও বলবেন না। লেফটানেন্ট ব্রুনো আসামীকে নিয়ে যাও।

ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল আসামীকে হাতকড়া পরিয়ে, মাজায় দড়ি বেঁধে নামিয়ে নিয়ে যাবার পর সকলেই নেমে গেল। ব্রামান্টি এবার এগিয়ে এল আর্টিমিসিয়ার কাছে। ভারী ব্যাগটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলল, 'বসো আর্টিমিসিয়া! আয়াম সরি! কিন্তু এ ছাড়া তোমাকে বাঁচানোর আর কোনো পথ খোলা ছিল না। তাছাড়া হত্যাদৃশ্যের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী যে অকুস্থলে উপস্থিত ছিল এই সত্যটা প্রমাণ করাই ছিল একমাত্র বাধা। না হলে কেসটা আমরা বেশ কয়েক বছর আগেই সমাধান করেছি! স্ত্রীধন হাতিয়ে নেবার লোভে শয়তানটা তাকে গলা টিপে মেরেছিল।

আর্টিমিসিয়া দু হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল। তার পিঠটা মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে উঠছিল শুধু। সে কাঁদছে। দুঃখে না আনন্দে?

— আর তো কান্নার কিছু নেই আর্তি! তোমার সমস্যার তো সমাধান হয়ে গেছে! পেত্রোর কাছে যে দলিলটা আছে সেটা আমরা 'সীজ' করব। যে ইয়ার-দোস্তের কাছে দ্বিতীয় কপিখানা আছে সে গত কাল রাত্রে অ্যারেস্টেড হয়েছে। পেত্রোর যদি মৃত্যুদণ্ড না-ও হয় — যাবজ্জীবন হতে বাধ্য। ও আর তোমার কাছে ব্ল্যাকমেইল করতে কোনোদিন ফিরে

আসবে না! এ জীবনে নয়!

— ও সত্যি সত্যি লীজাকে গলাটিপে মেরে ছিল?

— প্রশ্নটা ক্যাপ্টেন আঁদ্রেকে জিজ্ঞেস কর। সেই একমাত্র সাক্ষী! কিন্তু তার দিদিমাকে সে কথা বলতে সাহস পায়নি। ওর ভয় ছিল তাহলে পেত্রো ওকে খুন করে ফেলতো। কিন্তু সে যে অমন শীতের রাত্রে ওভাবে পেত্রোর 'বেড-রুমে' উঁকি মেরেছিল — এ-কথাটা আমরা বিচারককে হয়তো বিশ্বাস করাতে পারতাম। তুমি নিজের অজান্তে সেই সমস্যার সমাধানটা করে দিয়েছ।

অশ্রু-আর্দ্র দু-চোখ থেকে হাতদুটো সরিয়ে ও জানতে চায়, 'আমি?'

— হ্যাঁ, তুমিই! পেত্রো তোমার কাছে স্বীকার করেছে যে, ওই প্রচণ্ড শীতের রাত্রে ক্যাপ্টেন আঁদ্রে চিলেকোঠার ছাদ থেকে হত্যা দৃশ্যটা স্বচক্ষে দেখেছিল। পেত্রোর স্টেটমেন্টটা অবশ্য 'প্রিভিলেজড কম্যুনিকেশন' — তোমাকে আমরা সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে সে প্রশ্নটা করতে পারতাম না। রোমান ল'তে স্ত্রী কখনো স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে না। কিন্তু হতভাগাটা তখন এতই উত্তেজিত যে, স্বীকৃতিটা সে জোরগলায় দিয়েছিল। আমরা চার-পাঁচজন তা শুনেছি! ... আয়াম সরি ফর য়ু!

— সরি? সরি কেন হবে ব্রামান্টি? ওই নরপিশাচটার সন্তানকে আমি গর্ভে ধারণ করতে বাধ্য হয়েছি বটে, তবে কোনোদিন কি তাকে একফোঁটা ভালোবেসেছি? সে কি সেই সুযোগ আমাকে দিয়েছিল?

— থ্যাংকস্ সিস্টার! ওইটুকুই ছিল এ সাফল্যে আমার একমাত্র ব্ল্যাকস্পট। বিশ বছর ধরে আমি ওর পিছনে লেগে ছিলাম। কিন্তু গ্রেপ্তার করতে সাহস পাইনি। আশঙ্কা ছিল আদালতে ওটা প্রমাণ করতে পারব না। বিচারক বিশ্বাস করবেন না যে, ওই প্রচণ্ড শীতের রাত্রে একটা নয়-দশ বছরের ছেলে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে ওদের ঘরে উঁকি মেরেছিল। ... যা হোক! তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যাও! গাড়ি তৈরীই আছে।'

— থ্যাঙ্কস ব্রাদার! তুমি আমার জীবন দিলে। আমার আর পালমিরার।

— শুধু থ্যাঙ্কস্ বললে শুনব কেন? পালমিরার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রটা কই? আমরা সবাই মিলে যে ওর বিয়েতে নাচব, নিমন্ত্রণ খাব, কক্‌টেল পার্টিতে যোগ দেব!

— শ্যিওর।

কী ভাবে, কোথায় তাঁর দেহাবসান হয়েছিল বুড়ো ইতিহাসটা তা জানে না। কোথাও তা লিপিবদ্ধ করা নেই। এটাই হয়তো ইতিহাসের কেতা। আমাদের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের কাণ্ডারী নানা সাহেব কোথায় দেহ রাখলেন তা কেউ জানে না। হয়তো যারা জানত তারা তা লিপিবদ্ধ করে যায়নি। আবার আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল কাণ্ডারী, সেই বাঙালা-মায়ের অভিমানী ঘর-পালানো ছেলেটা কোথায় শহীদ হল, সেকথাও ইতিহাসে লেখা থাকবে না। কেউ তা

জানে না। যারা জানত তারাও তথ্যটা নানাভাবে চাপা দিয়ে গেছে। বার বার কমিশন বসিয়ে বারে বারে বলতে চেয়েছে — 'তোদের নবকুমার কি আর আছে? তাহাকে শেয়ালে খাইয়াছে!' লোকসভায় তারস্বরে এ কথা ঘোষণা করে গদিয়াল হয়ে বসে থেকেছে বংশানুক্রমে!

আর্টিমিসিয়ার ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

গবেষক বলছেন :

The only record of her death is in two satirical epitaphs — that mention nothing about her art but figure her in exclusively sexual terms as a nymphomaniac and adulter.

[তাঁর প্রয়াণ সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় মাত্র দুটি সমাধিফলক। তাতে প্রয়াত ব্যক্তির শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত সে দুটি সমাধি ফলক নয় — ব্যঙ্গ কবিতা। তাতে বর্ণিত হয়েছে মৃত মহিলাটি ছিলেন একজন 'চিত্ররথ' অর্থাৎ বাৎস্যায়ন বর্ণিত তীব্র কামনাময়ী মহিলা, যাঁর যৌনতৃপ্তি সহজে প্রশমিত করা যায় না। এবং চরিত্রহীনা লম্পট।]

আর্টিমিসিয়ার জীবনীকারের অভিমত — তাঁর চৌত্রিশখানি সুচিহ্নিত তৈলচিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি : **জুডিথ কর্তৃক হলোফার্নেস** বধ। কিন্তু জুডিথ সম্বন্ধেও শেষ কথাটা বুড়ো ইতিহাস আমাদের জানায়নি। সে-কথা না বলেছেন মহান বাইবেল, না তাঁর নাটকে সিস্টার হেলেনা, না তাঁর শিল্পে আর্টিমিসিয়া।

হলোফার্নেসকে নিহত করে জুডিথ যখন জুডা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন নগরবাসী তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করেছিল? জুডিথকে কোথায় সমাধি দেওয়া হয়েছিল তাও আমরা জানি না। তাঁর সমাধিফলকেও কি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল কোনো ব্যঙ্গ কবিতা? ভবিষ্যৎকালকে জানাতে যে, মহিলাটি ছিলেন এক 'নিম্ফোমোনিয়াক'। সেই নষ্টচরিত্রের ব্যভিচারিণীকে কোনো জুডিথবাসী পুরুষ কামতৃপ্ত করতে পারেনি। আর সেজন্যই সেই চরিত্রহীনা গোপনে চলে গিয়েছিল বিদেশী দানবের শিবিরে। তার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়তে।

ইতিহাস এ সম্বন্ধে নীরব।

যেমন নীরব আর্টিমিসিয়ার ক্ষেত্রেও।